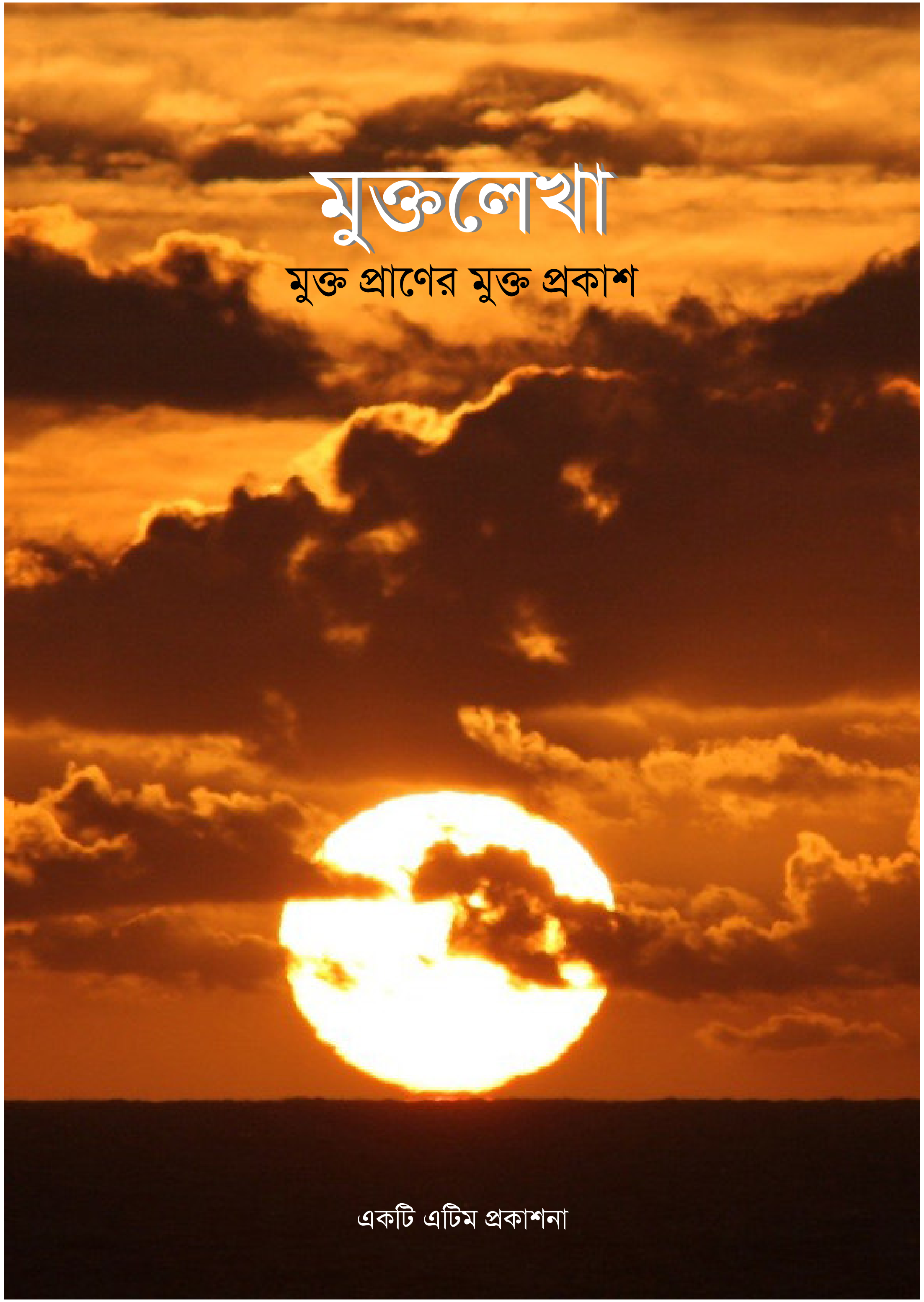

প্রথম প্রকাশ
পহেলা বৈশাখ ১৪১৫,
প্রচ্ছদ হাসিব মাহমুদ,
স্বত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকদের,

এবং এটি একটি

এটিম প্রকাশনা

উৎসর্গ

শহরাঞ্চলে আজকাল যে নববর্ষ উদযাপনের প্রথা দৃশ্যমান তার

শুরুটা হয়েছিলো ষাটের দশকে ।

একদল সাংস্কৃতিক কর্মী

তৎকালীন শোষক পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে

রমনা বটমূলে সূর্যোদয়ের সময় গান গেয়ে নববর্ষকে বরণ

করার রীতি চালু করেন ।

এই ইবুকটি সেইসব সংস্কৃতিকর্মীদের উৎসর্গ করা হলো ।

রিলিজ নোটস

ভার্শন ১, সংস্করণ ১

১. ব্লগারদের লেখা নিয়ে ইবুক প্রকাশের পরিকল্পনা মাথায় অনেকদিন থেকেই । সামহয়ারের লেখা নিয়ে ইবুক করার পরিকল্পনা মাসখানেক আগে কাছের কয়েকজন ব্লগারকে জানাই । সানন্দে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তাঁরা । সেইসব বন্ধু ও সামহয়ারইনের অসংখ্য ব্লগারদের সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত এই ইবুক আলোর মুখ দেখলো । কৃতজ্ঞতা জানাই সবাইকে ।

২. মুক্তলেখা নামের এই ইবুকটি কিছু নীতিমালা মেনে সংকলিত হয়েছে । এটি প্রকাশকদের তরফ থেকে কখনো প্রিন্টেড ফর্মে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হবে না । এখানে লেখকদের বানানরীতি সম্পাদকদের তরফ থেকে পরিবর্তিন করা হবে না । ব্লগাররা যেই নামে ইবুকে পরিচিত হতে চান সেটাই রাখা হয়েছে । এই সংকলনে লেখা প্রকাশের জন্য লেখকরা কোন সম্মানি পাবেন না এবং এই ইবুকটি থেকে কোন অর্থ উপার্জনেরও পদক্ষেপ নেয়া হবে না । সর্বোপরি এই ইবুক প্রকাশিত হচ্ছে সম্পুর্ন স্বাধীন উদ্যোগে । সামহয়ারইনব্লগ কর্তৃপক্ষের সাথে এর কোন সংযোগ নেই ।

এই নীতিমালাগুলো মেনে যারা ইবুকে লেখা প্রকাশে রাজী হয়েছেন শুধুমাত্র তাদেরই লেখা এখানে প্রকাশিত হয়েছে । এখানে উল্লেখ্য, ইবুকে প্রকাশিত লেখার স্বত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকের । এখানে প্রকাশকদের কোন দাবি নেই ।

৩. ইবুক প্রকাশের সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিলো এতো হাজার হাজার ভালো লেখা থেকে কিছু ভালো লেখা বের করে নিয়ে আসা । সহব্লগার রাশেদ, বোঘদাদি হাকিম, আরিফ জেবতিক, এস্কিমো, ইয়র্কার, অলৌকিক হাসান, মুকুল, অমিত, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শিবলী নোমান, সুশান্তসহ আরো অসংখ্য ব্লগার প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এই সংকলনের কাজটি করে দিয়েছেন । ইবুক প্রকাশের পনের আনা কৃতিত্ব এদের । ধন্য তাদের প্রচেষ্টা । এরপর তালিকায় আসা ব্লগাররা সময়মতো তাদের সম্মতি দিয়ে কাজটি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন । যারা অনুমতি দেননি তাদের মতের ওপরও সমান শ্রদ্ধা ।

৪. আগেই বলা হয়েছে, এই ইবুকটিতে সংশ্লিষ্ট লেখকদের বানানরীতি অবিকৃত রাখা হয়েছে । এ কারনে বেশ কিছু লেখাতে চোখে পড়ার মতো বানান বিভ্রাট রয়ে গেছে । এটা পাঠক ক্ষমা করবেন এই বিশ্বাস রাখছি । কোন লেখক তার লেখার কিছু পরিবর্তন করতে চাইলে সেটাও আমাদের মেইলে জানাতে পারেন । সময় করে সেটা পরিবর্তন করে ইবুকটির পরবর্তি সংস্করণ বের করা যাবে। এবং এই সংকলনটির সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে পরবর্তি ভার্শনের সম্ভাবনা ।

৫. প্রিন্টিং মিডিয়ার বাইরে অনলাইন লেখকেরা অচিরেই সাহিত্যে স্থান করে নেবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না । মুক্তপ্রানের মুক্তলেখা আরোও বিকশিত করার জন্য ছড়িয়ে দিন এই ইবুকটি সবজায়গায় ।

শুভ নববর্ষ ।

হাসিব মাহমুদ
(এটিম প্রকাশনার পক্ষে)
১লা বৈশাখ, ১৪১৫
ইমেইল: mukto.lekha (at) gmail.com

সূচী

	শিরোনাম – লেখক	পৃষ্ঠা
১.	লাল গাড়ি আর লাল বালিকার গল্প – নিধিরাম সর্দার	১
২.	বিশ্ববাজারে খাদ্যঘাটতি ও বাংলাদেশ: "ক্ষুধিতের বিপ্লব শুরু হতে আর দেরী নেই - তীরন্দাজ	২
৩.	ফিরে পেতাম যদি সেই দিনগুলো(. . . . আব্বুকে) - শফিউল আলম ইমন	৪
৪.	সাম্প্রতিক খাদ্য সংকট ও আমাদের কৃষি - দিনমজুর	৭
৫.	লাখ টাকার মেয়ে –জেবীন	১৩
৬.	একেকটা পোস্ট যেন বীর্যস্খলণের মত। - নাজিম উদদীন	১৪
৭.	নমিত সন্ধ্যার ছায়া - ফকির ইলিয়াস	১৫
৮.	তোমরা আমায় চিনতে পেরেছো কি? অশ্রুসিক্ত নয়নে শহীদদের স্মরন করছি। - বিহংগ	১৫
৯.	সূর্যরমণী - ফয়সাল নোই	১৯
১০.	এখনও অপেক্ষায় আছি - চিটি	১৯
১১.	বৃষ্টি, তোকে চিঠি - জেনারেল	১৯
১২.	ছোটগল্প: পুরি আলামের বৃত্তবন্দী জীবন - ইয়র্কার	২০
১৩.	অন্তর্দহন অতঃপর - রন্টি চৌধুরি	২১
১৪.	সেই সব মা জননীদের আমাদের প্রনাম - ইরতেজা	২৩
১৫.	দুর্বৃত্ত যাত্রাপথ (একটি অনুগল্পের দুর্বল উৎক্ষেপন ; - ট্রলার ডুবি মৃত আত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য) - আবদুর রাজ্জাক শিপন	২৫
১৬.	একটি ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা (কোন বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা হয়নি) - প্রলয় হাসান	২৭
১৭.	না পাঠানো চিঠি - তামিম ইরফান	৩১
১৮.	আমাদের মিলগুলো (মিল খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা। মিল খুঁজে না পেলে কেউ দায়ী থাকবে না।) - একরামুল হক শামীম	৩২
১৯.	তারুন্য (কিছু সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করলাম) - তানজিলা হক	৩৩

২০. সরাইখানার রোদ্দুর - প্রণব আচার্য ৩৪
২১. দৃষ্টিহীন অকবিতা - মানুষ ৩৫
২২. বিবর্ণ দুপুর - রোডায়া ৩৬
২৩. কি জাদু করিয়া বন্ধে মায়া লাগাইছে ! - মানবী ৩৮
২৪. বাঙাল গরব ৩ : বাঙালিই থামিয়ে দিয়েছিল আলেকজান্ডারকে - অচেনা বাঙালি ৪০
২৫. একাকিত্ব??????- প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ৪৪
২৬. মুক্তি - আউলা ৪৫
২৭. আমি ছাই আগেই ভালো ছিলাম . . . - অলৌকিক হাসান ৪৬
২৮. পথ আগলে থাকা কোন এক নারীকে (সূফীর কবিতাঞ্জাল) - সূফী ৪৭
২৯. বিক্ষত আমি আর আমার নিশীকাব্য- - - - - বিষাক্ত মানুষ ৪৮
৩০. মধ্যরাত, এখন আমি - মৃন্ময় আহমেদ ৪৯
৩১. এই আমি । - তারার হাসি ৪৯
৩২. ট্যাক্সি টু দ্য ডার্ক সাইড অভ বাংলাদেশ - জ্বীনের বাদশা ৫০
৩৩. একটি মৃত্যু আর আমার যত আক্ষেপ - ডাক্তার আইজুদ্দিন ৫২
৩৪. শোন,আমি তোমাকেই ভাবছি. . . - জিহাদ ৫৩
৩৫. ছোটগল্প : খচ্চর (১৮+) - অমি রহমান পিয়াল ৫৫
৩৬. নির্বাসিতের আপনজন পর্ব- ১৯ - নির্বাসিত ৫৮
৩৭. কি হও তুমি ওর? - কালবেলা ৭৩
৩৮. পাথরের গান - রণদীপম বসু ৭৪
৩৯. অপেক্ষা তাহার জন্য - সুলতানা শিরীন সাজি ৭৫
৪০. স্বার্থপর আমি – রাশেদ ৭৬
৪১. বারবণিতার জবানবন্দী - মানব মানিক ৭৭
৪২. ‘‘অপমান’’ - এরশাদ বাদশা ৭৮
৪৩. মা, তোমাকে। - নরাধম ৮১
৪৪. আজও মনে পড়ে সেই প্রিয় মানুষটিকে. . . - তাজুল ইসলাম মুন্না ৮৩
৪৫. একজন বাবা ; তাঁর ষ্টুপিড ছেলের কাছে - আহমেদ শারফুদ্দীন ৮৪
৪৬. "জানো, আমি লিখছি বাবা" - শুভ শঙ্কর সরকার (মনের কথা) ৮৫
৪৭. খসে পড়া কেশগুচ্ছ - মুকুল ৮৬
৪৮. শালিকপুরাণ - মুজিব মেহদী ৮৭
৪৯. গাঙচিল চোখ - শেখ জলিল ৮৭
৫০. বসন্ত চলে যায়...তুমিও চলে - পথিক ৮৮

৫১. অয়েট. . . - ছায়ার আলো ৮৯
৫২. বৃদ্ধাশ্রম (একটি ফিউচার ফিকশন) - জেবতিক আরিফ ৯০
৫৩. বাঙালি মুসলমানরাই সবচেয়ে লিবারেল ? - ফাহমিদুল হক ৯২
৫৪. একটি ধর্মের উতস সন্ধানে - দিগন্ত ৯৩
৫৫. বঙ্গভঙ্গ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট - বিবর্তনবাদী ৯৪
৫৬. এই খোকা - প্রিয়তি ৯৭
৫৭. আমি.... চিত্র ।- নিবিড় অভ্র ৯৭
৫৮. "আমার বন্ধু অনিক" - (জনমানুষের ভীড়ে নির্বোধ আরণ্যকের জীবনকাহন) - আরণ্যক যাযাবর ৯৮
৫৯. তোমার রক্তপাল্জেরী আর আমার ব্লুবেরী রাত - অরন্য আগুন ৯৯
৬০. ভালবাসা! এইতো শেষ৷ –পুতুল ১০১
৬১. মৃত্যুতেই ক্ষমা - অপেক্ষায় থাকো আরিফুর রহমান - মনিটর ১০২
৬২. উটের মুতে ভেসে যায় আমাদের এস এম এস জীবন - লাল দরজা ১০৩
৬৩. বাস্তবে কাকে ইশ্বর ভালোবাসেন? - রাসেল (. . . . .) ১০৪
৬৪. মাটির কান্না - লেখাজোকা শামীম ১০৫
৬৫. স্টেরিওটাইপের কথকতা - রাগিব ১১১
৬৬. বছরে এই দিনটিতে ফুল কিনতে কখনও ভুল হয় না। - এস্কিমো ১১৩
৬৭. লাল গাড়ি ও আমাদের লাল বালিকারা - মাদারি ১১৫
৬৮. পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষদের কথা - মাথামোটা ১১৮
৬৯. অবশ্য পাঠ্য আগুন পোস্ট - রিয়াজ শাহেদ ১১৯
৭০. তুমি কি দেখেছো কভূ জীবনের পরাজয় ? দু:খের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়. . . - আইরিন সুলতানা ১২১
৭১. দুর্দিনের ছোটগল্প: ভালোবাসা ও নুন ঝালের দিনগুলো - তীরন্দাজ ১২৪
৭২. নৈর্ব্যক্তিকতা বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত মতামত. . . (উৎসর্গ রাশেদ আর এস্কিমো, যাগো জীবনে কোনদিন চোখে দেখি নাই) - জামাল ভাস্কর ১২৬
৭৩. মুক্তিযোদ্ধা ও আমার হতাশা - মাহবুব সুমন ১২৭
৭৪. যে রাতটি আমার নির্ঘুম কাটে - সামী মিয়াদাদ ১২৮
৭৫. আমি যেদিন নিজের হাতে খুন হয়েছিলাম –আকাশচুরি ১৩১
৭৬. একজন অতিমানবের গল্প - মোস্তাফিজ রিপন ১৩৪
৭৭. ব্লগালয়ে জামাতের কর্মসূচী' র মূল লক্ষ্য - আ রিফুর রহমান ১৩৭
৭৮. হাওয়া হাওয়া . . . . - ৃৃমম ১৩৮
৭৯. আমার সাথে এক ভিখারীর কিছুক্ষণ - চির সবুজ ১৪০

৮০. বরুণাদের জন্য অভিশাপ. . . . . ।। - ভাঙা চাঁদ ১৪১
৮১. হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধঃ ৫ই মার্চ ৭১, কয়েদিরা জেল ভেঙ্গে যান শহীদ মিনারে । - আবুল বাহার ১৪২
৮২. দূর্নীতি বনাম স্বজনপ্রীতি ও জাতি হিসেবে আরব জনগন - নাজিরুল হক ১৪৩
৮৩. একটি চন্দ্র বালিকার গল্প - নাদান ১৪৫
৮৪. ভালবাসার রোদ বৃষ্টি. . . . . . - পুসকি ১৪৭
৮৫. মাতাল রাতের মত আমি বিস্মিত হই- - - - - রুবেল শাহ ১৪৭
৮৬. ভালোবাসার সংজ্ঞা খুঁজি! - দেবদারু ১৪৮
৮৭. চল স্বপ্ন উড়াই - নিবেদীতা ১৪৮
৮৮. এসো – আশরাফ ১৪৯
৮৯. অচিন- তনু ও দেবতা বিষয়ক জটিলতা/ গল্প - মাজুল হাসান ১৫০
৯০. কার চোখেতে? - সাতিয়া মুনতাহা নিশা ১৫৪
৯১. সিগারেট তুমি গ্রেইট - রুদ্র আনোয়ার ১৫৪
৯২. আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট - সু- শান্ত ১৫৫
৯৩. গি দ্য মোপাসাঁ' র গল্প - ' বেচাকেনা' - মোসতাকিম রাহী ১৫৭

লাল গাড়ি আর লাল বালিকার গল্প

নিধিরাম সর্দার
২৮ শে নভেম্বর, ২০০৭ রাত ১০: ৫৫

আমার দরকার গতি। তীব্র বেগে গাড়ি চালাতে আমার ভালো লাগে। লাল রংর গাড়ি আমার পছন্দ। হুড খোলা গাড়ী। পাশে থাকবে জীবন সঙ্গী যার চুল উড়বে হাওয়ায়। এ স্বপ্ন দেখছি সেই সতেরো বছর বয়স থেকে। গাড়ী দোকানের সামনে নতুন ভলবো, অডি, মার্সিডিস আর বি এম ডাব্লু দেখে সে স্বপ্ন লালন করেছি পুরা ছাত্র জীবন।

ছাত্র জীবনে যে স্বপ্ন দেখিছিলাম সে স্বপ্ন জীবনে অর্থনৈতিক সাফল্য আসলে পুরন করব বলে ভেবেছিলাম। চাকরি হলো, বউ হলো। স্বপ্নের অনেক কাছা কাছি চলে গেছিলাম, প্রায় বাস্তবে নামিয়ে এনেছিলাম লাল রংর হুড খোলা গাড়িতে মন্টানার স্পীড লিমিট লেস হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর স্বপ্ন। আর্থিক সম্পতি হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্ন আর পুরন হলোনা। গাড়ির বদলে জীবনে আসলো একটি নতুন জীবন। ছোট ছোট হাত আর পা, আধো গলায় বলে উঠে "বাবা"। সে এক মধুর ডাক, আন্দোলিত হয়ে উঠে বুক। জীবনের সুখের খোজে তৃষ্মা বেড়ে যায়।

সেই ছোট্ট মেয়েটি আমার জন্য চা বানায়, তার সাথে আমি খেলি রান্নাবাটি। কার্টুন দেখি, দুজনে মিলি বানাই ফুলের বাগান। রাতে ঘুমাবার আগে পড়ি "দ্যা লিটল মারমেড" । ছোট্ট মেয়েটি স্বপ্ন দেখে তার রাজপুত্র আসবে। আমার নতুন হুড খোলা গাড়ীর স্বপ্ন বড় তুচ্ছ, তার নতুন জীবনের আশার কাছে। আমার মেয়ের স্বপ্ন হয়ে যায় আমার স্বপ্ন।

যখন তাকে সকালে স্কুলে নামাতে যাই আমার মিনি ভ্যানে, পাশের লেনে একটি নতুন হুড খোলা স্পোরটস কার দেখে আমার স্বপ্ন পুরন হলোনা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফালাই, পরোক্ষনে যখন শুনি আমার মেয়ের বাবা ডাক আর সে যখন বলে আজরাতে আমরা কি খেলবো তখন সেই লাল গাড়ীর চেয়ে এ লাল টুকটুকে মেয়েটিকে বড় ভালো লাগে। তার চুলির ঝুটি নেড়ে সে যখন বলে বাবা আমি তোমায় ভালবাসি, তকন মনে হয় এই তো জীবন কি ছোট, কত কি পাবার আচে আর আমি কিনা চেয়েছিলাম লাল গাড়ি।

আমার মেয়ে আমায় ভালোবাসে, হাজার হাজার লাল গাড়ি, চাদনি রাতের হাসি তার কাছে কিছুই নয়। তার হাসি আমাকে স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে নিয়ে আসে জীবনে যাতে আচে হাসি কান্না আর সুখ অসুখ। বড় ভালো লাগে সে মেয়েটির মায়াবী হাসি।

http://www.somewhereinblog.net/blog/nidhiramblog/28748235

বিশ্ববাজারে খাদ্যঘাটতি ও বাংলাদেশ: "ক্ষুধিতের বিপ্লব শুরু হতে আর দেরী নেই"

তীরন্দাজ
০৫ ই এপ্রিল, ২০০৮ দুপুর ২: ২৯

গতকাল এক জার্মান পত্রিকায় "ক্ষুধিতের বিপ্লব শুরু হতে আর দেরী নেই" শীর্ষক খবরটি পড়ে এই লেখাটি শুরু করছি। শিরোনামের পর এভাবে লেখা হয়েছে। "ইকুয়াডরের চাল, জার্মানীতে দই অথবা ফ্রান্সের রুটি, যাই হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে খাদ্যদ্রব্যের দাম ক্রমাগত ও ভায়াবহ গতিতে বেড়ে চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে বিপদে আছে গরীব রাষ্ট্রের গরীব নাগরিকরা। তাই বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সাহায্যসংস্থাগুলো দ্রুত বিশ্বব্যপী এই সমস্যার জন্যে বিশ্বোপযোগী সমাধান দাবী করছে। "

প্রকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবর্তন, জ্বালানী তেলের উর্ধমুখী দাম, চীন ও ভারতের নিজেদের বর্ধিত চাহিদা খাদ্যদ্রব্যের এর অবিরাম ও রেকর্ডপরিমাণ উর্ধগতিতে সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে। হাইতিতে নুডলস এর দাম দ্বিগুন, মিশরে বেড়েছে রুটির ৩৫% ও ভোজ্যতেলের দাম ২৫% ।

পাশাপাশি দ্রুত উন্নতিশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে চীন ও ভারতে ভোজ্যপন্য ব্যাবহারের পরিমানও বেড়েছে অনেক। চীনে ১৯৮০ সাল থেকে মাথাপিছু মাংস খাওয়া বেড়েছে ১৫০ শতাংশ। সেখানে শুয়রের মাংসের দাম গতবছরে বেড়েছে ৫৮ শতাংশ।

এই অবধি পত্রিকার খবর ও তার সারাংশ। এসবের আলামত অনেকদিন যাবৎই চোখে পড়ছে। আমার স্ত্রী একটি কোম্পানীতে কাজ করে, যারা পাইকারী হারে চীন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জার্মানীতে অরগ্যানিক খাবারদাবার আমদানী করে। তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। গতবছর অবধিও চীন নিজ দেশের রপ্তানীকারকদের সাবসিডি দিয়ে উৎসাহিত করতো। ওদেরকে কোন ট্যক্স দিতে হতো না। এবছর সে সাবসিডি বন্ধ করেছে, নানা ধরণের ট্যক্স বসিয়ে পুরোনো রপ্তানীচুক্তিকে আরো বেশী কঠিন করতে চাইছে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি দেশই এখন খাদ্যসংকটে ভুগছে। যাদের নেই, তারা তাদের ক্ষমতানুযায়ী আমদানী করে সে সংকট পূরণ করতে চাইছে, যাদের আছে, তারা তা রপ্তানী না করে সামনের দিনের জন্যে মজুদ রাখতে চাইছে। ফলে ধনী দেশের মানুষ কোনভাবে খেতে পারলেও, আমরা না খেয়ে বা আধপেটা থাকছি।

আমাদের দেশে চালের দাম এখন দ্বিগুনের চেয়েও বেশী। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে সাধারন মানুষ। এই অবস্থাকে দুর্ভিক্ষ বলা যেতে পারে কি, এ নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। আমরা ভারত কে চালের দাম বাড়িয়েছে বলে অভিযুক্ত করি। এসব বিষয় ও তার কারণ নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাইছি। ভারতের দিকে আঙ্গুল তুলে ভারত বিদ্বেষীরা রাজনৈতিক উদ্দেস্য হাসিল করতে পারে বটে, তবে তাতে আসল সমস্যা ধারেকাছেও আসা হবে না। ভারত আমাদের কথা না ভেবে, তার নিজের নাগরিকদের কথাই ভাববে ও এটাই স্বাভাবিক। ভারত বিদ্বেষীরা ভারতের কাছে যা আশা করে, নিজেদের পরিমন্ডলে নিজেরাও তা পূরণ করতে সক্ষম নয়। এরা কোনদিনও নিজের সন্তানের পেটে আগে খাবার না দিয়ে অন্যকে সাহায্য করতে চাইবে না। আমি নিজেও তা করতে যাব না। তারপরও জানি যে, অন্যের আছে এধরণের দাবী বা প্রত্যাশার অধিকারও আমার নেই। ওরা তা জানে না, বা জানতে চায় না, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলই এদের কাছেই মুখ্য বলেই আঙ্গুল তুলে অন্যকে দোষারোপ করে। আমি ভারতপন্থীও, ভারতবিদ্বষীও নই, কারণ জানি, নিজেদের প্রয়োজনকে পাশ কাটিয়ে কেউ আমাদের জন্যে কিছুই করবে না ও এটাই স্বাভাবিক। কোন দেশই নিজের লাভ না দেখে অন্যের জন্যে কিছু করবে না। আমদের দেশ ধনী হলেও করতো না।

১) বাংলাদেশের বাজারদর নির্ধরিত হয় বড় ব্যাবসায়ী ও আড়তদারদের সিন্ডিকেটের হাতে। পাশাপাশি ব্যাবসায়িক সুবিধার আশায় এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থও বহন করে। এরা জানে, তত্বাবধায়ক সরকার সাময়িক। এরা তাই সরবরাহ কমিয়ে বা বন্ধ করে দিয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে।
২) সিডরের ক্ষতি।
৩) আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতি।
৪) সরকারের অযোগ্যতা।

এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি, যা আরো বেশী ভয়ংকর মনে হয়। ধনী ও উন্নত দেশগুলো ইদানীং "পরিবেশবাদের ধুয়ো তুলে" জৈব জ্বালানীর দিকে ঝুকছে। আলামত টের পাওয়া যাচ্ছে বেশ ভালভাবেই। জার্মানীতে যোগাযোগমন্ত্রী পেট্রোলে যাতে জৈব জ্বালানীর পরিমান ৫% এর বেশী না হয়, সে নির্দেশ দিয়েছেন। গরীব দেশের প্রতি অনুকম্পা তার কারণ নয়, কারণ কিছু পুরোনা মডেলের ইন্জিনের এই খাদ্য নাও হজম হতে পারে। অর্থাৎ জৈব জ্বালানী এখন আর পরিকল্পনা নয়, চরম বাস্তবতা। ৫% হলেও এখনই এখানকার গাড়ীতে মানুষের মুখের আহার কেড়ে জৈব জ্বালানী ঢোকানো হচ্ছে। বুশও গরীব রপ্তানীকারক দেশগুলোকে আখের চাষ করতে বাধ্য করাতে চাইছে, যাতে আমেরিকায় জ্বালনী তেলের অভাব না হয়।

সে সমস্ত দেশের সাধারণ চাষীদেরকে এ ধরণের চাষে বাধ্য করছে সে দেশের জমিদার শ্রেনীর ব্যাবসায়ীরা। অনেকটা আমাদের দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সময়ের কুখ্যাত "নীল চাষের" মতো। কী ভয়ংকর! মানুষের পেটের খাবার কেড়ে নিয়ে যন্ত্রের পেটে ঢোকানো! কিন্তু এটা সত্যি, সাইন্স ফিকশন বা বানোয়াট কোন কাহিনী হয়। আমাদের সত্যিই দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে এবার। এখন প্রবল চাপে নি: শ্বাস বন্ধ হতে বাকী।

কিন্তু করনীয় কি? আমার মতো চুনোপুটির কি বলার থাকতে পারে? শুধুই বলতে পারি আমাদের সমস্যার আরো কাছাকাছি আসার চেষ্টা করা উচিৎ। এখন তথাকথিত বিশ্বায়নের যুগে প্রতিবেশীর দিকে আঙ্গুল তুলে অভিসম্পাত বিদ্বেষ বাড়াতে পারবে বটে, কিন্তু লাভ হবেনা সামন্যও। যেখানে পৃথিবীর অনেক অংশে সীমানাই তুলে দেয়া হয়েছে, সেখানে আমরা প্রতিবেশীর সাথে বাস, ট্রেন যোগাযোগ বা করিডোর হলেই "সব নিয়ে গেল, মারলো রে, খাইল রে" বলে পাড়া মাত করি। পাড়া মাত করার দিন এখন শেষ। আমাদেরকে প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে আরো দুরে তাকাতে হবে। নিজেদের দেশে সাবধানতা, পরিকল্পনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি দেশের বাইরেও আন্তর্জাতিক জনমত তৈরী করতে হবে। ইওরোপের সাধারণ মানুষের মাঝে অনেকে রয়েছেন তাদের সরকারে আগ্রাসী বানিজ্যক মনোভাবকে সমর্থন করেন না। তারা অনেকেই এখনই সোচ্চার। তাদের মাঝেও জনমত তৈরী করতে হবে, যাতে জৈব জ্বালানী উৎপাদন মানবিক কারণেই পুরো নিষিদ্ধ করা হয়। এরা বিশ্বায়ন বিশ্বায়ন বলে গলা ফাটায়, গরীব দেশগুলোর খাদ্য সমস্যাও যে বিশ্বায়নের একটি জরুরী অংশ, সেটা পরিস্কার বুঝিয়ে দিতে হবে বিশ্ববাসীকে। **তা না হলে "ক্ষুধিতের বিপ্লব শুরু" করা না ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না ক্ষুধিতের।**

http://www.somewhereinblog.net/blog/nantublog/28785415

ফিরে পেতাম যদি সেই দিনগুলো(. . . . আব্বুকে)

শফিউল আলম ইমন
০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ১১: ৫৪

১.
আমবাগান মাঠে ঘুড়ি উড়াচ্ছি. . . হঠাৎ দেখি আমার ঘুড়ি নাই. . . অন্য একটা ঘুড়ি এসে কেটে নিয়ে গেছে আমার ঘুড়ি. . . . . তারপর শুরু হলো আমার কান্না(তখন আমি ক্লাস থ্রি কিংবা ফোরে পড়ি) . . . .
আমার কান্না দেখে এলাকার কেউ একজন আমার আব্বুকে গিয়ে বলেছিলো. . . .
(তখন আমাদের একটা মুদীর দোকান/ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিলো যেটা খুব বেশী দুরে না)
তারপর শুনে আব্বু এসে বলে. . . . . কি হয়েছে বাবা. . . . ?
আমার ঘুড়ি কেটে নিয়ে গেছে. . . . . .
তাতে কি আয় আমার সাথে আয় . . . . পাঁচটা ঘুড়ি কিনে দেব সাথে দুই বান্ডিল সুতা. . . . .
তারপর সেটা নিয়ে এসে কান্না থামলো. . . .

২.
এলাকার মাঠে একটা ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল ছিলো. . . . . আমার বায়না ছিলো আমি খেলা দেখবো. . . আব্বু এসে আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে দোকানে চলে গিয়েছিলো সাথে দু- তিনজনকে বলে গিয়েছিলো যাতে আমাকে দেখে রাখে (অনেক পিচ্চি ছিলাম বলে)
তারপর নেট থাকার পরেও কিভাবে যেন বল এসে আমার গায়ে লাগে. . . . আমি সাথে সাথে কাইত. . . . তারপর খেলা বন্ধ. . . (মাহবুব সওদাগরের ছেলে বলে কথা) তারপর সবাই আমাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি. . . . . . ততক্ষণে আব্বু এসে হাজির. . . .
ভাগ্যিস আমার তেমন কিছু হয়নি. . . . হালকা লিকলিকে শরীর ছিলো বলে বলের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিলাম এই যা. . . . পরে আবার খেলা শুরু হয়েছিলো. . . . আর আমিও ছিলাম তবে সাথে দশ- বারো জনের একটা বডিগার্ড টিম।

৩.
একবার তেতুল খাওয়ার লোভে এলাকার কিছু ছেলেদের সাথে চলে গিয়েছিলাম অনেক দুরে. . . . . কোথাকার কোন একটা বিলে. . . . দেখি ইয়াবড় তেতুল গাছ. . . . . তারপর সবাই মিলে ঢিল ছুড়ে তেতুল পাড়াপাড়ি. . . . . তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো. . . অন্ধকার চারিদিকে. . . . .
বাসায় আসিনা দেখে. . . . . আব্বু টেনশনে. . . . শুরু হলো তল্লাশি. . . .
তারপর আমি বাসায় আসামাত্র আব্বুর চিৎকার . . . . এতক্ষণ কোথায় ছিলাম. . . . .
মাথা নিচু করে আমার সহজ সরল উত্তর. . . . তেতুল পাড়তে গিয়েছিলাম. . .
পরেরদিন. . . . আব্বু বাজার থেকে কেজি- দু' কেজি তেতুল নিয়ে এসে বলে খা. . . তেতুল খা. . . ।

৪.
স্কুলে থাকতে ইংরেজীতে খুব একটা ভালো করতাম না. . . .
তাই একদিন আব্বুকে বলি আমি আহমদউল্লাহ স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়বো. . . . .
আব্বু বলে ঠিক আছে. . . . পড়াইতে বলো. . . . সমস্যা তো দেখি না. . . .
আমি বলি. . . . উনি পড়ান না. . .
কেন?
স্কুলের হেড টিচার পড়াইতে দেয়না. . . .
তারপর পরেরদিন আব্বু স্কুলে গিয়ে হাজির. . . . . .
আমার ছেলে আহমদ উল্লাহ স্যারের কাছে পড়তে চাই. . . . . .
হেড টিচার বলে. . . . এ আপনার ছেলে. . . . . . সমস্যা নাই
আহমদ উল্লাহ স্যারকে আমি বলে দিবো আর সে তো চাইলে আমার কাছে ও পড়তে পারে. . . . . .

যাইহোক, পরের সপ্তাহে সমস্যার সমাধান হয়েছিলো. . . . .
আমি টেস্ট এবং এস. এস. সি' তে অনেক ভালো মার্ক পেয়েছিলাম পুরোটাই আমার প্রিয় শিক্ষক আহমদ উল্লাহ স্যারের কৃতিত্ব. . . . . . ।

৫.
তখন আমি কলেজে পড়ি. . . শীতকালে এমনিতে চারিদিকে পিকনিকের আমেজ। সেবার অনেক পিকনিকে(এলাকার বাইরে) গিয়েছি এবং এলাকাতেও (একটা মাঠ ছিলো) বন্ধুরা মিলে পিকনিকের আয়োজন করেছিলাম. . . . পরপর কয়েকটি পিকনিকে যাওয়ার কারণে বাসায় রাতে খাওয়া হতো না. . . . . .
একদিন রাতে আব্বুর সাথে খেতে বসেছি. . . . . হঠাৎ আম্মু বলে কি ব্যাপার তোমার পিকনিক কি শেষ. . . . . যাও যাও পিকনিক করে বেড়াও. . যত্তসব
আব্বু বলে. . . . . থাক্ না, কিছু বলতে হবে না. . . . . এখনি তো এসবের সময়. . ওরা এখন পিকনিক করবে না তো কখন করবে. . . . . . (সেদিন আব্বু ঠিকই বলেছিলেন. . . . . কেননা, এসব এখন শুধুই স্মৃতি)

৬.
ক্যান্ট পাবলিক কলেজ থেকে এইচ. এস. সি' পাশ করে ইচ্ছা হলো বাইরে পড়ব. . . কিনতু আব্বু চাই আমি চ. বি' তে পড়ি. . . . .
যাইহোক, চ. বি' র ভর্তি পরীক্ষায় ৬৭ নাম্বার পেয়ে বি. বি. এ' তে চান্স পেয়েছিলাম. . . . কিনতু আম্মুকে বলে দিয়েছি আমি দেশে পড়ব না. . .
কেন?
আমার সব বন্ধুরা বিদেশে চলে যাচ্ছে. . . . . আমিও যাবো
দেশে যদি পড়তে বলো তাহলে আমি ' নর্থ সাউথ' এ পড়বো. . . . .
আমার সহজ সরল আম্মু বলে সেটা আবার কি?
এটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি. . . . .
না তোমার আব্বু পড়াবে না সেখানে. . . . কেন?
আব্বু সারাজীবন শুনে আসছে চ. বি. কিংবা ঢা. বি' র কথা. . . . . তার কথা দেশের এত ছেলে মেয়েরা এখানে পড়তেছে তাইলে আমার সমস্যা কি?
যাইহোক, পরে দুইসপ্তাহ অনশন করলাম(বাসায় কারো সাথে কথা না বলে)
তারপর আম্মু আব্বুকে গিয়ে বলেছিলো. . . . . ও যখন বাইরে যেতে চাচ্ছে তাহলে ওর সাথে কথা বলে তো দেখতে পারেন. . . .
তারপর আব্বু একদিন শুনলেন সবকিছু(হলবর্ন কলেজে আসার কথা বলেছিলাম)
আব্বু চেয়েছিলেন আমি বাইরে গেলে ' নিউ ইয়র্কে' যায় কারণ সেখানে আমার মামা থাকেন সো আমাকে দেখে রাখার কেউ আছেন. . . . ।
পরে আমার কথামতই লন্ডনে আসার জন্য সবকিছু রেডি করলাম. . . ভিসাও হয়ে গেলো তারপর চলে আসার পালা. . . . . (তখনকার অনুভূতি ছিলো আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত)

৭.
২০০২ সালের ৩০শে অক্টোবর লন্ডনে আসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম. . . .
চট্টগ্রামের শাহ আমানত এয়ারপোর্টে যখন আসলাম আব্বুর চোখে তাকানো যাচ্ছিলো না. . . মনে হচ্ছে আব্বু এখুনি চিৎকার করে কাঁদবে. . .
চেক ইনের সময় হওয়াতে আব্বুকে বললাম. . . আসি. .
আব্বু দেখি এবার কেঁদেই দিলো সাথে ছোট্ট বোনটাও. . . .
ওদের সাথে আমিও কান্নার উৎসবে যোগ দিলাম. . . . .
তখন মনে মনে ভাবছিলাম আরো কিছুক্ষণ সময় কি দেওয়া যায়না. . . .
পরক্ষণে আব্বুকে বললাম. . . . . আব্বু আমি যাব না চলো বাসায় চলে যাই বলে কান্না. . . .

তারপর আব্বু বলে পাগলামো করিস না. . . . লন্ডনে পড়তে তোর ইচ্ছে হয়েছে. . . যা গিয়ে ভালো একটা ডিগ্রী নিয়ে আয় . .
আমি তোকে যেতে না দিলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না।
এই হলো আমার আব্বু।

৮.
আমরা গ্রামে ছিলাম তাই বাসায় চট্টগ্রামের আন্চলিক ভাষায় কথা বলতাম. . . এখনও বলি. .
অনেক শহুরে বন্ধুদের মত করে কখনো বলিনি কিংবা বলতে শিখিনি ' আব্বু তোমাকে অনেক ভালবাসি'
আমার আব্বু দারিদ্রের অভিশাপে বেশীদুর পড়ালেখা করতে পারেনি. . . তাই ছেলেমেয়েদের করিয়েছে এবং করাচ্ছেন সবচে ভালো স্কুল, কলেজে কিংবা প্রাইভেট পড়তে দিয়েছেন সবচে ভালো টিচারের কাছে।
আব্বু কোনদিন কিছুতে না বলেন নি. . . সবসময় আমার নিরাপত্তা নিয়ে টেনশন করবে. . যেন আমি এখনো সেদিনের অবোধ বালক. . . . এমনকি এখানে আছি পাঁচ বছরের বেশী হয় তাও বলবে. . . ঠিকমত চলাফেরা করো, পড়ালেখা করো, উল্টাপাল্টা কোন কিছু করো না. . . সময় করে নামাজ পড়বে. . . . আমাদের জন্য চিন্তা করতে হবেনা, আমরা সবাই ভালো আছি।

৯.
আজ অনেক কিছুই নেই. . . .
নেই সে ছেলেবেলার দুরন্তপনা. . . .
নেই সেই মাঠ. . . যে মাঠে উড়িয়েছিলাম ঘুড়ি. . . সেখানে দাড়িয়ে আছে হাসপাতাল. . .
সেই বিল. . . যেখানে ছিলো তেতুল গাছ. . . . সেখানে আজ মানুষের ঘরবাড়ি, উঠেছে দালানকোঠা. . .
সেসব বন্ধুরা যাদের সাথে পিকনিক করেছিলাম. . . . . জীবন যুদ্ধে সবাই বড্ড ব্যস্ত. . . . পড়ে আছে দেশে-বিদেশে (আমার মত)
এত সব না থাকার মধ্যে শুধু আছে কিছু স্মৃতি. . . . .
সেসব দিনগুলোর কথা ইদানীং খুব মনে পড়ছে. . . . .
মনে পড়ছে আমার আব্বুকে. . .
কেউ কি পারবে ফিরিয়ে দিতে সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো. . . .
যদি একবার ফিরে পেতাম. . . .
চিৎকার করে বলতাম ' আব্বু তোমাকে অ-নে-ক ভালবাসি. . . . তুমি অনেক ভালো. . . . তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ট আব্বু।

http://www.somewhereinblog.net/blog/metalfreakblog/28767395

সাম্প্রতিক খাদ্য সংকট ও আমাদের কৃষি

দিনমজুর
০৮ ই এপ্রিল, ২০০৮ দুপুর ১:২১

এক
ইদানীং সারাবিশ্বেই খাদ্য-পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শোনা যাচ্ছে, সকলকেই অনেক উদ্বেগ-উৎকন্ঠার সাথে বর্তমান বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বর্তমান খাদ্য সংকটের কারণ ও উৎস অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, বিশ্বজুড়েই খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমেছে, খাদ্যশস্যের মজুদও এখন অনেক কম। ফলে, হু হু করে বাড়ছে খাদ্যশস্যের দাম। খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে- জলবায়ুগত পরিবর্তনের কথা, বলা হচ্ছে কৃষিজমি হ্রাসের কথা প্রভৃতি। যদিও প্রকৃত কারণ, প্রকৃত অবস্থা এবং প্রকৃত সত্য অনুচ্চারিতই থেকে যাচ্ছে, যেমন করে বায়ুমণ্ডলে আমাদের বসবাস সত্ত্বেও প্রায়ই তা সম্পর্কে আমরা খুব কম সচেতন থাকি।

প্রকৃত সত্যঃ
প্রকৃত সত্য হলো, এখনও দুনিয়ার মোট উৎপাদন মোট চাহিদার তুলনায় বেশী। এটা ঠিক যে, বিগত কিছু সময়ে খাদ্য উৎপাদন কিছু কমেছে, দুনিয়ার খাদ্য মজুদও কমছে। গত বছরে গমের মজুদ কমেছে ১১ শতাংশ। কিন্তু আসলেই কি সবজায়গাতে খাদ্য উৎপাদন কমেছে? উত্তর অবশ্যই না। বরং বেড়েছে। ১৯৮০ সালের তুলনায় বর্তমানে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে ৪০ শতাংশ- যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশী, যদিও এসময় দুনিয়াব্যাপী ক্ষুধার্তের (FAO 'ক্ষুধার্ত' কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেঃ একজন যে প্রতিদিন বেঁচে/ টিকে থাকার মত খাবারটুকুও পায় না) সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৫৪ মিলিয়ন।

প্রকৃত অবস্থাঃ

কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে প্রকৃত চিত্রটি পরিষ্কার করি।
১। গত বছরে দরিদ্র দেশগুলোর খাদ্য আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৫ ভাগ যা ১০৭ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ। (বিঃদ্রঃ ১০৭ মিলিয়ন ডলার মোট আমদানী নয় - এটা গত বছরের বাড়তি আমদানী!!)
২। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধির ইনডেক্সে দেখা গেছে শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে।
৩। গম ও তৈলবীজের মূল্য রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গমের মূল্য প্রতি টনে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩০ ডলার, এই বৃদ্ধির হার ৫২ শতাংশ।
৪। গত ৫ বছরে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার খাদ্য ক্রয় মূল্য ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫। মানব খাদ্য উৎপাদনের পরিবর্তে অ্যাগ্রোফুয়েলের কাঁচামাল উৎপাদনে বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে এবং হচ্ছে। পশু খাদ্য উৎপাদনও বেড়েছে।
ফলাফল- পৃথিবীতে ক্ষুধার্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রধান জ্যাসফ ডাফ জানিয়েছেন- এভাবে চলতে থাকলে খুব অল্প সংখ্যক লোকের খাদ্য কিনে খাওয়ার সক্ষমতা থাকবে।

এর বিপরীতে আরো কয়েকটি চিত্র দেখা যাক।
১। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের চাল রপ্তানীর ১২ শতাংশ দখল করে আছে। ২০০৬ সালে আমেরিকা প্রায় ১.৮৮ বিলিয়ন ডলারের ধান উৎপাদন করেছে- যার প্রায় অর্ধেক রপ্তানী করে।
২। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকারী বহুজাতিক কর্পোরেট কোম্পানীগুলোর অধিকাংশেরই নীট মুনাফা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিশ্ব-রপ্তানী বাণিজ্য গুটিকয়েক কোম্পানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন- মোট গম রপ্তানীর ৮৫-৯০% অংশীদারিত্ব মাত্র ৩-৬ টি কোম্পানীর, একইভাবে কফি রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই হার ৮৫-৯০% ধানের ক্ষেত্রে ৭০%

৩। আমেরিকায় সরাসরি খাদ্যের জন্য ৫৮ ভাগ চাল ব্যবহার করা হয়, ১৬ ভাগ ব্যবহার করা হয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হিসাবে এবং ১০ ভাগ গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসাবে।
৪। ২০০৭ সালে ইউএসডিএ প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে যুক্তরাষ্ট্র ৯০.৫ মিলিয়ন একর জমিতে ভুট্টা চাষ করার পরিকল্পনা করে- যা ১৯৪৪ সালের পরের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশী। এত বেশী জমি ভুট্টার চাষের আওতায় আনার উদ্দেশ্য অ্যাগ্রোফুয়েল।

প্রকৃত কারণঃ
কৃষি উৎপাদন কমেছে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে, তারাই সেকারণে তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষে উন্নত দেশসমূহের উদ্বৃত্ত খাদ্যের দিকে হাত বাড়িয়েছে, খাদ্যশস্য আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে। উন্নত বিশ্বও কৃষি উৎপাদন কিছু কমিয়েছে- তবে সেটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই বা কারণেই (অ্যাগ্রোফুয়েল উৎপাদনে, পশুখাদ্য উৎপাদনে মুনাফা অনেক বেশী) কমিয়েছে। উন্নত দেশসমূহ খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি, মজুদ হ্রাস প্রভৃতি প্রচারণা তুলে- নিজেদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য চড়া মূল্যে বিক্রি করছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশসমূহে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসে জলবায়ুগত দুর্যোগের প্রভাব থাকলেও তা নগণ্য। এবারে কিছু চিত্র তুলে ধরে দেখানোর চেষ্টা করবো কিভাবে এই দেশসমূহের কৃষি উৎপাদন কমছে।

১। *অসম কৃষি ভর্তুকিঃ* বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষিচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর থেকে স্বল্পোন্নত/অনুন্নত দেশসমূহ কৃষি ভর্তুকি প্রায় শূণ্যের কোঠায় নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অথচ, যেসব উন্নত অর্থাৎ ওইসিডি দেশে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১৯৯৫ সালে ১৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯৭ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০ বিলিয়ন ডলার, ২০০১ সালে ৩১৫ বিলিয়ন ডলারে, ২০০২ সালে ৩১৮ এবং ২০০৫ সালে এসে দাঁড়ায় কমবেশী ৩০০ বিলিয়ন ডলারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০ ডলারে ভর্তুকি দিতে হয় ২৫ থেকে ৩০ ডলার। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভর্তুকির পরিমাণ ৪০-৫০ ডলার।

২। *মুক্তবাণিজ্যঃ* কৃষিক্ষেত্রে কোটা ও উচ্চশুল্ক আরোপ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ কৃষিপণ্যের আমদানীকে প্রতিরোধ করেছিল। ১৯৯৫ সালে "এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার" কৃষিচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কৃষিচুক্তি, কোটা পদ্ধতি বাতিলের মাধ্যমে কৃষিবাজার উন্মুক্ত করতে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষিপণ্য স্বল্প শুল্কে আমদানী করতে বাধ্য করে।

ফলাফলঃ আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চ ভর্তুকির কারণে বিশ্বব্যপী কৃষিপণ্যের দাম কমে যায়। আর উল্টো দিকে তৃতীয় বিশ্বে ভর্তুকি হ্রাস, বেসরকারী খাতে কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হ্রাস প্রভৃতি কারণে কৃষি উৎপাদনের খরচ বাড়তে থাকে। আবার অন্যদিকে মুক্তবাজারের কারণে উন্নত দেশসমূহের কমদামী পণ্যের সাথে প্রতিযোগীতার মুখে উন্নয়নশীল দেশের পণ্য টিকতে পারে না। ফিলিপিন, ভারত, শ্রীলংকা সহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের অসংখ্য চাষী দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ফিলিপন বিশ্লেষক এইলেন কও বলেছেন, শস্যের মূল্য একবার কমে যাওয়ার কারণে দেখা গেছে, প্রতিযোগীতায় টিকতে পারবে না বলে অনেক কৃষক ভুট্টা জমিতেই রেখে এসেছেন এবং সেগুলো জমিতেই পঁচে নষ্ট হয়। ঘানায় মাঠের পর মাঠ পতিত পরে থাকতে দেখা যায়, তারই পাশে দেখা যায়- আমদানীকৃত খাদ্য শস্যের বস্তা। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে শুল্ক উদারনীতির প্রতিক্রিয়ায় ১৯৯৮ সালে কমপক্ষে ২৩৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করে, আর ২০০২ সালে ২৬০০ এর বেশী কৃষক আত্মহত্যা করে।

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষিখাতে যে ভর্তুকি দিয়েছে তা মোট কৃষি উৎপাদনের ১.৫৪% ১৯৯৮-৯৯ এ এই হার নেমে দাঁড়ায় ০.৮৯% এ, আর ২০০১-০২ এ এই হার ছিল ০.৬৭% এর মানেই হলো বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষিতে আসলে তেমন কোনো ভর্তুকি দেয়া হয় না। যেটুকুও বা দেয়া হয় সেচ, সার ও বীজের ক্ষেত্রে তার খুব সামান্যই ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে পৌঁছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষিতে বাজেট বাড়ানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে- প্রত্যক্ষ সেবা খাতে বাজেট আসলে কমে গেছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে কৃষি বাজেট যেখানে ৯০% বেড়েছে, সেখানে কৃষি বিষয়ক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বাজেট বেড়েছে ২০০% আর কৃষি সেবায় কমেছে ১০%

অন্যদিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষিচুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুলে দেয়া হয় কৃষি পণ্যের বাজার। বাংলাদেশে শুল্ক হ্রাসের প্রবণতা বিশ্বব্যংক, আইএমএফএর পরামর্শে আরো আগে শুরু হয়েছিল। ১৯৯২-৯৩ এ বাংলাদেশে আমদানী শুল্কের মোট ১৫ টি ধাপ ছিল যেখানে সর্বোচ্চ শুল্ক ছিল ৩০০% ১৩ বছর পর ২০০৪-০৫ এ এসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫% (ধাপ চারটিঃ ০% ৭.৫% ১৫% ও ২৫%)।
এই দুই প্রভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা আরো বেশী ঋণগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ছে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা, কমছে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ। ২০০০-০১ সালে মোট কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৮ লাখ হেক্টর যা এই সময়কালে কমে হয়েছে ৮৪ লাখ হেক্টর।

এভাবে উন্নয়নশীল দেশের কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে, দেশের কৃষিকে ধ্বংস করে এবং খাদ্যশস্যের জন্য উন্নত দেশসমূহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বানিয়ে, তারপরে সুযোগ বুঝে খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়ে উন্নত বিশ্ব গড়ে তুলে মুনাফার পাহাড়।
এবারে বাংলাদেশের কৃষির অবস্থাটি একটু বিষদে দেখা যাক. .

দুই
ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। যে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৬% বাস করে গ্রামাঞ্চলে। আবার গ্রামাঞ্চলের ৯০% মানুষ জীবিকার জন্য সরাসরি কৃষি খাত ও কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বাধিক কর্মসংস্থানের খাতটি হচ্ছে কৃষি। বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৫১.৬৯% ই হয়েছে কৃষিখাতে এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান হচ্ছে ২১.৭৭% সবচেয়ে বড় কথা- দেশের মানুষের অন্ন জোগাতে এই খাতটিই প্রধান ভূমিকা রাখে। তো, বর্তমানে এহেন গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবস্থাটি কেমন?

কৃষি খাত অলাভজনক খাত, কৃষকের মাথায় হাতঃ
আমাদের কৃষি, সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণে দারুন সংকটে নিমজ্জিত, কিন্তু এই নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সবচেয়ে কম। সার ও ডিজেল সংকটে কৃষকের আন্দোলনের সময় ব্যাতীত এবং সম্প্রতি খাদ্য ঘাটতির সময় ব্যাতীত আমরা সাধারণত কৃষি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে চাইনি কখনোই। অথচ, আমাদের অর্থনীতির প্রাণ এই কৃষি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কৃষকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে যে উৎপাদন করে, শেষ পর্যন্ত তার উৎপাদন খরচই সে তুলতে পারে না। ফলে অব্যাহত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে সে ঋণের দায়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে তার শেষ অবলম্বন এক টুকরো আবাদী জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এভাবে সর্বস্বান্ত ও বেকার হয়ে পড়ে, বাঁচার তাগিদে সে শহরে পাড়ি জমায়।
নীচের সারণীতে এক পলক চোখ বুলালেই আমরা দেখতে পাবো, কিভাবে ধীরে ধীরে কৃষি একটি অলাভজনক খাতে পরিণত হয়েছে।

<u>সারণী- বিভিন্ন ফসলের প্রাপ্তি/ব্যয় অনুপাত</u>

শস্য/বছর	১৯৮১/৮২	১৯৮৬/৮৭	১৯৯১/৯২	১৯৯৬/৯৭	২০০১/০২	২০০৫/০৬
আউশ (দেশীয়)	০.৯৬	১.০৪	১.০৯	০.৬৬	০.৭৬	০.৬২
আউশ (উফশী)	১.২৮	১.৩৩	১.৩৬	০.৮২	০.৭৬	০.৮১
আমন (এলটি)	১.৪৯	১.৮৫	১.৪৮	১.০৬	১.০৬	০.৯৬
আমন (এম)	১.২২	১.৭৯	১.৬৫	১.০৯	১.২৭	০.৯৯
বোরো (এলটি)	১.৪৬	১.১৩	০.৯৮	০.৬৫	০.৮৩	০.৭০
বোরো (এম)	১.৪৪	১.৬৯	১.৩২	০.৯৮	১.০২	০.৮৯
গম (এম)	১.৩৩	১.১৪	১.১৬	১.০৯	১.০৪	১.০৭

লাভজনক না হওয়ার কারণগুলোঃ
প্রথমত, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় উপকরণ খরচের হার বেড়েছে।
দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়ার হার উপকরণের দাম বাড়ার হারের চেয়ে কম হয়েছে।
তৃতীয়ত, উপকরণ ব্যয় বাড়ার হার অত্যন্ত উচ্চ ও দ্রুত হয়েছে বাজারবিরোধী তৎপরতায় (যেমন মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, কালোবাজারি ও মজুতদারি)।

চতুর্থত, কৃষি উদারীকরণের কারণে বাজার এমনভাবে নিয়ন্ত্রণহীন করা হয়েছে যে বাজার থেকে উৎপাদকরা কম ও ব্যবসায়ীরা অধিক লাভ পেয়েছে। যেহেতু বাজারে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা নেই, সেহেতু ব্যবসায়ীরা কৃষক তথা উৎপাদকের কাছ থেকে তুলনামূলক কম দামে পণ্য কিনে নেয়। আর ব্যবসায়ীদেরই বাজারে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, যা উৎপাদকের নেই।

কৃষিখাতটি এহেন অলাভজনক হওয়ার এই কারণগুলোর আরো গভীরে ঢুকতে চাইলে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দেয়া দরকার। নীচে একে একে সংক্ষেপে সে আলোচনাটি করা যাকঃ

বিএডিসি'র ভূমিকাঃ সোনালী(!!) অতীতে
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কার্যত এককভাবেই কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন সার, বীজ, কীটনাশক ও সেচ-যন্ত্রপাতি আমদানী, সংগ্রহ ও বিতরণ-বিপননের কাজগুলো করত। একটা সময়ে ভর্তুকি দিয়ে বিএডিসির মাধ্যমেই এককভাবে সার বিতরণ করা হত। এই ভর্তুকির ব্যবস্থার ফলে ক্ষুদ্র ও গরীব কৃষকদের জন্য কম দামে সার কেনার সুযোগ ছিল। এছাড়াও বিএডিসির তত্ত্বাবধানে সমবায়ভিত্তিক মালিকানা ব্যবস্থায় কৃষকদের পানি-সেচের সুবিধা দেয়া হত। এই ব্যবস্থায় সেচ কার্যক্রমের ব্যয় কম পড়ত বলে দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা সহজেই সুযোগটি নিতে পারত। অন্যদিকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সেচের পানি সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের কাজ দেখভাল করত। ব্যবসায়ী-সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেটি এড়াতে বা মোকাবেলায় টিসিবির মাধ্যমে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারত। এ দেশে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) নামের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারত।

কৃষির বিরাষ্ট্রীয়করণ ও উদারীকরণঃ
উপরের চিত্রটি আজআর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন?
১৯৭১-৭২ অর্থবছরে যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় কৃষি খাতে সরকারের মূলধনী ব্যয় ছিল ৩১% সেখানে তা কমতে কমতে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৩% এরও নীচে নেমে এসেছে। তেমনিভাবে ১৯৯১ সালে যেখানে কৃষি খাতে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছিল ১০% সেখানে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তা কমে ১.২% এ নেমে আসে। এর অর্থ হল, কৃষি খাতে সরকারের ভর্তুকি প্রদান মারাত্মকভাবেই কমেছে। কেন?

কারণ, কৃষির বিরাষ্ট্রীয়করণ ও তথাকথিত উদারীকরণ।
আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশ কৃষি উপকরণ সরবরাহ খাতে উদারীকরণ তথা বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু করে। এটি করা হয় কৃষিতে বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং বহির্বাণিজ্য উদারীকরণ মানে আমদানী পর্যায়ের শুল্ক হ্রাস করার মাধ্যমে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফএর চাপে ক্রমান্বয়ে কৃষিখাতে ভর্তুকি হ্রাস ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সেবা সুবিধা কমিয়ে আনার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষিতে দ্রুততর উদারীকরণ ঘটে।

বিশ্বব্যাংক ১৯৭৯ সালে খাদ্যনীতির ওপর প্রথম একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর বছর তিনেক পরে ১৯৮২ সালে 'বাংলাদেশঃ খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা ও ফসলের বৈচিত্র্যকরণ' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দুটি প্রতিবেদনেই বিশ্বব্যাংক উৎপাদন বাড়ানো ও খাদ্যশস্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের ওপর জোর দিয়ে কৃষি উদারীকরণের পরামর্শ দেয়।

'কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি' - স্যাপঃ
এরই মধ্যে অর্থাৎ আশির দশকের গোড়ার দিকে স্যাপ এর আওতায় বাংলাদেশের কৃষি খাতে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলে। এই কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছেঃ

- কৃষিখাতে বিশেষ করে সারে ভর্তুকি হ্রাস/ প্রত্যাহার, সার সরবরাহ- ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ,
- আশির দশকের শেষ নাগাদ বেসরকারীভাবে সেচ যন্ত্রপাতি আমদানীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার,
- ১৯৯৫ সালে বেসরকারী খাতে চালসহ খাদ্যশস্য আমদানীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার,
- কৃষি খাতে বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মাধ্যমে সার আমদানী, বিক্রয় ও বিতরণ এবং সেচ কার্যক্রম ও বীজ বিতরণের দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে সংকোচন,
- আশির দশকেই সরকারীভাবে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন। পল্লী অঞ্চলে রেশন বন্ধ করে খাদ্য নিরাপত্তার নতুন কর্মসূচি কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও ভিজিডি (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) পরিচালনার নীতি গ্রহণ করা হয়।
- ১৯৯২ সালে জাতীয় বীজনীতি প্রবর্তন করে তাতে বীজ উৎপাদন বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে পাঁচটি শস্য এককভাবে সরকারের হাতেই রেখে দেয়া হয়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, কৃষি খাতের আয় ও লাভ কমে যাওয়ার বিষয়টি একাধারে জটিল ও বহুমুখী। তবে পুরোটাই বাংলাদেশের সরকারী তথা রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষত গত দেড় দশকে বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক কৌশলে ক্রমান্বয়ে কৃষি বিষয়ক সবরকম সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা তুলে নেয়ার কাজ করা হয়েছে। "মুক্তবাজার অর্থনীতিতে চাহিদা-যোগানের মিথস্ক্রিয়ায় পণ্য-সামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয়", "মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না", -এসব তত্ত্বকথা বলে বিশ্বব্যাংকের কথিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন (টিসিবি) সহ প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে ফেলায়, প্রয়োজনের সময় সরকারের পক্ষে কার্যকরভাবে বাজারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সমাধানঃ
সমাধান একটাই। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফএর কবল থেকে বেরিয়ে স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনরুজ্জীবিত ও সক্রিয় করা, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় ও বাজেটে কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রধান। ফলে অতীত সরকারসমূহের ভূমিকা পর্যালোচনা করে, জনগণের উচিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা- সর্বাত্মক কৃষি আন্দোলনের মাধ্যে সরকারকে বাধ্য করা এবং প্রয়োজনে কৃষি-বিরোধী সরকারসমূহকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে জনগণের প্রকৃত সরকার গঠন করা!!!
দুনিয়াজুড়ে, কৃষকদের আন্দোলন জোরদার হচ্ছে, কৃষকদের মধ্যে দাবিদাওয়া নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ আন্দোলন বিশ্বব্যাংক-আইএমএফডব্লিওটিও এর তাঁবেদার সরকারকে উচ্ছেদের আন্দোলনেও গিয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। কেননা, এটাই একমাত্র সমাধান।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আসলেই কি দাতাসংস্থার লম্বা হাত এড়ানোর ক্ষমতা আমাদের মত দেশের সরকারগুলোর আছে, যেখানে সরকার নিজেরাই দুর্নীতিবাজ? থাকলে, কিভাবে?
উত্তরে বলবো, অবশ্যই আছে। তবে সেটা যেকোন সামরিক বা সেনা সমর্থিত সররকারের চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের বেশী আছে। কেননা, এই সামরিক সরকারের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা গণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে কোনো অংশে বেশী থাকতে পারে না- হোক না গণতান্ত্রিক সরকার যতই দুর্নীতিগ্রস্ত!!

আসলে, গণতান্ত্রিক সরকারকে যেহেতু ৫ বছর পরপর হলেও জনগণের কাছে যেতে হয়- ফলে কিছুটা হলেও তার জনগণের কথা ভাবতে হয়। ফলে- সে সর্বদাই থাকে দুধরণের চাপের মধ্যে- একটি আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর, আরেকটি দেশের মানুষের। এখন দেশের মানুষের চাপটি যদি বড় করা যায়- মানুষের লড়াই সংগ্রাম যদি বেশী থাকে, তবে সে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে মাথা কম নোয়ায়। কিছু

উদাহরণ দেইঃ

স্যাপ কর্মসূচির আওতায়১৯৮৪-৮৫ সালে সার বিপণন বেসরকারীকরণ করা হয় (১৯৮৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে বিএডিসি থানা পর্যায়ের প্রায় ৪২৩টি বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়। ১৯৮৮ সালের মাঝামাঝিতে এসে প্রায় ৮০০০ পাইকার ও ডিলারকে প্রত্যাহার করা হয়), এবং মার্চ ১৯৮৯ সালে কারখানা থেকেও বেসরকারীভাবে সার সংগ্রহ ও বিপণনের অনুমতি দেয়া হয়।

কিন্তু ১৯৯৫ সালে আবার সরকার বাধ্য হয় ইউরিয়া সারের বিপণন ও বিতরণ পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে। এটি এখনও বজায় আছে। এটি কিন্তু বিশ্বব্যাংকের স্যাপ কর্মসূচির পরিপন্থী। একাজটি সরাকার করলো শুধুমাত্র এই কারণে যে- সে সময় সার নিয়ে কৃষকরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল- এমনকি বুকের রক্তও ঢেলে দিয়েছিল।

এছাড়াও আমাদের গ্যাস, বন্দর, কয়লা এসব নিয়েও দাতাগোষ্ঠীদের বিভিন্ন চক্রান্ত সফল হয় নি, বা গণতান্ত্রিক সরকারসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারেনি- সেগুলোকে নিয়ে আন্দোলনের ফলেই।
সুতরাং পুরোটাই নির্ভর করছে, আমাদের জনগণ কতখানি সচেতন ও কিভাবে ক্রিয়া করছে তার উপর।

তথ্যসূত্রঃ

উন্নয়ন অন্বেষণ এর গবেষণাপত্র এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৬।

[বন্ধু নাস্তিকের ধর্মকথার অনুরোধে তিনটি পোস্ট (দুটি লেখা) কে একত্রিত এই পোস্ট তৈরি করেছি, অনেকেরই এটি আগেই পড়া হয়ে থাকতে পারে।]

http://www.somewhereinblog.net/blog/dinmojurblog/28786066

লাখ টাকার মেয়ে

জেবীন
০৯ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ বিকাল ৫:৫৪

কোথা থেকে যে কি করবে ভেবেই পাচ্ছে না মোমেনা, রাতে মনুর বাবা যখন জানালো ব্যাপারটা অকূলপাথারে পড়ার মতো অবস্হা হলো ওর। রতন-মোমেনার সংসারে আল্লাহ একি বিপদ দিলো। এমনিতেই অভাবের কারনে বড়বাচ্চা দু' টাকে গ্রামের বাড়ি রাখে, টুকটাক কাজ করে কোনমতে চলে যেত দিন, কেন যে এই পথে এলো ....

সোজা কথায় দালালি, স্বল্প আয়ের লোকদের কাছ থেকে কম হারে মুনাফার বিনিময়ে টাকা নিয়ে একদানে বেশি করে টাকা কোম্পানীর স্যারকে দিয়ে মাঝথেকে সহজেই ভালো মুনাফা কামিয়ে নেয়া। কষ্ট শুধু এতটুকুই, যাদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়, তাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া যেন প্রতিমাসে মুনাফার টাকা না তুলে নেয়, এই অল্পক' টা টাকা আর কিইবা উপকারে আসবে, জমুক না কিছু, একবারে মোটাদানে টাকা তোলাটাই ভালো। বেশ কাজে আসে এই বুঝানোটা। ঐ বাবুর্চীর বৌটাই শুধু টাকা তুলে নেয় প্রতিমাসে, নয়তো গার্মেন্টসের মেয়েগুলো, ভ্যানওয়ালাদের বৌদু' টা, পিঠাওয়ালা .... ভালোই বুঝাতে পারে ওদের। এমনকি এই বাড়িওলীও টাকা খাটায় রতনের কাছে, রতন না ঠিক বলা যায় মোমেনার কথায়ই আসে টাকা...

সপ্তাহখানেক যাবতই রতনের মনমেজাজ বুঝতে পারছে না, কিছু জিগ্গেস করলে ঠিকমতো উত্তর দেয়না। মনুটারও শরীর তেমন ভালো না, চার বছরের প্রায় হলো মেয়েটা কিন্তু দেখতে আরো ছোট লাগে, জ্বরজারি আছে লেগেই। আজ বাবুর্চীর বৌ ওর পাওনা চেয়ে গেলো, মনুর বাবাকে জানাতেই ও খবরটা দিলো। ঐ টাকা খাটানো কোম্পানীর স্যারই গায়েব হয়ে গেছে সাথে অনেকের টাকাও, শুনছে বিদেশে চলে গেছে বৌবাচ্চা নিয়ে। আকাশপাতাল উলটানো এই খবরে মোমেনা চোখে অন্ধকার দেখছে, ঐলোকতো বিদেশে পালিয়ে বাচঁলো, মেরে রেখে গেলো রতন-মোমেনার মতো লোকদের যারা না পারবে টাকা শোধ দিতে, না পারবে পালাতে। মানুষ রীতিমতো ছিড়ে ফেলবে ওদের, টাকা না পেলে। সারারাত ভেবে সিদ্ধান্ত নিলো দু' জন মিলে।

সকালে বাড়িওলীকে সব খুলে বললো, মহিলা রাগে চিৎকার করে লোক জড়ো করলো। যতই বুঝায় যে গ্রামের বাড়ি গিয়ে জমি বেচেই সবার টাকা ফেরত দিবে ততই আরো চেচাঁয়। এরওর তার সব্বার চেচাঁমেচিতে পুরো পাড়া সরগরম। হঠাৎ কিছু না ভেবেই রতন বলে উঠে, - "এই লন আমার কোলের মাইয়াটা থাহুক আপনেদের কাছে, জমি বেইচ্যা টাকা দিয়াই মাইয়া নিমু। অখন আপনেরাই বুজেন, আমারে কাটলেও টাকা আসবো না, কিন্তুক যাইতে দিলে একটা উপায় তো করমুই করমু।"

নির্বাক মোমেনা স্বামীর হাত ধরে পিছনে ফেলে রাখা মনুর পানে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যায় সামনের দিকে, মেয়ে তার দিব্যি বসে খেলতে থাকে।

এত্তোবড় ছিলে যাওয়া গালটায় অসুধ লাগাতে লাগাতে গল্পটা বলছিলো শিউলির মা, পাড়ায় নতুন আসা হানিফের বৌকে। অসুধ লাগানো শেষ হতেই কান মুচরে বললো, - "এমনিতেই থলকূল না থাকা মাইয়া, বাপমার হদিশ নাই, তার উপর যদি গাল কাইট্যা বইসা থাকিস বিয়া অইবো তোর? "

৭/৮ বছরের মনু যদিও গল্পটা শুনছিলো, তেমন কিছুই আসে যায় না ওর তাতে। মা-বাবা, তাদের আদর কিছুই টানে না ওকে। ওর মাথায় এখন ঘুরছে পাশের বাড়ির কাজ শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি নাহলে বাড়িওলী খালা বকবে।

খারাপ কাটে না ওর দিন, তবে হাপিয়ে উঠে একটু। এইবাড়ির কাজ শেষ করে পাশের বাড়ির কাজটা শেষ করতে করতে আলসেমি চলে আসে। মিনা কার্টুনটা দেখতে না পাবার জন্য কষ্ট লাগে বেশি। না করেও উপায় নাই মাস শেষে ওরা ২৫০ টাকা দেয় খালার হাতে। এখন কিছুটা হলেও কম শুনতে হচ্ছে আসতে যেতে - "লাক ট্যাকার মাইয়া আমার তুই, আজীবন খাটলেও শুধবো না ঐ ট্যাকা, এর উপর গুমুত ঘাইটা বড় করতাছি, খাও খরচের কতা নাই কইলাম।"

http://www.somewhereinblog.net/blog/jabinblog/28768615

একেকটা পোস্ট যেন বীর্যস্খলণের মত।

নাজিম উদদীন
২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ২:৫৭

ব্লগে কেন আসি, কেন লিখি ? মূলত সময় ক্ষেপণ করাটাই মূখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ধরণের , বিশেষত ব্লগে যারা ' ছাগসম্প্রদায়' নামে পরিচিত তাদের লেখা পড়ে একরকম বিনোদনই হয়। কোনদিন তাদের লেখা না পেলে ব্লগটাকে পানসে মনে হয়। সবচেয়ে বড় কথা এ ব্লগে এসে বাংলা পড়া হয়, চোখের ক্লান্তি জুড়ায়।

ব্লগে লেখার চাইতে পড়তে বেশি ভাল লাগে। আমার নিজের লেখা নিজেরি পছন্দ হয় না, অন্যদের আর কি বলব? পুরনো কোন লেখা পড়লে মনে হয়, এটা আমি লিখেছি? এটা নিয়ে লেখার কি দরকার ছিল? লিখেছি যখন আরও ভাল হতে পারত। ঐ জায়গায় একটু পলিশিং দরকার ছিল। ওখানে তাড়াহুড়ায় আসল কথাটিই বলা হয় নি। তাই বলে আবার ঠিক করতে বসা হয় না।

ব্লগে লেখা, এবং তাতক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়াটা আমার কাছে মঞ্চনাটকের অভিনয়ের মত, যদিও মঞ্চে অভিনয়ের কোন অভিজ্ঞতা নেই। সাথে সাথে পাঠকের অভিমত পাওয়া যায়। ভাল-মন্দ সব ধরণের মতামত পাওয়া যায়। মঞ্চের দর্শক কিন্তু পয়সা দিয়ে টিকেট কেটে তারপরে যায়। একটা মোটামুটি রকমের প্রস্তুতি থাকে, ব্লগে তা আশা করা যায় না। তাই অনেক সময় উটকো মন্তব্য বা অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য দেখা যায়। কিছু পাঠক হয়ত এর জন্যে প্রস্তুত নয়।

ব্লগে লেখা প্রকাশের অনুভূতিকে আরেকভাবে প্রকাশ করা যায়। আর্জেন্টাইন ফুটবলার বাতিস্তুতা একবার বলেছিলেন, ' গোল দেয়ার অনুভূতি আমার কাছে বীর্যস্খলণের মত' । একেকটা পোস্ট দেয়ার পরে যে অনুভূতি হয় তার সাথে বাতিস্তুতার অনুভূতির মিল আছে। বেশি বিস্তারিত বলার দরকার নেই, অভিজ্ঞজনমাত্রেই জানেন সে কিরকম অনুভূতি।

পোস্ট দেয়াটাকে অনেকে প্রসব বেদনার সাথে মিলিয়ে থাকেন। আমার মনে হয়, পোস্টের রচনাকাল এত কম যে ঠিক তুলনা হয় না। প্রসবযন্ত্রণা মনে হয় আরও অনেক কঠিন, দীর্ঘ প্রস্তুতির ব্যাপার। যারা ধারাবাহিক উপন্যাস লেখেন তারা হয়ত শেষ পর্বে এসে ওরকম কিছু বলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারেন।

সবসময় যে একইরকম অনুভূতি তা নয়। যারা অনেক পোস্ট দেন , বা , এক দু' লাইনের পোস্ট দেন তাদের ক্ষেত্রে ঠিক বাতিস্তুতার মত না হয়ে হয়ত ' প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশান' হয়। ওতে ঠিক কেমন তৃপ্তি হয় জানা নেই। ওরকম পোস্ট কখনও দেয়া হয়নি।

টাইটেল পড়ে কারও সূক্ষ অনুভূতি আহত হলে ক্ষমাপ্রার্থী। শব্দের নিজস্ব কোন শক্তি বা মানে নেই, আমরাই শব্দকে অর্থময় করে তুলি।

http://www.somewhereinblog.net/blog/nazimblog/28774711

নমিত সন্ধ্যার ছায়া

ফকির ইলিয়াস
২৬ শে মার্চ, ২০০৮ রাত ৮:০০

আরাধ্য মাটির অস্তিত্ব খুঁড়ি । টবের ফুলগুলো উঁকি দেয় রোদের শিশিরে।
জেগেছিলাম সারারাত, একরত্তি ঘুম নেই দুচোখে। বুকে মুক্তিঘোর, সূর্য
উঠবে বলে , পতাকায় আচ্ছাদিত মায়ের অশ্রু।

দমকা হাওয়ার গতি নেড়ে যাচ্ছে এ মাটির মন। উড়ছে ধুলি। আসলে
উড়তে গিয়েই পাখির চোখে জমেছে বাষ্প। দীর্ঘ আলিংগন ছুঁয়ে যে নদী
একদিন ধারণ করেছিল রক্তস্রোত, আজো সে নদী কাঁদে।

ছায়া নিয়ে প্রতিদিন নমিত হয় সন্ধ্যা , বাংলার মুখর প্রান্তরে
সেসব লিপিবিদ সন্তানেরা বারবার হেঁটে যায়
বিধুরমাদলে বাজে স্মৃতি, বিন্দুমেঘ সংবর্তে হারায় ।
http://www.somewhereinblog.net/blog/FAQIRELIASblog/28782752

তোমরা আমায় চিনতে পেরেছো কি? অশ্রুসিক্ত নয়নে শহীদদের স্মরন করছি।

বিহংগ
২১ শে মার্চ, ২০০৮ দুপুর ১২:৩১

(যে মাটির নীচে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা, দে না, তোরা দে না, সে মাটি আমার অংগে মিশিয়ে দে না।)

ধূসর সময়ের প্রান্তরে প্রান্তরে-
গহীন সময়ের আলো আর অন্ধকারে,
এক অশ্বথ বটের নীচে আমি শুনি শতাব্দীর নিঃশ্বাস-
শুনি নিভৃত কুহকের ডাক, আর দেখি সজল বিলের গাংগচুর জলা হাঁস
হৃদয় মন্দিরে খুঁজি চারহাজার বছরের মাটির আঘ্রান-
কত সাধু আর তাপসীর প্রান আকুল করা সুধা, হাজার বছরের গান,
আজ আমি সেই হৃদয় মথিত সুর
আর রাখালির বাঁশীর কথা বলছি-
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

ফাল্গুনের ছায়া মাখা রোদে,
ঝরনার চঞ্চলতায়- চক্রবালের নীরব জনপদে-
বিলীন পটভূমির ইতিহাসের প্রথম উতস থেকে-

মনে পড়ে সেই আর্য আর দ্রাবিড়,
আমি আজ সেই খুঁজে ফেরা শৈশবের কথা বলছি-
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

দুহাজার ছয়শত আট সাল আগে,
অংগ, ভংগ, মগধের নিরজনে,
সুজলা, সুফলা, শশ্য, শ্যামলা, গিরি , কুন্তলায়,
নির্ঝর বহমান নদী আর হ্রদে, পাখীর কলতানে,
অবারিত নীলের বিস্তৃত আকাশের ঠিকানায়,
জনপদের সেই অবিস্মরনীয় সূর্য্য পরিক্রমায়
প্রতিনিয়ত আমার বেড়ে ওঠার কথা বলছি-
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

আমি ছিলাম, রামায়নে, মহাভারতে,
যেখানে বিম্বিসারের, অজাতশত্রুর, শাসনের দীপ্তিতে
আশ্চর্য্য প্রশান্তিতে ভরিয়ে রেখেছিলো আমার মন,
যতিহীন জীবনের সেই প্রানের স্পন্দন,
স্মৃতি আর সহস্র লগনের কথা বলছি,
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

তারপর সহসা একদিন-
বুকের উপর ছুটে চলা স্রোতস্বীনি গংগার ঢেউ
উন্মত্ত ক্রোধে তেজী অশ্বের লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে কেউ
২৩৩৪ বছর আগে- নন্দ রাজ্যের রুপালী জোছনায়,
আমার সূর্যনদীর পাড়ে, সূর্যসন্তানেরা , সূর্যপরিক্রমায়-
গেয়েছিলো সেই রামধুনর সাতরংগা বিজয়ের গান
আর আমি মহাবিস্ময়ে দেখেছিলাম তোমার ভীতু প্রস্থান-
মহাবীর আলেকজান্ডার , তুমি গুটিয়ে নিলে তোমার চরন -
আমার গৌরব, আমার অহংকার , আমার চির দীপ্তিমান উজ্জ্বলতায়
আমি আজ সেই তেজোদীপ্ত বিজয়ের কথা বলছি,
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

তারপর ছায়া ঢাকা, পাখী ঢাকা, শান্ত , সূর্যে চন্দ্রে সুনিবিড়
কেটে যায় কত বছর , কত যুগ- কত রংগের আবীর,
মায়ায় মায়ায় ভালোবাসার সেই পূর্ণ তিমির,
মূর্য, গুপ্ত রাজ্যের ইতিকথা, কত তমালের আর হিয়াল
মনে পড়ে চন্দ্র গুপ্ত মূর্য, মহান অশোকের পর ৬০৬সাল।
মহান শশাংকের পর আসে ধর্মপাল।
খিলজি আসে, সালতানাত হয়, আফগান, মুঘল, তূর্কির অধিকার-
শের শাহ ছুটে চলে সোনারগা থেকে পেশোয়ার,
কত ইট কত সুড়কি, স্মৃতির সেই গ্রান্ড ট্রাংক রোড, আর স্মৃতির মিনার,
আমাকে বলা হয়েছিলো-
আমি যেন এক পুরো জান্নাত, প্রাচুর্য্যের সমাহার,
আজ আমি সেই ঐশর্য্যের কথা বলছি
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

এবার , সেই ঐশ্চর্য্যের লোভে আসে ধূর্ত শিয়াল, স্বপ্ন হননের ছল,

অন্ধ কুটুরে আমার দীপ্তি নিঃশেষিত হয়, কাঁপে আমার অন্চল,
বাণিজ্য বেসাতির নামে বিবস্ত্র করে আমার সবুজ আঁচল
বিশাল আকাশের নীলিমায় চন্দ্রহরনের সময় সেতো ১৬৭৩ সাল,
এক কলংকের তিলক - কলকাতা থেকে মাত্র ৩০ মাইল
দূরে চন্দ্রনগরে - ফ্রেন্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।
শিয়ালের পর আসে হায়েনার দল,
১৬৯০ সাল- শুরু হয় আমার বুকে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়ার গ্লানি ।
শুরু হয় আমার অশ্রুপাত, বিষাদের নিরালয় শূন্যে হাহাকার করে প্রান
সিরাজ পলাশীতে, আর কাশিম বক্সারে নির্মমভাবে হেরে যান।
কাঁদে বাংলা, বিহার , উড়িষ্যা- এই ছিলো আমার ললাটে
আমার দুঃখ, আমার আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা-
মীর জাফর শব্দের সাথে আমার পরিচয় ঘটে,
আজ আমি সেই স্বনীল আকাশে, বেদনাবিঁধুর
ক্রন্দনভরা মেঘাচ্ছন্ন দিনলিপির কথা বলছি,
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

শতেক বছর পরে আবারো ১৮৫৭ সাল,
দাম্ভিক ব্রিটিশ রাজ, চলে শোসনের কূটচাল
ভাংগন, ভাংগন, ভাংগনের খেলা সেতো 1905 সাল।
কিন্তু একি কৃষ্টি , সভ্যতা, হাজার বছরের মিলিত রুপ , জোয়ার ভাটার টান
সূর্য্য , চন্দ্রের আলো ফারাক হতে পারেনা। এ যে আমারই সন্তান,
আবার মিলিত হয় একি মোহনায় ১৯১২ সাল।
তবু, আমার নীলিমায় উড়ে দেশী, বিদেশী শকুন-
আর নক্ষত্র খচিত হয় কত হাজারো নাম
মুক্তির মন্দিরে বলি হতে থাকে কত ক্ষুধিরাম,
তেপান্তর ঘটে কত মহান বীর সেনানীর
ফাঁসীর মন্চে ঝুলে কত সূর্যসেন, কত সূর্যসন্তান
আমি আজ সেই বীরের শোনিত ধারার মর্মন্তুদ অগ্নির কথা বলছি,
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

এরপর হানা দেয় ধর্মের কূটকৌশল,
নীল আকাশে অবিরাম গাংগচিলের গোংগানি,
আমি আবারো ভাংগনের ক্রন্দন,
বিবেদের বিষময় শংকচূড় শব্দশুনি-
দ্বিখন্ডিত হই , আরেকবার সেতো ১৯৪৭ সাল।
এবার রক্তচূষা ব্রিটিশ বেনিয়ার সম্পদ লুন্ঠিত প্রস্থান।
১৯৫৮সালে আমার কলংকিত নাম চাপিয়ে দেয়া হয়,
আমি হই ভাগ্য বিড়ম্বিত ইস্ট পাকিস্তান।
শূন্য হতে থাকে আজন্মলালিত আমার মাতৃত্বের বুক-
সন্তান হারা আমি- শোকে শোকে পাথর হয়ে যাই।
প্রতি ইন্চি বর্গমাইল লুন্ঠিত হয়, হানা দেয় বর্গি-
স্ফীত চর্বির সারমেয় শাবকের দাঁতালো নখর
৬৮হাজার বর্গমাইলের মাটিতে বিদ্ধ হয়।
এরপর আমার শস্য, আমার বসতভাটি, আমার উচ্ছ্বাস,
আমার কন্ঠ , আমার অধিকার , আমার সুখ, আমার নিঃশ্বাস,
আমার স্বপ্ন, আমার আহলাদ, আমার কৃষ্টি, আমার তৃষ্ণা,
আমার সভ্যতা, আমার সংগীত, আমার আরতি, আমার জোছনা,

আমার শ্যামলিমা, আমার নদী, আমার ঘাস, আমার হাসি, আমার তিথী,
আমার জীবন, আমার বেড়ে ওঠা, আমার সাচ্ছন্দ্য, আমার মৃত্তি,
আমার জল , আমার পাঠাঘার, আমার শিল্প, তিলে তিলে লুন্ঠিত হয়।
আজ আমি সেই জুলুমের , নিপীড়নের , নির্যাতনের, বন্চনার, শোষনের, নিস্পেশনের, ছলনার, কথা বলছি
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

তারপর আমি দেখলাম-
বুকে আমার বয়ে চলেছে অবিরাম রক্তগংগা,
রক্তের পদ্মা , মেঘনা, যমুনা, কুশিয়ারা , আড়িয়াল খা,
লাশের ভরা নদী, বিরান মাঠ,
মৃতের অরন্যে লাশের পাহাড়,
খুনের জোছনা- চারপাশে নিদারুন নিস্তব্ধতা
আমার সন্তানের লাশের গন্ধে ভারী হলো আমার নিঃশ্বাস।
১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর-
স্বজন হারানো দুঃখের পালা।
মাতার সন্তান হারানো দুঃখ,
কিন্তু এতুটুকু ভাংগেনি আমার বিশ্বাস,
আহা , সেদিন বিজয়ের সেই লগনে আবার আমার নব জন্ম প্রাপ্তি,
শকুন, হায়েনা, ধূর্ত, নরপিশাচের কবল থেকে আমার মহা মুক্তি।
আমি হলাম ধরনীর এক বীর প্রসুতি মা,
মায়ের জন্য জীবন দেয়া রক্তবীজের সেই সব সূর্যসন্তান, কোথায়-
দোয়েলের সুরে, রাখালীর বাঁশীতে, নৌকার পালে, আম্র মুকুলে?
নক্ষাত্রোলিকত আকাশে আকাশে- সোঁধা মাটির সবুজ শ্যামলিমায়?
আজ আমি সেই হারিয়ে যাওয়া চির দীপ্তিমান নক্ষত্রদের কথা বলছি-
তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছো কি?

না, না পারোনি, তোমরা আমাকে এতুটুকু চিনতে পারোনি?
আমার দুঃখ, আমাকে চেনার সেই সূর্যসন্তানেরা আর নেই ।
ওরা পরম শান্তিতে আজ আমার বুকে-
ঘুমিয়ে আছে,
ঘুমিয়ে আছে,
ঘুমিয়ে আছে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/pordeshi07blog/28781166/

সূর্যরমণী

ফয়সাল নোই
১২ ই মার্চ, ২০০৮ দুপুর ১: ৫২

আমাদের দেশে কিছু কিছু মেয়ে সুর্য হতে
চেয়েছিলো
এই স্বপ্নীল ষড়যন্ত্রের কথা সকলেই জানে

সকলের মাঝে জানাজানি আছে
তাহাদের ফুলঘর আর দুর্দান্ত ঘুম যাওয়া
আর ঈর্ষাভর্তি তুণ !

বাস রিক্সায় কখনো ওদের পাশ কেটে চলে
যেতে দেখি
যতদিন বাঁচে দোসর শূন্যতাকে চেনে না
নিধুবন রাতে কড়া নাড়ে শয়তানের বাড়ি

ওরা কোন ঋণ খেলাপির বউ হলে হোক
সেই সব রমনীর মাঝে আমাদের ভাগ আছে
সেইসব রমনীরা জানে আমাদের অধিকার
http://www.somewhereinblog.net/blog/faysal1blog/28781247

এখনও অপেক্ষায় আছি

চিটি
১৫ ই মার্চ, ২০০৮ সকাল ১১: ৫১

আমি এখনও বেঁচে আছি
আমার আকাশে তুমি আছো বলে
অন্ধকারে থেমে থেমে চলি
জোনাকি হয়ে-
তুমি পথ দেখাবে বলে।

পূর্ণিমা জোছনায়-
একা বসে থকি
তুমি পাশে এসে বসবে ভেবে।

অপেক্ষায় আছি
এখনও বেঁচে আছি,
তুমি এসে-
প্রথম লজ্জার প্রহর ভাংগাবে ভেবে
তবে স্পর্শ করো না, বিলিন হয়ে যাব।
http://www.somewhereinblog.net/blog/chitiblog/28779306

বৃষ্টি, তোকে চিঠি

জেনারেল

২১ শে মার্চ, ২০০৮ সকাল ৯: ২৩

বৃষ্টি নামে মিষ্টি মেয়ে
কোথায় রে তুই থাকিস?
কালো মেঘের ওড়না টেনে
লজ্জাতে মুখ ঢাকিস।

কোন দেশেতে কোন শহরে
কোথায় রে তোর বাস
তোর রূপেতে চাঁদ ডুবে রয়
যেথায় বার মাস।

খোলা চুলের গন্ধ যে তার
পাগল করে যায়,
তোর গলাতে গান ঝরলে
ঘরে থাকাই দায়।

হঠাৎ যখন বাদলা দিনে
কাজল মেখে আকাশ,
জল ঝরিয়ে দুকুল ভাসায়
নিজের পানে তাকাস।

বৃষ্টি যেমন গাছের পাতায়
সিক্ত করে আদর মাখায়-
তেমনি করে সোহাগ ভরে
আমার বুকে ঝাঁপাস।

বৃষ্টি নামের মিষ্টি মেয়ে
দিলাম চিঠি তোকে
তোকেই আমি খুঁজে বেড়াই
বৃষ্টি ভেজা চোখে।

(ইহা জেনারেলের কবিতা নয়, তবে জেনারেলের মনের কথা)

http://www.somewhereinblog.net/blog/uahmedblog/28781113

ছোটগল্প: পুরি আলামের বৃত্তবন্দী জীবন

ইয়র্কার
১৬ ই মার্চ, ২০০৮ ভোর ৪:৪৯

বেশি কিছুদিন হল পুরি আলামের রাতে ঘুম হয় না, দিনে বুক ধড়ফড় করে। কন্ঠার হাঁড় বেরিয়ে গেছে, চোখের নিচে একগাদা কালি পড়ে গেছে। জীবনটা কেমন দিনদিন বৃত্তবন্দী হয়ে যাচ্ছে। বেকার জীবন। পাস করেছে অনেক দিন হল, কোন চাকুরীই পছন্দ হয় না। দেশের বাইরে যাবে। উচ্চশিক্ষার কথা শুধু ভাও, আসল কারন আলস্য। আইইএলটিএস দিয়েছিলো, স্কোর ৪.৫ দেখে বাপে খেপেসে। তারপরও জিআরই দেয়ার জন্য কোচিংয়ে ভর্তি হতে টাকা দিয়েছে।

জিআরই আরো কঠিন লাগে। দাতভাঙা ইংরেজি। মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে তার ইচ্ছে করে পুরা ইংরেজ জাতিটাকেই দাত ভেঙে দিতে। তবে তার মেজাজের পারদ এত উচ্চচাপে ওঠার একমাত্র কারন জিআরই নয়। পাশের গলির সীমার সাথে প্রেম হবো হবো করছিল। বাপের কাছ থেকে এটাওটা বলে টাকা বাগিয়ে তাকে নিয়ে বেশ কয়েকবার ফাষ্টফুড ঘুরেছে। বেশ চলছিল। সীমা তাকে ইয়েস না বললেও নো তো আর বলেনি। পুরি আলাম জানে অধ্যবসায়ই সাফল্যের চাবিকাঠি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। সে অধ্যবসায় করতে চাইলেও পাশের গলির কিছু বখাটে ছেলেপেলে তার কাজে বাগড়া দেয়। কিভাবে যেন তারা সীমার সাথে তার ইটিশপিটিশের ব্যাপারটা জেনে গেছে।

পুরি আলাম বাইরে থেকে ফেরার পথে বখাটে গুলো তাকে দেখে শিষ দেয়, অশলীল কথা বলে, পুরি আলাম সীমাদের গলিতে ঢোকার সাহস পায় না। একবার এক রংবাজ তাকে ডেকে জামার কলারটা কসরত করে উঠিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছে, আর এমুখো হবা না খোকা, হাত-পা ভাংগা অবস্থায় বেঁচে থাকা অনেক কঠিন। পুরি আলাম ভয় পেয়েছে, তীব্র ভয়। গনপিটুনী খাওয়া চোরেরও ভয়ডর কমে যায়; কিন্তু ভয়ের আবহটাই মানুষকে বেশি ভীত করে ফেলে।

অনেকদিন হল, মোবাইলে কথা বলা ছাড়া সীমার সাথে তাই তার কোনো যোগাযোগ নেই। সীমা বায়না ধরে, আজ ফ্যান্টাসি কিংডমে যাবে, কাল আশুলিয়া, পরশু কোন চাইনিজে, তরশু ফাস্টফুডে বসে আড্ডা। পুরি আলাম ব্যস্ততার কথা বলে এড়িয়ে যায়।

সীমার সন্দেহ হয়। কি হল এমন মানুষটার? আগে কেমন পাগল ছিল তার জন্য। আর পুরি আলামবিহীন সীমার জীবনযাত্রার মানও কমে যায়। আগে বিনা পয়সায় কত মৌজ করা যেত। সীমা আলামকে আসল কারন জিগ্গেস করে। তোমার বাবা-মা কিছু বলেছে? আরে না। - পুরি আলাম ডিফেন্ড করে? তাহলে? আমাদের গলির সৌরভ? ছেলেটা একদম বখাটে। পুরি আলাম বাঘের মত ভাব দেখাতে চায়। চেচিয়ে বলে, কী যে বল তুমি। আমি এসব ফালতু পোলাপানকে ভয় পাই নাকি?

ফোন রেখে পুরি আলাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার বৃত্ত থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই। সীমা না থাকলে কিছুদিন খারাপ লাগবে, তারপর একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হাত না থাকলে চলবে কী করে? সীমা তার হাতের অভাব পুরন করতে সক্ষম নয়; কিন্তু তার মালটিপারপাস হাত এমনকি সীমার অভাবও পুরন করতে পারবে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরি আলাম হাতের ওপর ভরসা করে বৃত্তবন্দী জীবনকেই মেনে নিয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে। চোখ বরাবর ছাদের বুকে ঘোরা পাখাটির সাথে সাথে তার কোনো স্বপ্ন হয়তো কোনো বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। সে ঘুমিয়ে পড়ে। কীসব স্বপ্ন দেখে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে। বাথরুমে ঢোকে। লুঙ্গিটা এখনই ধুয়ে শুকাতে না দিলে নামাজ কাযা হয়ে যাবে।

পুরি আলাম টেবিলে বসে জিআরই বইয়ের পাতা উলটিয়ে চলে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/yorkerblog/28779515

অন্তর্দহন অতঃপর

রন্টি চৌধুরি
২০ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ সকাল ১১:১৯

কি করে যে এতগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল ভাবতে গিয়ে স্তম্ভিত ফিরে পান ওসমান সাহেব। খাচাটা হাতে হাটার গতিবাড়িয়ে দেন। ওদের কাছ থেক টাকাটা নেবার পর তিনদিন পেরিয়ে গেছে এখনও তিনি কিছুই করেননি। আজ ভোরেই আবার তাগাদা দিয়ে গেল। তার পক্ষে কাজটা করা কঠিন কিছু না, মফিজ সাহেব তার ৩৫ বছরের পুরনো বন্ধু। মিথি তার কোলে কোলেই বড় হয়েছে। ওসমান চাচাকে ভালবাসে সে।

স্কুলের থেকে মিথিকে নিয়ে এসে বাশেঁর শলার তৈরি ছোট্ট খাচাঁটা তার হাতে তুলে দেন ওসমান সাহেব। খাচাঁ কিনতে মহামূল্য পয়তাল্লিশ টাকা পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে তার।
পাখিশূন্য খাচাঁটা দেখে একটু ম্লান হয় ছোট্ট মিথি, ` পাখি কোথায় চাচা? '
বলতে যেয়ে একটু থমকে যান ওসমান সাহেব। যেন বাধা পড়েন বিবেকের টানে, আবারও ঘাম মুছেন তিনি, মনে পড়ে পকেটটা গড়ের মাঠ। সমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের কথা মনে হতেই সব ঝেড়ে বাজারের দিকে পা বাড়ান।

চোখের সামনে এত পাখি দেখে আপ্লুত ছোট্ট মিথি, গভীর আগ্রহে বলে সে, 'কোন পাখিটা আমার হবে চাচা?'
কথাট বলতে যেয়ে হাসঁফাসঁ করে আবারও নিঃশ্বাস আটকে যাবার উপক্রম হয়, দুই ভূরু বেদনার ভারে কুঁচকে একাত্রীভুত হয়ে যায় প্রায়। তবু শেষপর্যন্ত বলেন তিনি, `পাখিটা তুমিই পছন্দ করবে মা।'
`সত্যি চাচা?' এতক্ষন স্কুলে থাকার ক্লান্তি মুহূর্তে উধাও হয়ে আলোকিত হয় মিথির চেহারা। নিজের পছন্দে একটা ময়না নেবে সে। আনন্দে তার চোখে পানি এসে যায়। ভাবতে থাকে তার এ সৌভাগ্য দেখে সহপাঠিদের কার কি অবস্থা হবে, ইস্ ওসমান চাচটা এত ভাল কেন?

ওসমান সাহেবের হৃদ স্পন্দ বেড়ে যায়। পাতলা সুতি রুমালটা ঘামের ভারে ন্যাতান্যাতা হয়ে গেছে অনেক আগে, তবু ভিজে রুমালটা দিয়ে সারা মুখে জমা ঘাম মুছেন তিনি। মনে মনে অস্থির লাগছে তার। একটু আগেও যে সিদ্ধান্তে স্থির ছিলেন ক্ষনকাল পরে তা এখন নড়বড়ে। তবু তিনি এক করতে চান মনসংযোগ, কঠিন হতে চান আরও অথচ সারাজীবন সবাই তাকে নরম মনের বলে জেনেছে। সেই ছেলেবেলা থেকেই, কোন বিড়ালকে কেউ মারচে দেখলেই অস্থির হতের তিনি, কেদে ফেলতেন বিড়ালের দুঃখে। এ নিয়ে সবার কত যে হাসাহাসি, তবু শিশুসূলভ অভ্যাসটা কৈশোরেও ছাড়তে পারেননি তিনি।
আনন্দঘেরা কৈশোরে তিনি আর মফিজ ছিলেন জানের দোস্ত। একজনকে ছাড়া আরেকজন থাকতেনই না। দুরন্ত কৈশোরে সংঘাতময় খলায় ডানপিটে মফিজের হাতে কতযে মার খেয়েছেন। মারগুলো ফিরিয়ে দেবার মানসিকতা ফিল না তার। বোকা ওসমান- নাম রেখেছিল মফিজ। সেই ডানপিটে মফিজ আজ বিরাট সম্পদশালী তিনি বিশ্বাস করেন দুরন্তরা সবখানেই দুরন্ত। আর বোকা ওসমান আজও বোকা ওসমানই রয়ে গেলেন, বোকারা সবখানেই বোকা।
ভাবতে ভাবতে মুষ্ঠিবদ্ধ হয ওসমান সাহেবের দুহাত, দৃঢ় হয় চোয়াল, কঠোর হয় চোখের দৃষ্টি, বিকৃতভাবে কুচকে যায় গালের পেশি। দীপ্ত উচ্চারণ করেন তিনি, `আর না'।
এতক্ষন ধরে দ্বিবাস্বপ্ন দেখা মিথি তার দিকে তাকেতেই দ্রুত স্বাভাবিক হন তিনি, হাসেন। স্বস্তি পায় মিথি।
`চাচা চাচা, দেখেন কী সুন্দর ময়না'। আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফায় মিথি, কাধের স্কুলব্যাগের ভারী বোঝার কথা ভুলে হেছে সে।
গভীর দৃষ্টিতে মিথির দিকে তাকান ওসমান সাহেব ।
`চাচা, এটা আমি নেব।'
উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ওসমান সাহেব। তার অন্তর্জগৎে যে কঠিন যুদ্ধ চলছে তা প্রকাশ পায় না চোখে।

মিথি হটাৎ একটু ম্লান হয় যেন, বলে- `এটা নিলে বাবা বকবে না তো চাচা?'
কঠিন থেকে কঠিনতর হয় যুদ্ধ, ভেজা রুমাল দিয়ে ঘাম মোছার ব্যর্থ চেষ্টা করেনওসমান। এদিকসেদিক তাকান উদভ্রান্তের মত, অস্থিরতায় মটকান হাতের, নিজের চুলহীন মাথাটাকে যেস মনে হয় ফুটন্ত সূর্য।
মিথি ভয় পেয়ে যায়।
একসময় শেষ হয় যুদ্ধ। কোমল হযে আসে ওসমান সাহেবের দৃষ্টি, যেস জ্বর থেকে সেরে উঠা রোগীর মত স্মিত হাসেন তিনি।
অবাক হলেও আবারও প্রান ফিরে পায় মিথি, চঞ্চল হয়ে বলে- `বাবা বিছু বলবে না তো?'
`নাহ্ নারে, মফিজ কিচ্ছু বলবে না।' অন্তরের গভীর থেকে বেরোয় ওসমান সাহেবের আন্তরিক কথামালা। সামনে দাড়ানো পুতুলসাদৃশ মেয়েটির জন্য আদ্র হয় তার দুচোখ, মুখে জমা ঘামের স্রোতে মিশে যায় নোনাজল। মিথি তখন ময়নাকে ঘিরে চঞ্চল, সে দেখে না মুর্তিমান ভালবাসা।

মিথিকে বাড়ি পৌছে দিয়ে ফেরার পথে ভাবনা উদয় হয় ওসমান সাহেবের মনে, বায়নার একহাজার টাকা তো খরচ হয়ে গেল, মিথিকে ওদের হাতে তুলে দিলে আরও চৌদ্দ হাজার টাকা পাওয়া যেত, চৌদ্দ হাচার টাকা . . . ভাবনাটা ঝেটিয়ে বিদেয় করতে চান তিনি। এত কঠিন, নিষ্ঠুর, নীচ তিনি হতে পারেন না। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি, স্বস্তির শ্বাস। বিড়বিড় করেন আপন মনে, মফিজের কাছে গেলে এক হাজার টাকা ধার পাওয়া যাবে। পরক্ষনে বিদ্যুতচমকের মত একটা কথা মনে আসে তার, ` নাহ্। আর না।' এবার সত্যি সত্যি কঠোর হন তিনি। একে একে মনে করেন ওদের সবার চেহারা। ঘুরে হাটা দেন উল্টোপথে. . . থানার দিকে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/rontychowdhuryblog/28772269

সেই সব মা জননীদের আমাদের প্রনাম

ইরতেজা
১৪ ই মে, ২০০৭ দুপুর ১২:১৪

১৯৫২ ভাষা আন্দোলনে শহীদ বরকতের মা হাসিনা বিবি থাকতেন সেই সময় থাকতেন ভারতে । তার ছেলে বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হন। আমাদের দেশে স্থায়িভাবে বাসবাস না করেও প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মাতা ছুটে আসতেন ঢাকাতে ছেলের আজিমপুর কবরস্থানে ছেলের কবরের সামনে শ্রদ্ধা জানাতে। শহীদ মাতা হাসিনা বিবিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। ৬৮-৬৯ সালে তাকে জোর করে দেশে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি তার পাসপোর্ট আটক করে রাখা হয়। এক মাকে তার ছেলের জন্য প্রাথনা করতে দেয়া হয়নি। ১৯৮২ সালে তিনি বরকত বরকত করতে করতেই ইন্তেকাল করেন।

মিরপুরে কবি মেহেরুন্নিনসাকে তার বৃদ্ধা মায়ের সামনেই হত্যা করা হয়। পাকিস্তানিরা এক মায়ের সামনে তার স্নেহের দুই ছেলেকে আর তার তরুনী মেয়েকে শক্ত করে রশি দিয়ে বাধা হয়। এক বৃদ্ধা মায়ের আকুতি মিনতি, পায়ে ধরে বিলাপ কিছুতেই ওই পশুদের মন গলে নি। সেই সব ভয়ন্কর পিশাচরা ভয়ন্করভাবে ধারালো ছুরি দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে এক মায়ের চোখের সামনে তার সন্তানদের তিল তিল করে ছুরিকাবিদ্ধ করে হত্যা করল। আর সেই অসহায় জননীর তীকস্ন আর্তনাদে সেদিন বুঝি মীরপুরের ধুসর আকাশের বুক চিরে গিয়েছিল, কিন্তু এতটুকু কাঁপেনি সেই প্রতিবেশী অবাঙালি পশুদের বুক।

ভাষা শহীদ আরমা গুনকে যখন ধরার জন্য মিলিটারীরা তাদের বাসা ঘিরে ফেলে তখন উনি তার মায়ের কাছে গিয়ে আনুরোধ করেন "আমাকে হয়ত এখানেই গুলি করে মারবে। আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমরা আমার লাশটা বারান্দায় ফেলে রেখো যাতে সকলে আমার মৃতদেহ দেখে মনে মনে সাহস পায় বিদ্রোহ করার জন্যে।"

মুক্তিযুদ্ধের এক দিনে সেক্টর কমান্ডার রফিক ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। চারিদিকে গোলাগুলি, বোমা পড়ছিল। তখন তিনি দেখতে পেলেন কয়েকজন মহিলা দৌড়াচ্ছেন। একজন কিশরের দ্বিখন্ডিত দেহ পরে থাকতে দেখে উনি থামলেন। একজন মা খুব শান্ত ভাবে সেই মৃত ছেলের লাশের দিয়া একমনে চেয়ে আছেন। সেই দুঃখি মা চোখ মুছে তাকে দেখে জিগাসা করলেন "তোমরা কারা?তিনি উত্তর দিলেম "মা, আমরা আপনার ছেলে"। ছেলের দ্বিখন্ডিত দেহের সামনে তখন তার মা আল্লার কাছে হাত তুলে মোনাজাত করল "আল্লাহ আমার প্রানপ্রিয় ছেলেটিকে নিয়ে গেচ্ছিস সে জন্য আমার কোন অভিযোগ নেই, আমার ছেলের প্রানের বিনিময়ে আমি এখন শুধু এই ছেলেটার জন্য দোয়া চাইছি যারা এই দেশের স্বাধিন তার জন্য যুদ্ধ করছে"। এই কথাটা তাদের সাহস মনোবল অনেক বৃদ্ধি করেছিল। পরে মুক্তিযোদ্ধা রফিক যখন গুলিবিদ্ধ হল তখন তিনি বলছিলেন আল্লার তুমি এক দুঃখি মায়ের মায়ের দোয়া কবুল কর।

শহীদ আজাদে ছিলেন ঢাকা শহরের সেই সময় সব থেকে ধনী ইউনুশ আহমেদের একমাত্র পুত্র। বিপুল অর্থবিত্তের ভিতর বড় হলেও আজাদ জীবনে তার মাকে নিয়ে অনেক কষ্ট করেছে। শহীদ আজাদ ঢাকায় গেরিলা অপারেশনে অংশগ্রহন করেন। তাকে তার বাসা থেকে তার মায়ের সামনে মারতে মারতে থানায় নেয়া হয়। আজাদ, শহীদ জুয়েল ধরা পরার পর টর্চার সেলে মিলিটারীদের প্রচন্ড মারে তাকে সিলিং ফেনের সাথে উলটা করে সারা দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়। সারা শরীরে বেল্ট দিয়ে পিটানো হয়। তার সারা গা রক্তাক্ত হয়ে যায় মুখ থেকে রক্ত পরছে কিন্তু তারা কিছুই ফাঁস করেনি।

আজাদের মনবল ভাঙ্গার জন্য মোহাম্মদ কামজ্জামান(জামাতের উর্ধতন নেতা) সাথে করে আজাদের মাকে সামনে নিয়ে আসে। রমনা থানায় তার মাকে বলা হয় আজাদকে তার সিদ্ধিরগঞ্জ আর রাজারবাগ অপারেশনের অংশ নেয়া বন্ধুদের নাম ঠিকানা বলতে আর অস্ত্র কোথায় লুকিয়ে রেকেছে তা বলতে। কিন্তু তাদের সামনেই আজাদের মা পুত্রকে সাহস দিয়ে বলে "বাবা রে, যখন মারবে, তুমি শক্ত হয়ে থাকো। সহ্য কোরো। কারো নাম যেন বলে দিও না।

আজাদ সেই রাতে থানায় মাকে বলল, "মা, ভাত খেতে ইচ্ছা করে, দুই দিন ভাত খাই না। কালকে ভাত দিছিল , আমি ভাগ পাই নাই আজাদের মা পরের দিন টিফিন ক্যারিয়ারে করে ভাত, মাংস,

আলুভর্তা, বেগুনভাজি হাতে নিয়ে মা সারা রাত থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু তাকে জানান হয় আজাদ রমনা থানায় নেই । উনি সারা রাত এক থানা থেকে আরেক থানা, এমপি হোষ্টেল, কেন্টরম্যান্ট খুজেও কোথাও আজাদকে পাওয়া যায় নি। আজাদকে আর কখনও খুজে পাওয়া যায় নি।

স্বাধীনতার যে ১৪ বছর আজাদের মা সাফিয়া বেগম বেঁচে ছিলেন তিনি সারা দিন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ডাকপিয়ন আসলে দৌড়ে যান তার ছেলের কোনও চিঠি আছে নাকি দেখতে। একটু শব্দ হলে তার বুক কাঁপত। তখন শেষ বার সেলে আজাদকে দেখেছিলেন আজাদ মাটিতে শুয়ে ছিল। মাটিতে খালি একটা পাটি ছিল কোন বালিশ ছিল না। আজাদের মা ওই দিনের পর থেকে কোন দিন বিছানায় ঘুমান নি। উনিও মাটিতে পাটি বিছিয়ে ঘুমাতেন। আজাদ মৃত্যুর আগে ভাত খেতে পারে নি তাই তার মা বাকি জীবনে কোন দিন ভাত খাননি। সুদীর্ঘ ১৪ বছর খালি রুটি খেয়েছেন দুইবেলা কখনো একবেলা শুধু পানিতে চুবিয়ে। ৩১সে আগষ্ট, ১৯৮৫ আজাদের ধরা পরার সেই দিনেই এই রত্নগর্ভা নারীর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। তার কবরে তার ইচ্ছা অনুযায়ি খালি একটা লাইন লিখা, শহীদ আজাদের মা ।

গত ৩ তারিখ ছিল শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জন্মদিন। রুমি যখন তার মায়ের কাছে এসে মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাইল তখন তার মা বলেছিল "যা তোকে দেশের জন্য কোরবানী করে দিলাম ।এই শেষ কথাটার জন্য জাহানারা ইমাম সারা জীবন আফসোস করেছেন। আল্লাহ মনে হয় কোরবানী কথাটি কবুল করে নিয়েছেন। উনি কেন বললেন না, যা রুমি যুদ্ধ করে বীরের বেশে স্বাধীন দেশে ফিরে আয় তাহলে হয়তবা তার ছেলে রুমি ফিরে আসত ১৬ ডিসেম্বর।

স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর আজও বাংলার ঘরে ঘরে হাজার হাজার আজাদের মা, রুমির মা, জুয়েলের মায়েরা নিভৃতে চোখের পানি ফেলে। পৃথিবীর সব কষ্ট হয়ত সময়ের সাথে সাথে হালকা হয়ে যায় কিন্তু সন্তান হারাবার কষ্ট কি কোন দিন কমে। জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত সেই ছেলে হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে তারা বেঁচে থাকে। মায়ের কাছে সন্তান বিদায় নিয়ে দূরে কথাও চলে গেছে। সেই শহীদ মায়েরা তাদের ছেলের মুখ আর কোন দিনও দেখতে পাবে না, তাদের ছেলেরা বর্ষার তুমুল বর্ষণে মায়ের হাতের আদরে মাখা খিচুরী খাবে না, ঘোমটার ফাঁক গলে চেয়ে থাকা মায়ের দৃষ্টি নিয়ে শরতের আকাশে ঘুড়ি উড়াবে না, কনকনে শীতের রাতে মায়ের বুকের উষ্ণতা নিবে না, ক্লান্ত হয়ে বাসায় এসে মায়ের শাড়ির আঁচলে মুখ মুছবে না, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুরে মায়ের খোলা শীতল পিঠে কচি শরীর লেপটে ঘুমাবে না, মায়ের অনেক আদরের মানুষটি কখনই মাকে নিয়ে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেকে দেখতে পাবে না।

http://www.somewhereinblog.net/blog/irtejablog/28710518

দুর্বৃত্ত যাত্রাপথ (একটি অনুগল্পের দুর্বল উৎক্ষেপন ;-ট্রলার ডুবি মৃত আত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য)

আবদুর রাজ্জাক শিপন
০২ রা জানুয়ারি, ২০০৮ ভোর ৪:৪৯

***২০০৩-এর শেষের দিকে সম্ভবত এম ভি নাসরিন মেঘনার বুকে তলিয়ে গিয়েছিল । সাথে নিয়ে গিয়েছিল অনেক মায়ের সন্তান, অনেক সন্তানের পিতাকে । এই অনুগল্পটি সেই সময়ে লিখিত ।*

*২০০৮-এর শুরুতে আজ আবার মুন্সিগঞ্জে ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ হলো মানুষ । দুর্বৃত্ত যাত্রাপথের কবলে নিজেদের হারিয়ে ফেলা সেইসব মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য. . . ।***

এক

কাক ডাকা ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো সুমুর । সুমুর বেলায় এরকমটা হয় না । ওর ভোর হয় সকাল ন'টায় । কিন্তু আজ হয়েছে । আজ একটু অন্যরকম, ব্যতিক্রম । আজ সুমুর বিশেষ দিন ।

কি যে আনন্দ হচ্ছে সুমুর । ভীষণ আনন্দ । মনে হচ্ছে, সে আসলে মানুষ না, পাখি ! ডানাওয়ালা পাখি ! ডানামেলে উড়ছে আকাশ হতে আকাশে । বাতাসে-বাতাসে । আজ দিনটা ভাল কাটবে তার । ভীষণ ভাল । কতোদিন পর মাকে দেখতে পাবে আজ। ক-তো-দি-ন পর !

গেল মাসে মা' কে চিঠি লিখেছিল সুমু, -

মা ! মাগো !

তোমার ঘরকোণো ছেলেটা আসছে আর ক' টা দিন পর । আসছে তোমার কোলের কাছে বসে তোমার হাতে ভাতের গ্রাস খেতে । তোমার আঁচলে মুখ মুছতে । তোমার কোলে মাথা রেখে নির্ভরতার ঘুম দিতে । আর . . ? আর দশ - বিশটা টাকার জন্য রোজ তোমার পাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে !

আমার লক্ষ্মী মা ! এরকম যন্ত্রণা করলে তুমি কি, তোমার অবুঝ ছেলেটার 'পরে রাগ করবে খুব ?

ক' দিন পর যথারীতি মায়ের উত্তর পেয়েছিল সুমু । তার অসম্ভব ভাল মা' টি লিখেছিল, -

আমার চোখের মণি; বাছারে !

পড়ালেখার জন্য তোকে ঢাকায় পাঠিয়ে, মায়ের যে কি কষ্ট, তা কি তুই বুঝিসনা ? খেতে বসলেই তোর কথা মনে পড়ে , না জানি, বাছা আমার কি খাচ্ছে ! তখন আর গলা দিয়ে নামতে চায় না খাবার । সুমু, বাপ আমার; তুইতো জানিস না, তোর হইচই নেই বলে এখন মাঝে মাঝে এই ঘরটাকে আমার গোরস্থান বলে মনে হয় ! তোর যন্ত্রণা সইবার জন্যইতো তোর এ দুঃখীনী মা পথ চেয়ে অপেক্ষা করছেরে সোনামাণিক আমার ! শিঘ্র এস মাকে একবার দেখা দিয়ে যা ।

হ্যাঁ, সুমু যাবে । মায়ের কাছে ছুট দেবার সেই কাঙ্ক্ষীত দিন আজ। দিনের আলো কমে এলেই মায়ের উদ্দেশ্যে ছুট দেবে সে ।

দুই

রাত এগারটা চল্লিশ। ঘুটঘুটে অন্ধকার মেঘনার বুক। সুনসান নীরবতা লণ্ডময়। দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নৌযানগুলোতে জ্বলছে পিটপিট আলো। এ যেন দূরের কোন দ্বীপে দূরের বাতিঘর। অন্ধকার মেঘনার বক্ষ চিড়ে ছুটে চলেছে এম ভি নাসরিন- এক। নাসরিনের মাস্তুলে জ্বলা সার্চ লইট থেকে ছিটকে আসা একরাশ আলোয় পথ চলছে নাসরিন। উত্তাল মেঘনায় টালমাটাল নাসরিন অকস্মাৎ প্রচন্ড ঘূর্ণনে কেঁপে ওঠে। সুমুর চোখের ঘুমভাব কেটে যায়। বিস্ফোরিত চোখে নির্বাক সুমু দেখে তীব্র বেগে তলিয়ে যাচ্ছে নাসরিন। পলক ফেলার সময় পায় না সুমু। ঝপাস শব্দে মেঘনার জলরাশি ঢেকে দিয়ে যায় নাসরিনের ডেক। আগ্রাসী মেঘনার দুরন্তস্রোত দুর্বার গতীতে সুমুকে অতলান্তে টেনে নিয়ে যায়। সর্ব শক্তি প্রয়োগে একবার শুধু চিৎকার করে সুমু, - মা. . . !

পৃথিবীর আকাশে বাতাসে সে আর্তচিৎকার পৌঁছায় না আর ! !

http://www.somewhereinblog.net/blog/neelblog/28755879

একটি ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা (কোন বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা হয়নি)

প্রলয় হাসান
১৭ ই মার্চ, ২০০৮ রাত ৩: ২২

সেন্টজর্জ হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে প্রভা। সেন্ট জর্জ হাইস্কুলে ইয়ার টেনে পড়ে। খুব সুন্দর, গোলগাল মায়া কাড়া চেহারা, অত্যন্ত রুপবতী। মায়ের মত লাল টকটকে হয়েছে গায়ের রং।

প্রভা প্রচন্ড স্পর্শকাতর একটা মেয়ে। অত্যন্ত আবেগপ্রবন। হঠাৎ করে কিছুদিন আগে, একটা পারিবারিক কারনে ওর মারাত্মক নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অর্ধেকে নেমে আসে। তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ওকে।

হাসপাতালের ব্যাক ইয়ার্ডের বিশাল একটা ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। ওর বেডের খানিকটা দূরে; একটা জানলা থেকে সেই গাছের একটি মাত্র ডাল দেখা যায়। সে ডাল ভর্তি পাতা। সকালবেলার নরম রোদ পড়ে সেগুলো ঝলমল করতে থাকে। প্রভা যখন সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তখন সে আলোর ঝলকানি ওর চোখের তারায় খেলা করে।

শুয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে প্রভার যখন খুব বোর লাগে, তখন সে সেই ডালটার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। সে ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দিতে পারে এভাবে। ছোট্ট এই ডালটাকে সে অসম্ভব ভালোবেসে ফেলেছে। সেটাকে মনে হয় যেন তার শরীরেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ!

ঘুম থেকে উঠেই সে আগে ওটার দিকে তাকাবে। ইউক্যালিপটাসের পাতা দেখে তার ভোর হয়। প্রতিরাতে শোয়ার আগে সে পাতা গুনে, ভোরে ঘুম থেকে উঠে আবার পাতা গুনে। একদিন রাতে নার্স কুলিং সিস্টেম অন করে ওর কেবিনের জানলাটা লাগিয়ে রেখে গিয়েছিলো। ভোরে প্রভার দৃষ্টি অনেক - হাতরিয়েও ডালটাকে না পেয়ে চিৎকার করে উঠল। নার্সরা দৌড়ে এল। ও চেচাচ্ছে- - "ওপেন দ্য উইন্ডো, ফর গড সেইক, ওপেন দ্য উইন্ডো"। জানলা খুলে দেবার পর সে শান্ত হল। ডাক্তারের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। মেয়েটা কি তাহলে মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে?

গত কিছুতিন থেকে প্রভা খুব অদ্ভুত এক দুঃসপ্ন দেখছে। দেখছে, গাছের পাতা গুলো ওর চোখের মাসনে একটা একটা করে কালচে হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। এভাবে একসময় গাছটা নিঃশেষ হয়ে গেল। এরপর ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এই সপ্নটাকে ও ইদানিং ও অসম্ভব ভয় পায়।

সেদিন সকালবেলা ওর বাবা এসেছিলো ওকে দেখতে। - - -

- কেমন আছো মামনি, ভালো?

- হুমম। " গাছটার উপর থেকে চোখ না সরিয়ে বল্ল প্রভা।

- মামনি, তোমার মাম আর আমি মিলে একটা হলিডে প্ল্যান করেছি। ইজিপ্টে। সাতদিন থাকবো। তুমি যাবে আমাদের সাথে?

- মাথা নেড়ে না করল প্রভা।

- কেন যাবেনা মামনি?

- জানিনা।

- প্রভা, মামনি আমার, আমার উপর রাগ করেছো?' ওর মাথায় হাত বুলালো বাবা।

-Dad, would you mind to get out of here, please?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন তিনি।

প্রভার পাশের বেডটা খালি ছিল এতদিন। হঠাৎ একদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে ও যারপর নাই অবাক হয়ে গেল। ওর পাশের বেডে একটা ছেলে আধশোয়া হয়ে বসে আছে। কোলের উপর একটা ছোট্ট পেইন্টিং ক্যানভাস। রং তুলি দিয়ে আপনমনে ছবি আঁকছে ছেলেটা।

প্রভা উঠে বসে দেখতে চেষ্ট করল ছেলেটা কি আকঁছে। সেটা খেয়াল করে ছেলেটা বল্ল- Hi, Good Morning.

- hi, Morning.

-have I waken you up, I'm sorry.

-no no its Alright. i've waked up by my own.

প্রভা আবার দেখার চেষ্টা করতেই ছেলেটা বল্ল- No worries, when i've finished drawing, i''ll let you to have a look on it.

প্রভা ঘাড় কাত করে সায় দিল।

প্রভা শুয়ে শুয়ে চুপচাপ ছেলেটার ছঁবি আকা দেখতে লাগল। একটুপর ছেলেটা হাত উঁচু করে দেখাল, একটা ক্যাকটাসের ছবি। একেবারে জীবন্ত মনে হচ্ছে।

-wow! Its great!!

-Thanks.

-Are you an artist?

-Not really. But i like drawing since i was very young, from my childhood. umm...you can say i'm an artist...preety much. বলেই হো হো করে উঠল ছেলেটি।

এরপর অনেক কথা হল ওদের। প্রভা জানতে পারল ছেলেটার নাম জেফ, জেফারসন। আইরিশ। কিন্তু জন্ম এবং বেড়ে উঠা সিডনীতেই। প্রায় ওরই বয়সী। গতকাল রাতে ফ্রেন্ডের পার্টি থেকে বাড়ী থেকে ফেরার পথে একদল কালো দৈত্য এ্যাবোরা ওকে অকারনে মারধর করে। কিছু কিছু এ্যাবোর কাছে সাদা চামড়া এখনও দুচোখের বিষ। চাদর সরিয়ে গোড়ালির কাছে একটা ব্যান্ডেজ দেখালো জেফ, আঁতকে উঠল প্রভা।

ছেলেটা খুব অনায়াস ভঙ্গিতে কথা বলে। মনেই হয় না ওদের পরিচয় মাত্র কিছুক্ষন আগে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো ছেলেটা একবারো প্রভার কাছে কিছু জানতে চায়নি। এমনকি ওর নামটাও না।

প্রভা টয়লেটে যাবার জন্য বেড থেকে নামতেই দেখে ছেলেটার সাইড টেবিলে আঁকাআঁকির রাজ্যের জিনিসপত্র। তার মানে হাসপাতালে আসার আগে তৈরী হয়েই এসেছে ছেলেটা। কি অদ্ভুত!

হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখল ছেলেটা এবার পেন্সিল স্কেচ শুরু করেছে। খুব দ্রুত একমনে কি যেন একেঁ যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ছেলেটা চিকিৎসার জন্য নয়, ছবি আঁকার জন্য হাসপাতালে এসেছে। কি অদ্ভুত!

একটু পর দুজনের জন্য নাস্তা আনা হল। হাসিমুখে জেফকে দেখিয়ে নার্সটা বল্ল- "hi prova, he's your new mate. Last night he came here while you're slepping." নার্সের কথা শুনে জেফ একবার শুধু মুখ তুলে একটি মুচকি হেসে আবার নিজের কাজে মন দিল। কি অদ্ভুত ছেলেরে বাবা!

ছেলেটাকে নিঃসঙ্কোচে অনেক কথা বলে ফেলেছে প্রভা। ওর নিজের কথা, ওদের পরিবারের কথা, ওর পোষা বিড়াল 'কিটির' কথা, এমনকি ওর সেই দুঃসপ্নটার কথাও। তবে একটা কথাও জেফ বৈঠকি মেজাজে শুনেনি। সবসময়ই তার হাত ক্যানভাসে নেচে বেড়িয়েছে। ব্যাপারটি খুব অফেনসিভ লেগেছে প্রভার কাছে। তবে ছেলেটা যে খুব ড্রইং পাগল ছেলে এটা বোঝা যায়। ওকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে প্রভা।

একদিন ভোর বেলা প্রভা ওর বিছানায় বসে বসে বই পড়ছে। হঠাৎ দেখল ডালটায় একটা পাতা কম। দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখে একটা পাতা কালচে হয়ে জানালার কার্নিশের নীচে পড়ে আছে। হতাবহুবল ও জেফারকে সব খুলে বলতেই ইউ আর সো সিলি" বলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল জেফ। প্রচন্ড বিরক্ত হল প্রভা।

এরপরদিনও একটি পাতা উধাও। তারপর আরেকটি। তারপর আরেকটি। এরপরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটতে লাগল। প্রভার নাওয়া খাওয়া ঘুম সব হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। চোখের নীচে কালি পড়ে গেল সারারাত না ঘুমানোর জন্য। শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। রক্তে হিমোগ্লোবিন আর গ্লুকোজের মাত্রা ভয়ংকর কমে গেল। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল প্রভা।

জেফারের সাথেও ও কোন কথা বলে না। সারাদিন শুধু গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পরদিন ভোরে জেফারের ঘুম ভাংগল প্রভার ফোপাঁনির শব্দে। বুঝল আরেকটা পাতা খসে পড়েছে। নার্স ডাক্তারেরা ছুটাছুটি করতে লাগল, দিনে হাজারটা টেস্ট করতে লাগল কিন্তু কেউ কিছু ধরতে পারছে না যে কিভাবে এই সুস্থ্য সবল মেয়েটি মৃত্যুকে বরন করে নেবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

বিকেলের নরম রোদ পড়ে ওর চেহারা আরো দুখী দুখী করে তুলেছে। বিষন্ন মনে সেদিকে চেয়ে জেফার ভাবছে যে তার মত একটা জিপসী টাইপ ছেলে এই দুখী মেয়েটার জন্য কি করতে পারে।

প্রভা প্রায় কোমায় চলে গেছে। সারাদিন স্যালাইন দেয়া হয়। মাঝে মাঝে একটু পর পর চোখ পিট পিট করে তাকায়। ওর বাবা- মা এসে সারাক্ষন ওর পাশে এসে বসে বসে কাদছেঁ।

হঠাৎ একদিন ভোর বেলা জেফার দেখল যে ডালটিতে একটি মাত্র পাতা অবশিষ্ট আছে। ও সাঁ করে প্রভার দিকে তাকাল। দেখল মেয়েটা সেদিকে চেয়ে হাসছে। তার মৃত্যু ঘন্টা যে বেজে গেছে সেটা সে বুঝে গেছে।

জেফার সারাদিন কোন ছবি আকতে পারল না। গত ১০ বছরে এই প্রথম ওর একটা দিন গেল যেদিনে ও একটা ছবিও আকেঁনি।

চোখের সামনে মেয়েটা এভাবে মারা যেতে পারে না। মেয়েটার জন্য কিছু একটা করা উচিৎ তার। কিন্তু কি করবে সে?

জেফার হঠাৎ উঠে বসল। সারাদিন না ছোঁয়া ক্যানভাসটা হাতে নিল সে। খুব সিরিয়াস কিছু আকতে হলে জেফ দাঁড়িয়ে দাড়িঁয়ে আকেঁ। সেভাবেই আকতে লাগল সে। প্রভা তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

খুব ধীরে ধীরে নিঁখুত ভাবে ছবিটা আকছে জেফ। কোন তাড়াহুড়া নেই। অথচ সে জানে তাকে আজ রাতের ভেতরেই ছবিটা একেঁ শেষ করতে হবে। যে করেই হোক।

জেফ আকতে লাগল তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মটি।

পরদিন ভোরে প্রভা অবাক বিস্ময়ে দেখল যে পাতাটি এখনও তার আগের জাগাটিতে রয়ে গেছে। বাকী সব গুলোর মত ঝরে যায়নি।

পরদিনও একি অবস্থা। তার পরদিনও একি অবস্থা। পাতাটি আর ঝরে না।

প্রভা একসময় উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে তখন পাতাটা খুব ছুঁতে ইচ্ছা করত। কিন্তু দুর্বলতার জন্য বেড থেকে নামতেই পারত না।

ও সেরে উঠতে লাগল দ্রুত। আবার বই পড়া শুরু করল। আবার খাওয়া দাওয়া করতে লাগল। এবং কিছুদিনের ভেতর সে পুরোপুরি সুস্থ্য হয়ে বাসায় চলে গেল। গাছটার কথা আর মনেও রইল না। বাবা- মা প্রমিজ করল, এখন থেকে তারা তাকে মাথার মুকুট করে রাখবে। আসার আগে নার্সকে জিগেস করে জানতে পারল কিছুদিন আগে খুব ভোর বেলা জেফ হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে চলে যায়। তখন ও ঘুমে ছিলো। ও আবারো অবাক হলো। ছেলেটা যখন এসেছিলো তখনও ও ঘুমে ছিলো, অবার যখন ও চলে গেল, তখনও ও ঘুমে!

বাসায় ফেরার পরদিন হঠাৎ একদিন হাসপাতাল থেকে ফোন। ও নাকি একটা বই ফেলে এসেছে ওর কেবিনে। গিয়ে নিয়ে আসতে বল্ল। যাব যাব করেও আলসেমির জন্য অনেকদিন যাওয়া হল না। একদিন স্কুল ছুটির পর হুট করে হাসপাতালে হাজির হল প্রভা। বইটা নিয়ে বাসায় যাবার সময় হঠাৎ করে সেই ডালটা কথা মনে হল। ছুটে গিয়ে দেখে ওর সেই কেবিন এখনো খালি, তাই একদম ঝকঝকে তকতকে। ও জানলার কাছে গিয়ে দেখল এখনও সেই পাতাটি ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। এটাকে এতদিন ভেলে ছিলো নিজেন উপর খুব রাগ লাগছে ওর।

হাত বাড়িয়ে ছুতেই মস্ত এক ঝাকি খেল ও। মাথাটা আবার ঝিমছিম করে উঠল। মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাবে ও।

ইউক্যালিপটাস ডালটার একটা ড্রয়িং। একটি ডাল, তাতে একটি পাতা। খুব সুন্দর করে জানালার ফ্রেমের সাথে সাঁটানো। হুবহু সপ্নে দেখা সেই গাছটার মত। ফ্রেম থেকে খুলে নিয়ে আসতেই পেছনের আসল ডালটা চোখে পড়ল। একটা শূন্য ডাল। একটা পাতাও আজ আর নেই । সবগুলো ঝরে পড়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ল জেফারের একটা কথা: "One day i''ll draw such a picture so that atleast a human will miss me seeing that."

ছবিটা দুহাতে ধরে ও ব্যালকনিতে নিয়ে আসল। আকাশে খুব মেঘ করেছে। একটু পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নামতে লাগল। সে বৃষ্টিতে জেফারের ক্যানভাসের শকনো জল রং গুলো চুইয়ে চুইয়ে পড়তে লাগল।

(এই গল্পের পিছনের কাহিনী: - আমার এক দূর সম্পর্কের ভাতিজী প্রভা। কদিন আগে বিশেষ একটা কারনে ওকে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। ওকে প্রায়ই দেখতে যেতাম। আমার সাথে গুটুর গুটুর করে কথা বলত মেয়েটা। ওর কেবিনের জানলা দিয়ে একটা ইউক্যালিপটাস গাছ দেখা যেত।

আমার এক কলিগের বয়ফ্রেন্ড জেফারসন। ওর আকা ছবি দেখলে যে কারো মাথা ঘুরে যাবে। আমাকে একদিন ওদের বাসায় ডেকে নিয়ে ওর আকাঁ কিছু ছবি দেখিয়েছিলো। আমারও মাথা ঘুরে গিয়েছিলো। প্রভা তখনও হাসপাতালে।

জেফদের বাসা থেকে ফেরার পথে হঠাৎ করে গল্পটার প্লট পেয়ে যাই। কিন্তু লেখার পরে কেমন যেন এখনও একটা অতৃপ্তি কাজ করছে। প্রতিটা পোস্ট দেবার পর যে আনন্দটুকু পাই, কেন যেন সেটা পাচ্ছি না।)

http://www.somewhereinblog.net/blog/proloyhasanblog/28779785

না পাঠানো চিঠি

তামিম ইরফান
২৯ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ ভোর ৬: ৫২

বহুদিন পর তোমাকে লিখতে বসলাম, কি লিখব বলো,
তুমি হয়তো ভুলেই গিয়েছো কতদিন তোমাকে সুন্দর সকাল দিয়েছি-
যার অপেক্ষা তুমি করেছিলে অনেকদিন ধরে,
তারপর আমি তোমাকে ভরা রোদ্দুরের মতো দুপুর দিয়েছি-
যার প্রতীক্ষায় তুমি ছিলে বছরের পর বছর,
তোমাকে আমি বিকেল দিয়েছিলাম বৃষ্টির মতো উজ্জ্বল-
যা তুমি বহু শতাব্দী ধরে খুজেও পাওনি,
সন্ধ্যার পর রাত্রি দিয়েছিলাম জোৎস্যার অবসরে-
যেখানে রাতের কষ্ট জুড়ে গিয়েছিলো সত্যিকারের জোৎস্যায়।

যেভাবে বেচে আছি সেটাই বলি শোনো-

একটা সুন্দর সকালের প্রত্যাশায় যখন মেতে উঠি,
দেখি, সকালের নাস্তা শুকিয়ে গেছে।
অচেনা পথে হাটতে শুরু করি,
প্রচন্ড রোদ্দুরে, যখন সূর্য্য মাথার উপরে, বিদ্রোহী হয়ে উঠি ইশ্বরের প্রতি।
যখন খুব বৃষ্টি হয়, ভাবি একটু ভিজে আসি, ভাবনায় চলে, আসে না শরীর খারাপ করতে পারে,
বিকেলের শেষ আলো টা যখন নিভু নিভু, তখন-
কখনো পুরোন প্রেমিকার কথা অগোচরে মনে আসে,
বাতাসে হাতরিয়ে মরি।
সন্ধ্যার অবসরে আড্ডার মাঝে অতীতের কফি হাউসের মৃত্যু আর্তনাদ কানে বাজে।
অবহেলায় রাতের খাবারে জিহবায় পানি জমে না, ক্ষুধা থেকে যায়।
তারপর ঘুমুতে যাবার ভান করি নিজের সাথে, আমাকে না জানিয়ে কখন যে ঘুম চলে আসে- সে নিজেও বলতে পারে না।

যখন ঘুম ভাংগে, দেখি পিসি টা বন্ধ করা হয়নি,
গান বেজে যাচ্ছে. . . . " ভোর হয়নি, আজ হলোনা, কাল হবে কিনা তাও জানিনে, পরশু ভোর ঠিক আসবে-
এই আশাবাদ তুমি ভুলোনা"

তারপর আবার একটা সকাল চলে আসে।
প্রত্যাশা শুরু হয়- নতুন করে, নতুন ভাবে, নতুন কোথাও।

http://www.somewhereinblog.net/blog/golaapaliblog/28775045

আমাদের মিলগুলো (মিল খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা। মিল খুঁজে না পেলে কেউ দায়ী থাকবে না।)

একরামুল হক শামীম
০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ১০: ০৬

তুমি বলো, তোমায় আমায় অনেক অমিল
তোমার রাস্তা যেখানে শেষ আমার রাস্তা সেখানে শুরু।
তুমি ঠিক ঠিক বেছে বেছে অমিলগুলোই বের কর
তোমার কান্ড দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি আমি
তারপর আমি তোমার আমার মিল খুঁজতে যাই-

আমি গ্রাম্য রাতে কলপাড়ে দাড়িয়ে জোসনা দেখি
পাশেই মৃদু আলোয় তিনটা কলাগাছ থাকে দাড়িয়ে
চারটা বুনোপাখি উড়ে ডেকে যায় একমনে,
আর তুমি নাগরিক রাতে বারান্দায় দাড়িয়ে
উপলব্ধি করো সাতটা সমান্তরাল নিয়ন বাতি
লোকে তাকে বলে স্ট্রিটল্যাম্পের আলো।
আমাদের মিলটা কোথায় জানো?
আমি গ্রাম্য কলপাড়ে একা, আর তুমি বারান্দায় একা
দুজনেই একা, এটাইতো অনেক বড় মিল।

আমি গ্রাম্য সকালে শিউলি কুড়াতে যাই
হাতে থাকে একটা সুতার গুটি
মাড়িয়ে চলি পাঁচটা বাড়ির আঙ্গিনা
জমে থাকা শিউলি ফুল মুগ্ধ চোখে দেখি,
তুমি নাগরিক সকালে দুইটা ঝাড়বাতি জ্বালাও
তিনটা অ্যাকুরিয়ামে ঘুরে বেড়ানো মাছের রঙ দেখ
ঘরের কোনে থাকা একটা বনসাই দেখে মুগ্ধ হও।
তোমার আমার মিলটা কোথায় জানো?
আমি শিউলিতে মুগ্ধ, তুমি মুগ্ধ বনসাইয়ে
দুজনেই সমান্তরাল মুগ্ধতায় ভুগি।
তবুও কি বলবে, তোমায় আমায় অনেক অমিল,
তোমার রাস্তা যেখানে শেষ, আমার রাস্তা সেখানে শুরু?

http://www.somewhereinblog.net/blog/tanmoytahsanblog/28766997

তারুন্য (কিছু সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করলাম)

তানজিলা হক
১১ ই ডিসেম্বর, ২০০৭ দুপুর ১: ৩১

তারুন্য-
দিগন্তকে স্পর্শ করে এক কেজি নীলাভ আকাশ
আর আধা কেজি ধুলো দিয়ে খিচুরি বানানোর অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

"পারবি না দাদু ভাই" - বুড়ো দাদিমা যখন তার ফোকলা দাঁতে
মুচকি হেসে বলে,
হাতের গতিবেগ যেনো এক লাফে গিয়ে পরে
ঘন্টায় ১৮০ থেকে ২৮০ কিলো মিটারের ঘরে।

এরুপ গতিবেগ কেরে নেয় দাদিমার মুখের হাঁসিটা
রেখে দেয় অজানা ভয়ের মলিন রেখা।

ক্ষনিক পরে অশ্রু সিক্ত বৃদ্ধার মুখে
যখন মুখোরোচক খাবারটা পরে
দুশ্চিন্তা , মলিনতা বিষাদ রেখা
আর দেখা যায় না।
যেনো মেঘের আরাল থেকে সুর্য হাঁসতে শুরু কর।

তারুন্য-
এ যেনো বোতল বোতল রক্ত খাওয়ার নেশা।
কখনো বা বৃদ্ধ ববা-মায়ের চোখের জল,
কখনো বস্ত্রহীন শিশুর উদরের তিব্র জ্বালা,
কখনো দুঃখিনি বোনের বলতে না পারা যন্ত্রনা,
কখনো আবার কৃষকের শেষ স্বম্বল ভিটাটা
হারানোর হাহাকারে মিশা।
অভিষ্ট লক্ষ্য পৌছেনোর জন্য
পান করতে পারে এরুপ হাজার হাজার বোতল রক্ত।

তারুন্য-
এ যেনো নিষিদ্ধকে ষিদ্ধ করার নিরন্তর চেষ্টা।
সদ্য ফোটা ফুলের সবটুকু গন্ধ নেয়ার প্রচেষ্টা।
অতঃপর দাত বিহীন বুড়ির মত ছেঁচে পান পাতাটা(হৃদয়)
মুখে পুরে দেয়।
সব রস নিঃশেষ হয় যখন ফেলে দেয় অবহেলায়।

হাজারো বিশেষনে বিশেষায়িতো করা যায় তারুন্যকে
বাকি গুলো না হয় রেখে দিলাম আপনাদের জন্যে।
http://www.somewhereinblog.net/blog/rajkonnablog/28750880

সরাইখানার রোদ্দুর

প্রণব আচার্য
২৬ শে মার্চ, ২০০৮ সকাল ১০:৫২

সরাইখানা থেকে বের হয়ে
আবার গিয়ে ঢুকতে হলো হাসপাতালে
(ততক্ষণে আমি বেড়িয়ে গেছি)
দুটো শুয়োর নাকি আমাকে গরু খোঁজা করছিল

অবাধ্য চুলগুলিকে কেটে ফেলে আবার বেরুলাম
কতক নপুংশকের ছায়ায় শীতল হয়ে
অতঃপর দরদামে মনোযোগী হলাম;

আমাকে তোমার ওষ্ঠ ঘুমুতে দিলনা
চাঁদ আমাকে দারুণ ভাবে কামার্ত করে ফেললো
তুমি ক্রমশ আমার অনাত্মীয়া- ;
তোমার শরীরের মাচিত্রে আজওআমি উদ্বাস্তু
ভোরের কুচকাওয়াজের লজ্জাস্কর ধ্বনি এড়াতে
গত রাতেই ' সিডাকসিন' খেয়ে বেঘোরে ঘুম
তারপর দ্রিম দ্রিম দ্রামাকা দ্রামাকা শব্দ দুষণ
অর্থাৎ স্বাধীনতা উদযাপন- ;

আলস্যে গা এলাতে পারিনি ৩৬ বছর পরও
আমার অপরাধগুলো- হাসপাতালে ভর্তি-
ভরদুপুরে ভর করে; প্রেমিকা নিহত হয়
বেশ্যার শরীরের ব্যবহৃত গন্ধের মতো
রাত নামে; শতশত বছরব্যপী
বিশ্বাস আর যুক্তির দ্বন্দ্বের মতো তুমি মুখোমুখি- ;
তোমার প্লাবিত জ্যোৎস্নায় পুড়ে মরে অজস্র ব্রুণো

আমার অবাধ্য চুলগুলি ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে
সরাইখানা থেকে হয়তো
ঢুকতে হবে হাসপাতালে আবার

http://www.somewhereinblog.net/blog/pranab2008blog/28782598

দৃষ্টিহীন অকবিতা

মানুষ
২১ শে জানুয়ারি, ২০০৮ ভোর ৫:২৯

তবে বলি শোন,
যদিও রাস্তায় চলমান গাড়িগুলো দেখে তৃপ্ত নই আমি।
তবুও ফুটপাথে শুয়ে থেকে ভিক্ষে করে যে পঙ্গু মানুষ
তাকে দেখে করুণায় আর্দ্র হই না আজকাল।
বিজ্ঞাপনের রমনীরা চোখে যে স্বপ্ন আনে,
তার সবটাই অশ্লীল, সেখানে সুশীলতা নেই।
আর তাই চলমান ছবির বাক্সতে যুদ্ধাহত নীথর কোন দেহ দেখলে
দ্রুত ছবি পাল্টাতে দ্বীধা করি না।
পত্রিকাতে সাহায্যপ্রার্থী মানুষদের খবরটা এড়িয়ে
শান্ত হাতে সাহিত্য সাময়ীকি অথবা ফান ম্যাগাজিনটা খুঁজি।
ওদের কথা জানাটা সময়ের অপচয় মনে হয় ইদানিং।

কিছুদিন আগে জেনেছি শ্রেনী সংগ্রাম আসলে অর্থহীন প্রলাপ।
তাই ফুড চেইনে সবার উপরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।
এখন অবিচার দেখে এই চোখ জ্বলে ওঠে না, বৃষ্টি ঝরায় না।

তাই বলি শোন,
এই চোখে রেখো না চোখ, অন্ধ হয়ে যাবে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/ranjan1357blog/28762780

বিবর্ণ দুপুর

রোডায়া
২৭ শে মার্চ, ২০০৮ রাত ১০: ১৮

আমি বসে ছিলাম পার্কের মধ্যে। অনেক দিন পর রমনা পার্কে এলাম। পার্কটা ইদানিং অনেক সুন্দর আর গোছালো হয়েছে। এই শহরে সব জিনিষ দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যায়, ব্যতিক্রম এই পার্কটা। এই একটা জিনিস অন্য সবকিছুকে কলা দেখিয়ে দিনে দিনে উন্নতি করে যাচ্ছে। ঢাকায় প্রথম আসার পর পার্কটাকে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়ে এটা এখন অনেক গোছানো আর পরিচ্ছন্ন।

পার্কের মাঝামাঝি একটা নির্জন জায়গায় একটা বেন্চে আমি বসেছিলাম। বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম। হঠাৎ শুনলাম আমার পাশ থেকে কেউ বলল, "আমি একটু আপনার পাশে বসি?"

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। আমার বেন্চের ডানদিকে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোকের বয়স পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে হবে। পার্কের মধ্যে বসার জন্য এত ফাঁকা বেন্চ থাকতে আমার পাশে তিনি কেন বসতে চাইছেন? আমি একটু বিরক্ত হলাম। ঢাকা শহরে ধান্দাবাজের অভাব নেই। ইনিও সেরকম কোন ধান্দাবাজ কিনা কে জানে? কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে সেরকম মনে হলো না। নিতান্ত পরিপাটি ভালো মানুষ বলেই মনে হলো।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। এই মধ্যদুপুরে পার্কটা প্রায় ফাঁকা। যদিও বৈশাখের প্রথম দিনে এই পার্কটাতেই পা ফেলার জায়গা থাকেনা, কিন্তু আজকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অল্প কিছু মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ভদ্রলোক কিছুক্ষন চুপচাপ বসে থাকলেন। তারপর উসখুস করে বললেন, "আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?"

তা আমি একটু হচ্ছিলাম বইকি। আমি এসেছিলাম চুপচাপ একা একা কিছুক্ষন বসে আকাশ পাতাল ভাবার জন্য। কিন্তু আমি সেকথা বললাম না, তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, যার অর্থ যেকোন কিছু হতে পারে ।

"একটা গল্প শুনবেন?" ভদ্রলোক বললেন।

এবার আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। গল্প শুনতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে, যদি সেটা রাজনীতি বিষয়ক গল্প না হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন গল্প জানে না। দেখা যাক ইনি কি বলেন।

মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ বলেন।"

"আপনি কি বিয়ে করেছেন?" উনি জানতে চাইলেন ।

"না।" আমি জানালাম ।

"আমি বিয়ে করেছিলাম আপনার চেয়েও কম বয়সে।" ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন। "এ্যারেন্জড ম্যারেজ ছিলো। প্রেম করে বিয়ে আমাদের কপালে নেই বুঝলেন না। আমি অতি সাধারণ মানুষ, চেহারাও এমন কিছু আহামরী না দেখতেই পাচ্ছেন। কোন মেয়ে আর আমার সাথে প্রেম করবে বলেন?"

একথার উত্তরে কি বলা যায় বুঝলাম না, তাই চুপ করে রইলাম। উনি বলতে থাকলেন, "এ্যারেন্জড ম্যারেজ হলেও, আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবেসেছিলাম প্রচন্ড। আমার জীবনে সে ছিলো প্রথম নারী। কি যে বিস্ময়! প্রচন্ড ভালোলাগায় আমি ভেসে গেলাম। দিনগুলি যাচ্ছিলো যেন স্বপ্নের মত। আহ্ কি মধুর ছিলো সেই দিনগুলো!

আমি নড়েচড়ে বসলাম। গল্প কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক অতীত কালে কথা বলছেন কেন?

উনি আবার শুরু করলেন, বিয়ের পর কয়েক বছর পার হয়ে গেলেও আমাদের কোন ছেলে মেয়ে হচ্ছিলো না। আমার অবশ্য তাতে খারাপ লাগছিলো না, কিন্তু আমার স্ত্রী একটা বাচ্চার জন্য অস্থীর হয়ে উঠছিলো। হবেইতো, সারাদিন আমি বাইরে বাইরে থাকি, আর সে বাসায় একলা থাকে। তার সময় কাঁটে

কিভাবে বলেন? আমরা অনেক ডাক্তার দেখালাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিলো না। অথচ আমাদের কারো কোন সমস্যাও ছিলো না।

ভদ্রলোক চুপ করলেন। একটু থেমে আবার শুরু করলেন, "তারপর, আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে, আমাদের একটা মেয়ে হলো। কি যে সুন্দর হয়েছিলো সে! কি যে ফুটফুটে সুন্দর! আমি ভাবতাম, আমার স্ত্রীকে যতটা ভালোবাসি তা আর কাউকে বাসতে পারব না। কিন্তু সেই পিচ্চিটা সব অন্যরকম করে দিলো। যখন বাইরে যেতাম, খালি পাগলের মত ভাবতাম কখন বাসায় গিয়ে ওকে কোলে নিব। একটু একটু করে সে বড় হতে লাগলো। গুট গুট করে হামাগুড়ি, আমার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে একটা দাঁত বের করে ফিক করে হাসা, আমার মনে হত পৃথিবীতে এর চেয়ে সুখ আর কিছু নাই। আমার চেয়ে সুখি আর কেউ নাই।"

ভদ্রলোক আবার চুপ করলেন। সামনের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না ঘটনা কি হয়েছে। যতদূর মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের মেয়েটি এখন আর বেঁচে নেই। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। এরকম একটা গল্প আমি শুনতে চাইনি।

'সেদিনটা ছিলো পয়লা বৈশাখ, এক বছর আগে' ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন। 'আমি আমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে এই পার্কে আসলাম। কি ভীড়! কিন্তু সে ভীড়ও যে কি ভালো লাগছিলো। আমি আর আমার স্ত্রী মেয়ের হাত ধরে হেঁটে বেড়ালাম। আমার মেয়েটা, ওর নাম ছিলো নিশিতা, ওর বয়স তখন চার বছর, কি খুশি পার্কে এসে! খালি আমাদের হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলো, আর আমি দৌড়াচ্ছিলাম ওর পিছন পিছন। ঘুরতে ঘুরতে আমরা শিশু পার্কের সামনে গেলাম। ওখানে অনেক বেলুনের দোকান। নিশিতা আমাকে বলল, 'বাবা আমাকে বেলুন কিনে দাওনা'। আমি বেলুন কিনে মেয়ের হাতে দিলাম। তারপর আমরা গেলাম শিশু পার্কের মিশুকটার পিছনের দোকানে চটপটি খেতে। জানেনইতো কি ভীড় থাকে ঐদিন ওখানে। ভীড় ঠেলে দুইটা চটপটি নিয়ে একটা আমি নিলাম, একটা নিশিতার আম্মাকে দিলাম। চটপটি খেতে খেতে হঠাৎ মনে হলো নিশিতার কোন কথা শুনছি না অনেক্ষন। তাড়াতাড়ি পাশে তাকালাম, কিন্তু নিশিতাকে দেখতে পেলাম না। আমার হাত থেকে চটপটির প্লেট পরে গেলো।'

উনি আবার চুপ করলেন। কি হয়েছিলো আমি আন্দাজ করতে পারছি। মাথা নিচু করে বসে রইলাম। একটু পর ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'অনেক খুঁজেছি অনেক। আমি সম্ভব অসম্ভব সব ভাবে চেষ্টা করেছি। তাকে আর খুঁজে পাইনি। আমার মাথাটা, বুঝলেন না, কেমন জানি পাগলের মত হয়ে গেলো। আমার সব আওলায় গেলো। আমার খালি মনে হয়, মনে হয়, . . . আমার মেয়েটাকে দিয়ে কেউ হয়তো বাসায় থালা বাটি মাজাচ্ছে। সেই সকালে উঠতে হয় আমার মেয়েটার, সারাদিন মুখবুঁজে পরের বাসার কাজ করে যায়. . . . অথবা, অথবা. . . '

ভদ্রলোক দু' হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলেন। যখন মুখ তুললেন, আমি সে মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। নিজের ভেঁজা চোখ আড়াল করার জন্য আমি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগলেন, 'আমার মেয়েটাকে হয়তো, হয়তো. . . হাত পা ভেঙে. . . লুলা করে. . . হাহ হাহ হাহ আল্লা. . . আল্লা. . . ইয়া আল্লা. . . আমার ছোট্ট মেয়েটা. . . আমার ছোট্ট মেয়েটা. . . বোধহয় কোথাও ভিক্ষা করছে. . . ইয়া আল্লা. . . ইয়া আল্লা. . . '

ভদ্রলোক হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। আমি চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক শান্ত নীরব দুপুর চুপ করে বয়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে হাসা হাসি করছে। মাথার উপরে কয়েকটা কাক তারস্বরে চিৎকার করছে। আমার পাশে এক ভদ্রলোক পৃথিবীর সব হাহাকার নিয়ে হুহু করে কাঁদছেন। কি বলব? কি বলব আমি তাকে? আমি কি তাকে বলব যে এরকম নাও হতে পারে? হয়তো কোন যথার্থ ভদ্রলোক তার মেয়েকে খুঁজে পেয়েছেন, নিশিতা হয়তো ভালো আছে, সুখে আছে। এই স্বান্তনাটুকু কি আমি তাকে দিব?

http://www.somewhereinblog.net/blog/rodayaablog/28783026

কি জাদু করিয়া বন্ধে মায়া লাগাইছে !

মানবী
০৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭ সকাল ১০: ৩৭

মানুষের বিভিন্ন রকমের সখ থাকে, কারো কারো সখ আবার বিচিত্র। অনেক ক্ষেত্রে কোন সখ নেশা হয়ে উঠে। আমারও বেশ কিছু সখের কাজের মাঝে একটি অনন্য হয়ে উঠেছে, মনে হয় নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি!

বেশ অনেক বছর আগে নিজের অজান্তেই এই সখের বীজ

বপিত হয়ে গেছে মনে। এখন এমন নেশার মতো হয়ে গেছে যে কিছু দিন না পেলেই মনে হয় কি যেন নেই! এক ধরনের শূণ্যতার সৃষ্টি হয়!

সমুদ্র আমার কাছে নেশার মতো, প্রতি বছর যেতেই হবে, সম্ভব হলে একাধিকবার। অসংখ্য না হলেও বেশ কিছু সৈকত দেখেছি, একেকটি সৈকতের সৌন্দর্য একেক রকম। প্রতিটি সৈকতের আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট। আমাদের দেশের কক্স' সবাজারের মতো সমতল সৈকত যেমন আছে তেমনি আছে পাথুরে সৈকত, পতেঙ্গা সৈকতও কক্সবাজারের চেয়ে ভিন্ন।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে "অরিগন" নামের স্টেটে "ক্যনন বীচ" বেশ নাম করা। এতো গল্প শুনে সেই বীচে গিয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে, সমুদ্রের পাশে বিশাল এক কালোপাথর, আমার কাছে রিতীমতো কুৎসিত মনে হয়েছে, অথচ সেই পাথর দেখতেই নাকি প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ আসে! তবে সেই বীচ থেকে দুরে যে প্রাচীন লাইটহাউজটি দেখা যায়, তাও বেশ আকর্ষনীয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার লস এ্যান্জেলেসের বিখ্যাত 'ম্যালিবু বীচ" দেখে মনে হয়েছে আনন্দের বালুকাবেলা। ব্যস্ত একটি নগরের মাঝেই এই শহুরে বীচ! শত শত (হয়তো হাজার হাজার) মানুষের ভীড়ে সমুদ্র যেন আড়াল হয়ে যায়। সৈকতের ধার ঘেঁষে বিখ্যাত নামী দামী তারকাদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মুল্যের বিলাস বহুল বাড়ি!

সৈকত যেমনই হোক, আমর তেমন ভাবান্তর সাধারনত হয়না, কারন সমুদ্রটাই মূখ্য।

সমুদ্রে দর্শনার্থীদের ভীড় প্রায় সারা বছরই থাকে, গ্রীষ্মকালে বারাবারি রকমের হয়ে যায় সেই জনারণ্য। প্রচুর মানুষ যায় সমুদ্রস্নানে, কেউ কেউ যায় সার্ফিং, স্কুবা ডাইভিং অথবা সান ট্যানিং। গরমকালে বীচ ভলি বেশ জমে উঠে। অনেকেই আবার ঝিনুক কুড়িয়ে আনন্দ পায়। শিশুরা (অনেক ক্ষেত্রে বড়রাও) মনের আনন্দে গড়ে বালির প্রাসাদ! এক বার একজন শিল্পীকে অনেক ধৈর্য্য ধরে একটি মৎসকন্যা গড়তে দেখেছিলাম! কি সুক্ষ কারুকাজ অথচ বালু দিয়ে তৈরী, একটু জোয়ার এলেই সব ধুয়ে যাবে!

আমি সমুদ্রে যাই শুধু সমুদ্র দেখতে। সমুদ্রজলে দাঁড়িয়ে, ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারি। সেসময় যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে তো কথাই নেই! অনেক বছর আগে এক বৃষ্টি ঝরা সন্ধ্যায়, চাঁদের আলোয় বঙ্গোপসাগরে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আবিস্কার করেছিলাম 'সমুদ্র কথা বলে', তার নিজস্ব একটি ভাষা আছে'। সেই ভাষায় কতো রকম অভিব্যক্তি!!! অনেকের কাছে মহা পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে, তবে আমার কাছে এটাই সত্য! সমুদ্রের সেই ভাষা আবিষ্কারের পর আমার এই নেশার শুরু।

ফ্লোরিডার "পেনসাকোলা বীচ' আমার দেখা খুব সুন্দর কয়েকটি বীচের অন্যতম। এই বীচের বালু চকের গুড়োর মতো সাদা, ছুঁলে মনে হয় সাদা কাঁচের গুড়ো হাতে নিয়ে আছি। এক পূর্ণিমায় সেখানে ছিলাম, হোটেলের রুমে বসেই সমুদ্র দেখা যায়, সারা রাত প্রচুর মানুষ জেগে কাটিয়েছে। পূর্ণিমার রাতে মনে হয় সমুদ্র জেগে উঠে, অদ্ভুত প্রানবন্ত এক রূপ ধারন করে! আমি তিন তলার বারান্দায় বসে দেখেছি, চাঁদের আলোর তীব্রতার সাথে কিভাবে একটূ একটু করে সমুদ্র তার রূপ পরিবর্তন করেছে, সৌন্দর্যের এক আসাধারন খেলা। কিছু জোৎস্না পাগল অথবা সমুদ্র পাগলে ছেলে মেয়ে প্রায় সারারাত সৈকতে হাঁটাহাটি করে, বসেই কাটিয়েছে। পেনসাকোলা বীচের কিছু হোটেল এক দম সমুদ্র ঘেঁষে, জোয়ারের সময় মনে হয় সমুদ্র এসে যেন হোটেলের পা ধুয়ে দিয়ে যায়।

আমার এই নেশা দেখে অনেক বন্ধু বান্ধব, পরিচিতজন পূর্ণিমা রাতে সমুদ্র দর্শনে চলে গেছেন, ভাষা বুঝতে না পারলেও নিখাদ ভালোলাগা আর গভীর আনন্দ নিয়ে ফিরেছেন।

এতোদিন পর হঠাৎ এমন লিখছি কারন কয়েকদিন আগে আমি আমার একটি সৈকত খুঁজে পেয়েছি। ঠিক করেছি, বার বার ফিরে আসবো এখানে, যতোদিন যতোবার সম্ভব।

শহর থেকে দুরে প্রশান্ত মহাসাগরের পারে একটি বীচ, এমন ভাবে সংরক্ষিত যে সদ্যজাত শিশুর মতোই নির্মল আর নিখাদ। সুনামী থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই হোটেলগুলো বীচ থেকে কিছুটা দূরে, পেনসাকোলার মতো একেবারে সাগরের গা ঘেঁষে নয়। আমি যাই কেবল সমুদ্র দর্শনে, অন্যকিছুর কথা সেভাবে মনে হয়না, তবে এখানে কিছু জিনিস ভাবিয়েছে। সমুদ্রের পাশে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড, প্রচুর মানুষ গাড়ির পাশে তাবু গেড়ে কাটিয়ে দিচ্ছে তিন চার দিন! সৈকতে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভ করছে(অবশ্য অনবরত পুলিশ টহল দিচ্ছে, কারো গাড়ি আটকে গেলেই ফাইন করবে), ঘোড়ার মালিক ১৫/ ২০ টি ঘোড়া নিয়ে ব্যবসা খুলে বসেছে, মানুষ ঘোড়ায় চড়ে সৈকতে ভ্রমন করছে। দুজন কিশোরীকে বেশ দক্ষ হর্সরাইডার মনে হলো, সৈকত ছেড়ে কিছুটা পানিতে জোরে ঘোড়া ছুটিয়েছে!

সবচেয়ে ভালো লেগেছে, একটি পরিবার ক্যাম্প গ্রাউন্ড ছেড়ে একেবারে সমুদ্রের কাছে এসে তাবু খাটিয়েছেন। তাঁদের দেখে কিছুটা ঈর্ষা আর কিছুটা অনুতাপের মিশ্র অনুভূতি, ভাবা যায়, সারা রাত সমুদ্রের এতো কাছে বসে কাটিয়ে দেয়া! এখানে এসে জেনেছি কতো সুন্দর আর গভীর ভাবে সমুদ্র উপভোগ করা যায়, আর সেই আকর্ষনে শীঘ্রই ফিরতে হবে। তবে, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের বড় দল নিয়ে আসা। শীত দুয়ারে এসে কড়া নাড়ছে, এবছর সমুদ্রে ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা বুঝতে পারছিনা!

দিনের একেক সময়, সমুদ্রের একেক রূপ! ভোরের সমুদ্র শান্ত, স্নিগ্ধ! সৈকতে বেড়াতে আসা মানুষগুলোর আচরণও সৌম্য, শান্ত। সন্ধ্যায় সমুদ্রের আরেক রূপ! টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিলো, আমি দাঁড়িয়ে সমুদ্র জলে, এক সময় মনে হলো হাঁটু জল হয়ে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঢেউ দেখছিলাম, এক সময় নিজের নাম শুনে পিছনে ফিরে দেখি অন্যরা চিৎকার করে ডাকছে, কেউ কেউ ছুটে আসছে, কানে আইপডের ঝংকার থাকায় শোনা যায়নি আগে। হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে মহা প্রশান্ত, পানি অনেক অনেক বেড়েছে! নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ফিরে এলাম। কি অদ্ভুত ভালোলাগা আর বিচিত্র অনুভূতি!

প্রশান্তর পানি ছুঁয়ে মনে হলো, কে জানে হয়তো এই পানি স্পর্শ করে এসেছে আমাদের বঙ্গপোসাগরকে, হয়তো এই ছুঁয়ে যাওয়া পানিই সর্বগ্রাসী রূপ ধরে ধ্বংস করেছে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা আর ভারতের হাজার হাজার জীবন! অথচ সেই এখন কতো মানুষের শ্রান্তি দুর করছে তার নির্মল ছোঁয়ায়!

ফেরার পথে গাড়িতে উঠে মন খারাপ। আমি ড্রাইভ করছিলাম না। মনে হচ্ছিলো খুব প্রিয়, খুব কাছের কাউকে ছেড়ে আসছি, পিছনে ফিরে যতক্ষণ দৃষ্টিসীমায় ছিলো সমুদ্রকে দেখেছি। আমার মন খারাপের কারনে গাড়ির পরিবেশও থমথমে! অপ্রশস্ত পথের দুধারে গাঢ় সবুজ ঝাউবন; লাল, হলুদ, নীল বেগুনী বুনো ফুল ফুটে আছে সেই বনের পায়ের কাছে। আর কিছু দুরে প্রকৃতিতে হেমন্তের সেই বিখ্যাত রূপ ধারন শুরু হয়েছে, গাছের পাতায় বিভিন্ন রঙের আভা! তারপর ও কোন সৌন্দর্য সেভাবে স্পর্শ করছেনা আমাকে, মন পড়ে আছে সমুদ্রের কাছে।

গাড়িতে গান বেজে যাচ্ছে.. "কি জাদু করিয়া বন্ধে মায়া লাগাইছে..."। সত্যিই মায়া!!! মায়ার এই ইন্দ্রজাল ছিন্ন করার সাধ্য অথবা ইচ্ছে কোনটি আমার নেই। এআমার নেশা, আমার সমুদ্র বিলাস!

http://www.somewhereinblog.net/blog/manobiblog/28730191

বাঙাল গরব ৩ : বাঙালিই থামিয়ে দিয়েছিল আলেকজান্ডারকে

অচেনা বাঙালি
০৩ রা ডিসেম্বর, ২০০৭ সকাল ১১:১০

একটা কল্প কাহিনী লেখা যাক।

আজ থেকে দুই হাজার তিনশত তিপ্পান্ন বছর আগের এক রোদ্রজ্জল ঝলমলে সকালে জনা বিশেক যুবক ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যাচ্ছে উত্তর পূর্ব দিকে। এই ঘোড় সওয়ার দলের নেতা পদ্মানন্দ। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়স, কিন্তু এরই মধ্যে দেশের মানুষের কাছে তার সাহসিকতা, ও বীরত্বের কাহিনী কিংবদন্তীর রূপ পেয়েছে। অশ্ব চালনা, মল্লযুদ্ধ থেকে শুরু করে মহামত্যের রাজশক্তির সাথে লড়াই, সব কিছুতেই সে অপরাজেয়। পদ্মানন্দ ক্ষৌরকার পিতার সন্তান। তার সতীর্থরাও কামার, জেলে বা কৃষকের ঘরের। তাদের সবার বাড়ি শিবপুর (বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলায়) ও তার আশে পাশের গ্রামে। তাদের পথে নামা, পরাধীন দেশ মাতার দাসত্বের শৃংখল ভাংগার লক্ষ্যে।

বহিরাগত আর্যশক্তি প্রায় সমগ্র ভারত পদানত করে ফেললেও, এই নদ নদী গাছ লতা পাতায় ভরা সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামলা মাটির সন্তানেরা বহুকাল ব্যর্থ করে দিয়েছিল তাদের আক্রমন। কিন্তু একসময় পরাস্ত হতে হয় তাদের। এরপর শুরু কয়েক শতাব্দীর লাঞ্ছনার অমানিশা। বিজয়ী আর্য শক্তি দেশের সব মানুষকে দাসে পরিণত করে, বেধে দেয় তাদের জন্য নীচু বর্ণ ও পেশা।

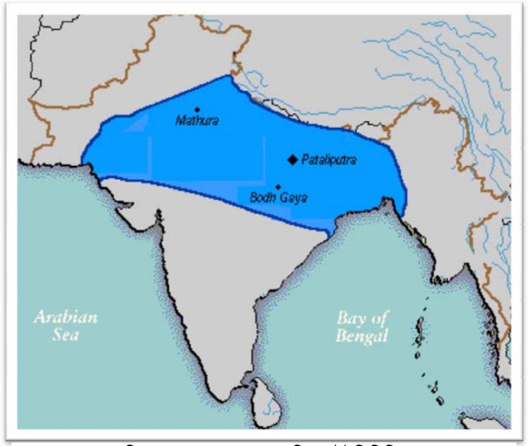

ছবি : নন্দ সাম্রাজ্যের মানচিত্র (উইকিপিডিয়া

এ অভিযাত্রায় পদ্মানন্দ ও তার দল গোপনে সারা দেশ থেকে স্বাধীণতার যোদ্ধা সংগ্রহ করছে। এ পর্যন্ত যে জায়গায় গিয়েছে সবখানেই অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। হাজার হাজার অকুতোভয় যুবক এক কথায়ই দলে যোগ দিয়েছে।

এভাবে কিছুদিনের মধ্যে সারাদেশ থেকে নিবেদিত প্রাণ, অমিত তেজী, সাহসী লোক নিয়ে এক বিদ্রোহি বাহিনী গঠিত হয়ে যায়।

তারপরের ঘটনা এক অভূতপূর্ব বিজয়ের কাহিনী। পদ্মানন্দের নেতৃত্বে বিদ্রোহি বাহিনী দখলদার সৈন্যের উপর ঝাপিয়ে পরে। বছর খানেকের মধ্যে প্রায় সমগ্র দেশ থেকে বিদেশি শক্তি পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হয়। দেশের মানুষের সমর্থন ও অকুতোভয় অমিততেজী যোদ্ধা বাহিনী নিয়ে পদ্মানন্দ এগিয়ে যায় রাজ শক্তির শেষ ক্ষমতা কেন্দ্র পুন্ড্র নগরে আঘাত হানতে।

রাজ শক্তির সব প্রতিরোধ তাসের ঘরের মত উড়িয়ে দিয়ে বিজয়ী বীর পদ্মানন্দ তরুণ রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসেন। স্বাধীন দেশের নাম হল গঙ্গাঋদ্ধি এবং পদ্মানন্দের বাড়ির কাছের নগর গাঙ্গে হল রাজধানী। বর্ণ প্রথা বিলোপ করা হল।

সেই সাথে দেশের মানুষ ফিরে পেল স্বীয় যোগ্যতা অনুসারে সকল কর্মের অধিকার। দূর হয় কয়েক শতাব্দির দাসত্বের অমানিশার অন্ধকার।

পরাজিত শক্তি পাটলিপুত্র (বর্তমান বিহার অঞ্চলে অবস্থিত) থেকে বার কয়েক আক্রমন করে ব্যর্থ হয়ে কলিঙ্গ সহ কয়েকটি আর্য রাজ্যের সাথে জোট করে গঙ্গাঋদ্ধি কে একযোগে আক্রমন করে। দেশের সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে পদ্মানন্দের কাছে আর্য রাজ্য সমূহের সম্মিলিত জোট শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়।

এরপর পদ্মানন্দ জোটবদ্ধ আক্রমনকারী রাজ্যসমূহ দখল করে স্বীয় রাজ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেন। পদ্মানন্দ ও তার পুত্র ধনানন্দ অপ্রতিরোধ্য অপরাজেয় এক বিশাল সেন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। বাইরের কোন শক্তির কাছে যে সেন্যবাহিনী কোনদিন পরাজিত হয় নাই। বাঙালি মায়ের সন্তান নাপিত পুত্র পদ্মানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাঋদ্ধি হয়ে উঠে প্রভূত ধন সম্পদে পরিপূর্ণ, পৃথিবীর সর্ববৃহত ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর অধিকারি এক বিশাল পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য।

ধনানন্দের রাজত্বকালে দিগ্বিজয়ি গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার সুদূর গ্রিস থেকে একের পর এক রাজ্য জয় করে ইরান আফগানিস্তান হয়ে ভারতের পাঞ্জাবে পৌছে যায়। সুদর্শন তরুণ সম্রাটের চোখে সারা পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালি সেনাবাহিনীর অধিকারি তিনি। বিখ্যাত ইরান সম্রাট দারায়ুস থেকে শুরু করে উত্তর পশ্চিম ভারতের পারক্রমশালি রাজা পুরু পর্যন্ত কেউ তার সামনে দাড়াতে পারে নাই। এখন তার সামনে মাত্র একটা বাধা, বিপাশা নদীর ওপারের রাজ্য। ভারতের মূল ভুখন্ড। এটুকু করতলগত হলেই সমগ্র ভারত তার দখল হয়ে গেল। যে স্বপ্ন নিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন গ্রিক রাষ্ট্র মেসিডোনিয়া থেকে, তা পরিপূর্ণতা পাবে।

এদিকে ধনানন্দের সেনাবাহিনী আলেকজান্ডারের বাহিনী কে প্রতিহত করতে বিপাশার এ পাড়ে সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দুই সৈন্য বাহিনী বিপাশা নদীর দুই পাড়ে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষামান। নদী পার হওয়ার পূর্বে অপর পক্ষের খবর নিতে চাইলেন আলেকজান্ডার।

বিজিত স্থানীয় ছোট ছোট ভূস্বামীরা আলেকজান্ডারকে জানাল অপর পাড়ের দেশটির ঐশ্বর্যের কথা, অপরাজেয় সৈন্যবাহিনীর কথা।

- দুই লক্ষ সৈন্যের বিশাল এক অপরাজেয় পাদাতিক বাহিনী।

সম্রাটকে একটু চিন্তিত মনে হলো।

- বিশ হাজার সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী। দুই হাজার রথ।

একটু যেন দমে গেলেন গ্রিক বীর, 'বলো কি?'

'আরো আছে প্রভু'।

- কমপক্ষে তিন হাজার হাতির গজ বাহিনী।

'তিন হাজার হাতি!', যেন হাহাকার করে উঠলেন প্রায় সারা পৃথিবী তছনছ করা মেসিডোনিয়ার বীর।

- জ্বি হুজুর কমপক্ষে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সম্রাট। তার কল্পনাতেও ছিলনা ভারতে এত বড় শক্তিশালী সম্রাজ্য আছে। সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিতভাবে সমূলে ধ্বংস হওয়া, আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়াও তার মত দ্বিগ্বিজয়ী বীরের জন্য অপমানজনক। এরপর পৃথিবী বিখ্যাত এ অসীম সাহসী বীর করণীয় আলোচনার জন্য নিজের সেনাবাহিনীর সাথে পরামর্শে বসলেন। বিচক্ষণ সেনাপতি সৈন্যদের পক্ষ হয়ে জানাল সৈন্যরা কেউ বিপাশা পার হয়ে নিজের জীবন দিয়ে আসতে রাজী নয়। অসহায় সম্রাটের সামনে

এসে শত শত যুদ্ধ বিজয়ের পরিকল্পনাকারী, পৃথিবী শ্রেষ্ঠ দক্ষ সেনাপতির স্পষ্ট উচ্চারণ,

- হুজুর, এটা হবে নিছক আত্মহত্যা আর কিছু নয়।

ফলে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর অপর পাড়েই আলেকজান্ডারের বিজয় রথ থেমে যায়। সম্পূর্ণ ভারত জয়ের স্বপ্ন তার স্বপ্নই রয়ে গেল। এরপর গ্রিক বাহিনী মেসিডোনিয়ার দিকে ফিরতি যাত্রা করে।

আমার কল্প কাহিনী এখানেই শেষ হলো।

****

এক বেল্লিক আমার কয়েক দিন আগের এক পোস্টে এই পোস্টের শিরোনাম দেখেই হাসতে হাসতে কাহিল। সুতরাং এই পোস্টের কাহিনীও অনেকের কাছেই বাস্তব বর্জিত অলীক রূপকথা মনে হতেই পারে। মনে হতে পারে ইমোশনাল বাঙাল গদগদে জাতীয়তার আবেগে তথ্য ও সত্য বিবর্জিত রূপকথা বানিয়েছে।

দেখা যাক তাহলে ঐতিহাসিকগন কি বলে, আর বাঙালি জাতির পূর্ব পুরুষের দ্বার গঠিত সাম্রাজ্য সম্পর্কে কি কি তথ্য পাওয়া যায়। এই ঐতিহাসিকগন বেশিরভাগই বিদেশি।

' গঙ্গারিডাই রাজ্যের বিশাল হস্তী- বাহিনী ছিল। এই বাহিনীর জন্যই এ রাজ্য কখনই বিদেশি রাজ্যের কাছে পরাজিত হয় নাই। অন্য রাজ্যগুলি হস্তী- বাহিনীর সংখ্যা এবং শক্তি নিয়া আতংকগ্রস্ত থাকিত' - মেগাস্থিনিস (৩৫০ খ্রীস্টপূর্ব- ২৯০ খ্রীস্টপূর্ব)

মেগাস্থিনিস আলেকজান্ডারের সেনাপতি ও বন্ধু সেলুকাসের রাজত্বকালে গ্রিক দূত হিসাবে ভারতে এসেছিল।

' ভারতের সমূদয় জাতির মধ্যে গঙ্গারিডাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গঙ্গারিডাই রাজার সুসজ্জিত ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত চার হাজার হস্তী- বাহিনীর কথা জানিতে পারিয়া আলেকজান্ডার তাহার বিরূদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন না' - ডিওডোরাস (৯০ খ্রীস্টপূর্ব- ৩০ খ্রীস্টপূর্ব)

নন্দ রাজাদের প্রকান্ড সেনাবাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে ভারতীয় ও ধ্রুপদী ইউরোপীয় রচনাগুলির উল্লেখে প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ডিওডোরাস ও ক্যুইন্টাস কার্টিয়াস রুফাস উভয়েই উল্লেখ করেছেন নন্দরাজের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে। যথা,

পদাতিক সৈন্য ২ লক্ষ, অশ্বারোহী সৈন্য ২০ হাজার, রথ ২ হাজার এবং তিন থেকে চার হাজার হাতি। কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় ও সিংহলী পুথিতে প্রথম নন্দ রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে উগ্রসেন বলে, অর্থ এমন এক ব্যক্তি যাঁর ' প্রকান্ড ও পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী' আছে।

এই পর্যন্ত আলোচনায় গঙ্গারিডাই নামের পরাক্রান্ত রাজ্যের প্রমান পাওয়া গেল। যেটা ছিল পাঞ্জাব পর্যন্ত সমূদয় গঙ্গা অববাহিকায় নিয়ে গঠিত ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালি রাজ্য। এখন প্রশ্ন, এ নিয়ে এত আলোচনার কি আছে আর এর সাথে বাঙালির সম্পর্কই বা কি? আবার তাহলে তাকাই বিশ্ব বরেন্য ধ্রুপদী ঐতিহাসিকদের রচনায়।

' গঙ্গা নদী উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত এবং গঙ্গারিডাই রাজ্যের পূর্ব সীমানায় সমূদ্রে মিলিত হইয়াছে। ' - মেগাস্থিনিস

' গঙ্গা নদীর মোহনায় সমূদয় এলাকা জুড়িয়া গঙ্গারিডাই রাজ্য' - টলেমি

গঙ্গারিডাই রাজ্যের ভিতর দিয়া গঙ্গা নদীর শেষ অংশ প্রবাহিত হইয়াছে- প্লিনি

টলেমি (২য় খ্রীস্টাব্দ) গন্ধারিডাই- এর অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যৈ, গঙ্গার পাঁচটি মুখ সংলগ্ন প্রায় সমূদয় এলাক গঙ্গারিডাইগণ দখল করে রেখেছিল, গাঙ্গে নগর ছিল এর রাজধানী। তার বর্নণাকৃত চারটি দ্রাঘিমা ডিগ্রি সমূদ্র উপকূলের সর্ব পশ্চিম থেকে সর্ব পূর্ব নদীমুখ পর্যন্ত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করছে। কার্যতঃ এর অর্থ হলো গন্ধারিডাই বঙ্গপোসাগরের উপকূলবর্তী গঙ্গার সর্বপশ্চিম এবং সর্বপূর্ব নদীমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো যে, ভাগীরথির (তমলুক- রৈ নিকটে) এবং পদ্মার (চট্টগ্রামের নিকটে) নদীমুখের দ্রাঘিমা রৈখার পার্থক্য ৩৫ ডিগ্রির সামান্য কিছু বেশি। তাই টলেমির তথ্যানুযায়ী গন্ধারিডাই- কে শনাক্ত করা যায় বর্তমান ভারতের পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশে গঙ্গার প্রধান দুটি শাখার মধ্যবর্তী অঞ্চলটিতে।

' গঙ্গারিডাই রাজ্য ৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ভারতীয় উপমাহাদেশের বাঙলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস তার ইন্ডিকা গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেছেন।

ধ্রুপদী গ্রিক এবং ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী আলেকজান্ডার দি গ্রেট বাংলায় অবস্থিত এ সম্রাজ্যের কাউন্টার এটাকের আশংকায় ভারতে তার বাহিনী উইথড্র করতে বাধ্য হন।

গ্রিক ঐতিহাসিক দলিল এবং ভৌগলিক বিবরণ থেকে অনুমান করা হয় যে চুয়াডাঙ্গা জেলাটি ছিল গঙ্গারিডাই রাজ্যের একটি অংশ এবং গাঙ্গে শহরটির অবস্থান ছিল এ অঞ্চলে। ' - উইকিপিডিয়া

একজন গ্রিক নাবিক তাঁর Periplous tes Erythras Thalasses (Periplus Maris Erythraei) গ্রন্থে বঙ্গপসাগর সংলগ্ন উড়িষ্যা উপকূলের পূর্বে অবস্থিত গাঙ্গে দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। নদী তীরে নদীর নামে গাঙ্গে ছিল একটি বানিজ্য শহর। এটা স্পষ্ট যে টলেমির ' গঙ্গারিডাই' এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থের লেখকের ' গাঙ্গে দেশে' বঙ্গপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একই এলাকাকে ইঙ্গিত করছে। কালিদাশের রঘুবংশে বঙ্গের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাও অভিন্ন অর্থ বহন করে।

গঙ্গারিডাই শব্দের উৎপত্তি গঙ্গারিড থেকে। ধারণা করা হয় গঙ্গারিড ভারতের গঙ্গাহৃদ শব্দের গ্রিক রূপ। এর অর্থ যে ভূমির বক্ষে গঙ্গা প্রবাহিত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন-

' গঙ্গারিডাই- রা যে গাঙ্গেয় প্রদেশের লোক এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কারণ গ্রিক লাতিন লেখকরা এ সম্বন্ধে একমত্র দিয়োদারাস- কার্টিয়াস- প্লুতার্ক- সলিনাস- প্লিনি- টলেমি- স্ট্যাবো প্রভৃতি লেখকদের প্রাসঙ্গিক মতামতের তুলানামূলক বিস্তৃত আলোচনা করিয়া হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে গঙ্গারিডাই বা গঙ্গারাষ্ট্র গঙ্গা- ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল। '

এইবার রূপকথার নাপিত পুত্র রাজা সম্পর্কে ইতিহাস কি বলে দেখা যাক।

ধ্রুপদী গ্রিক ও ল্যাটিন বর্ণনায় রাজার নাম আগ্রাম্মেস। তিনি ছিলেন নীচকূলোদ্ভব নাপিতের পুত্র। হিন্দু পুরাণে তিনি মহাপদ্মনন্দন এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র মাহাবোধিবংশে উগ্রসেন। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব নামক জৈন গ্রন্থেও মহাপদ্মনন্দকে বলা হয়েছে নাপিত কুমার। পুরাণে বলা হয়েছে শূদ্রোগর্ভোদ্ভব। আরও বলা হয়েছে, ' সর্বক্ষত্রান্তক নৃপঃ' অর্থাৎ সকল ক্ষত্রিয়কে নিধন করে সিংহাসনে বসেছিল।

সুতরাং, ' একমাত্র বাঙালি জাতির পূর্ব পুরুষই থামিয়ে দিয়াছিল প্রায় সারা পৃথিবী জয় করা, পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ সেনাবাহিনীর অধিকারি, বিশ্বজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডার ও তার অসীম পরাক্রমশালি গ্রিক সেনাবাহিনীর বিজয় রথ' । আর বাঙালি হিসাবে এ কথা গর্ব করে বলতে আমি বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত বা লজ্জিত নই।

আমি এ লেখাটা শেষ করতে চাই এক গর্বিত বাঙালি ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এর কথা দিয়ে। তিনি বলেছেন-

' আজ এ- তথ্য সুবিদিত যে, ঔগ্রসৈন্যের সমবেত প্রাচ্য- গঙ্গারাষ্ট্রের সুবৃহৎ সৈন্য এবং তাহার প্রভূত ধনরত্ন পরিপূর্ন রাজকোষের সংবাদ আলেকজান্দারের শিবিরে পৌছিয়াছিল এবং তিনি যে বিপাশা পার হইয়া পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হইয়া ব্যাবিলনে ফিরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহার মূলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই সংবাদগত কারণটিও অগ্রাহ্য করিবার মত নয়। '

\- -

একটা কথা:

শিরোণামের বাঙাল বলতে শুধুমাত্র বাংলাদেশের বাঙালিদের বোঝানো হয় নাই। বরং বৃহত্তর বাঙালি জাতির পূর্বপুরুষকে বুঝানো হয়েছে।

তথ্য সূত্র:

বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) - নীহাররঞ্জন রায় | দে' জ পাবলিশিং - কলিকাতা

ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ভারত) - গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ লেভিন | প্রগতি প্রকাশন - মস্কো

ইন্ডিকা - মেগাস্থিনিস

বাংলাপিডিয়া

উইকিপিডিয়া

অনুপ্রেরণা : মুক্ত মনার লেখক ফতে মোল্লার বিদ্রোহি বঙ্গ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/ablblog/28749107

একাকিত্ব??????

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব
০৮ ই অক্টোবর, ২০০৭ দুপুর ১:২৯

শরতের ক্ষয়ে যাওয়া মায়াবী চাঁদ. . . অভিভূত। অদ্ভুত সুন্দর। মধ্য গগনের চাঁদ. . রূপালী আলো. . . মায়াময় চারিদিক. . এতোটা স্নিগ্ধতা দিবসে কোথায় থাকে? নাকি নির্জনতার জন্য এমন মনে হচ্ছে? . . চারিদিকে সুনসান. . . . বারান্দায় পায়চারি করতে ভালোই লাগে। আরো একটা কারনে বারান্দায় . . সিগারেট। ঘড়ে বসে. . . উফ্ চারিদিকে বিড়ির গন্ধ. . . বিরক্তিকর।

চাঁদটার কি অনেক কষ্ট? ক্যামন যেন একা একা সমস্ত রাত্রিই ঘুরে বেড়ায়। এটা কি কস্টের? লিজার শেষ কথাটা মাথার মধ্যে সেই তখন থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে। মুঠোফোনে মধ্যরাতের কথোপকথোনের এক পর্যায়ে ও বলেছিলো "তুমি কি জানো যে তুমি কতটা একা?" আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে মাথার মধ্যে ঘুরতেই আছে। সত্যিইতো।

দিবসের ব্যাস্ততা শেষে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যখন বাসায় ঢুকি. . . সত্যি একধরনের একাকিত্বে পেয়ে বসে। বের হতে পারিনা কোনভাবেই। সময় পার হয়ে যায় দেখতে দেখতে। আমি শুধু আমার জায়গায় স্থির। ইদানিং আরো উপসর্গ লক্ষনীয়ভাবে যোগ দিয়েছে - কনফিউশন। পেয়ে বসছে আমাকে। কোন ভাবেই কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারিনা সহজেই। কি করাইবা উচিত? সিদ্ধান্তহীনতায় কুড়ে কুড়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে জীবন. . . সমাধান? অসম্ভব

জীবনতো কেটে যাচ্ছে। সময়ও বসে নেই। স্ট্যাগ হয়ে থাকা সময়গুলো কি আসলেই বসে নেই? আচ্ছা, আমরা সব্বাই কি একা নই? চারিপাশের এত্ত এত্ত মানুষ তাও আমরা কত্ত একা। ভাবনার জাল ছিন্ন হয় মুয়াজ্জিনের আহ্বানে "আচ্ছালাতু খাইরুম্মিনানাউম"। দীর্ঘ রজনীর অবসান। ব্যাস্ততামুখর আরো একটি দিনের হাতছানি। কর্ম চাঞ্চল্যের সুধায় বুদ হয়ে থাকা।

জোনাক জ্বেলে লক্ষ কোটি
রাতের কাছে চাদের চিঠি
নীল জোছনায় তুমি কোথায়

মন চায় মন শুধু যে তোমায়
দিন যায় দিন তোমারি আশায়
নীল জোছনায় তুমি কোথায়?

রাত নির্ঘুম লাগেনা ভালো
মন দুয়ারে জানালা খোল
নীল জোছনায় তুমি কোথায়

http://www.somewhereinblog.net/blog/prottublog/28736219

মুক্তি

আউলা
২৫ শে ডিসেম্বর, ২০০৭ রাত ১:১৪

এখন আমি মেডিকেলের মর্গে পড়ে থাকা একটা মৃতদেহ। আজ বিকাল বেলা আমি আত্মহত্যা করেছি। জানি আত্মহত্যা মহাপাপ, তারপরও করেছি। আমার জীবনটা কেন এমন হল? আমার কি খুব বেশি চাওয়া ছিল? খুব কি আকাঙ্খা ছিল? অথচ আমার পাওয়া ছিল খুবই সামান্য।

আমার জীবনটা আমার জন্ম থেকে শুরু হয়নি তার আগের থেকে আমার শিকড়, আমার বাবা থেকে।

আমার বাবা গ্রামের সাধারন ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে রাজনীতি জড়িয়ে ক্ষমতা পাওয়ার লালসায় খুনের সাথে জড়িত হয়েছিলেন। তারপর তার পড়াশুনা আর এগোয় নি। আমার বাবা গ্রামে ফিরে যান, মাকে বিয়ে করেন কিন্তু রাজনীতিটা উনি ছাড়তে পারেন নি। একসময় দেশে যখন যৌথবাহিনী খুব ধরপাকড় শুরু করলো, তখন আমরা স্বপরিবার ঢাকাতে চলে এলাম। এখানে আমার বাবা পুরোপুরি বেকার, গ্রাম থেকে খুব সামান্যই টাকাপয়সা আমাদের সংসার চালানোর জন্য আনা হতো। ঢাকাতে জীবনযাত্রার এই লাগামহীন চালের সাথে খাপ খাওয়ানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া আমাদের কিছু সচ্ছল আত্নীয় স্বজন আমাদের কিছু সাহায্য করতো। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াটা খুবই অপমাণজনক লাগতো আমার কাছে।

তারপরও খেয়ে না খেয়ে চলে যাচ্ছিল আমার এই জীবন। খুব স্বপ্ন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। কিন্তু যখন ভর্তি ফরম কিনব তখন আমার বাবার হাত একেবারে শূন্য। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থাই তখন ঠিকমত হচ্ছিল না। নিজেকে বুঝ দিলাম আমি খুব মেধাবী না, চান্স নাও পেতে পারি। ফরম কিনলে শুধু শুধু খরচ হত। এরপর যখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম ছাড়লো, আমি বাবার কাছে টাকা চাইলে বাবা দিতে পারল কিন্তু আমার বখে যাওয়া ভাই ওটা কেড়ে নিয়ে গেল।

সাইন্স পড়ার অনেক খরচ। আমি সাইন্স পড়লে আমার ভাইয়ের পড়ার খরচ জুটবে না বলে আমি সাইন্স পড়িনি। মায়ের ইচ্ছা ছিল তার ছেলেকে ডাক্তার বানাবে, আমি তো মেয়ে!

ভাইটা আমার বখে গেছে, আমার টাকাটাও যখন আজকে নিয়ে গেল, তখন আমার মনে হচ্ছিল এত ছোট হয়ে কোন উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক সহজ। তাই গলায় ওড়না পেচিয়ে নিজেকে মুক্ত করলাম।

আমি কি মুক্ত করতে পেরেছি নিজেকে? নাকি নতুন বেড়াজালে আটকে ফেললাম? আমার মৃত্যুটা আমার জন্যই স্বাভাবিক হলো না, আমার আত্মাটাও আল্লাহ্' র কাছে মাফ পাবে না।

আমার জীবনের প্রথম অধ্যায় এখানেই শেষ হল আর শুরু হল দ্বিতীয় অধ্যায় যা আরো ভয়ংকর।

http://www.somewhereinblog.net/blog/aulablog/28753692

আমি ছাই আগেই ভালো ছিলাম . . .

অলৌকিক হাসান
১৯ শে ডিসেম্বর, ২০০৭ রাত ১০: ৫৪

তারা খিলখিল করে হাসে
ভুরু নাচিয়ে কলকল করে
ঢলঢল করে ঢলে পড়ে
তারপরও তাদের ছুঁতে পারি না
ধ্যাত্তরি, আমি ছাই আগেই ভালো ছিলাম . . .

আমি লেস্টারস্কয়ারের সেক্সশপ দেখি
অজানা ভাষায় হেঁটে চলা নিতম্ব
আর তাদের স্তনের গিরিখাত দেখি
দেখি আর চোখ ফিরিয়ে নিই
ধ্যাত্তরি, আমি ছাই আগেই ভালো ছিলাম . . .

থিয়েটারের মেয়েটি বলত, তুমি নচ্ছার, দুষ্টু
শুধু আমার ঠোঁটই চোষো, জানো না
আমার বুকে তুমি হারিয়ে যেতে পারতে
আমি হাসি, আর তাকিয়ে থাকি
হায়, আমি তখন বেশ ভালোই ছিলাম . . .

বিদেশ বিভুঁইয়ে বিভ্রান্ত এখন
খুঁজে ফিরি, খালি খুঁজে ফিরি
তুমি কানতা, আমি তখন হাসতাম
হাসতাম আর এখনো হাসি, আর ভাবি
ধ্যাত্তরি, আমি ছাই আগেই ভালো ছিলাম . . .

তুমি ফোন এখনো করলে না, জানি
তুমি ব্যস্ত তাকে নিয়ে, ওরও
আজকে বিশেষ দিন, পারো না তা এড়াতে
তুমি চাও নিশ্চিত জীবন, আর আমি.

ফাজিল একটা, তাই, ধ্যাত্তরি
আমি ছাই আগেই ভালো ছিলাম . . .

শোনো বাল, তোমারে আমি ভালোবাসি
হা হা হা হা হা হা হা (মাতালের হাসি)
আমার ওরে চোদার টাইম নাই
সেইটা তুমিও জানো, জানো বলেই
তুমি আপোষ করো, আর আমি
ধ্যাত্তরি, আমি ছাই আগেই ভালো ছিলাম . . .

তুমি তো আমাকে ফোন করবেই
আজ নয়তো কাল, নয় পরশু, নয় তরশু
তুমি থাকতে পারবে না আমাকে ছাড়া
পারবে না তুমি থাকতে একদমই
বললাম তো, আমাকে ছেড়ে।

আমি জানি তুমি সংসার করবে
কিন্তু ভালো তো বাসবে শুধু আমাকে
হা হা হা হা হা হা হা হা (মাতালের হাসি)
আমি তাই ভেবে এখন খুব ভালো আছি।
আমি ছাই আগামীতেও ভালো থাকব . . .

কারণ আমি জানি যে
তুমি নিশ্চিত জানো
আমি ছাড়া আর কেউ
তোমাকে এতো ভালোবাসেনি।
ভালোবাসবেও না. . . .

এইটারে কেউ কবিতা ভাবলে নিজ দায়িত্বে ভাববেন
১ সেপ্টেম্বর ২০০৭
http://www.somewhereinblog.net/blog/kamsblog/28752739

পথ আগলে থাকা কোন এক নারীকে (সূফীর কবিতাঞ্জাল)

সূফী
১৭ ই অক্টোবর, ২০০৭ দুপুর ১২: ৪০

আমাকে ক্লান্ত করে দিনলিপির পাতা,
দীর্ঘশ্বাসের ধূয়াশা হৃদপিন্ডে হামাগুড়ি দেয়,
ছুঁয়ে দেখা দুরত্বে আমি, আর মনিটরে মুখোমুখি অপরিচিত মৃত চোখ ।
এই সব ফালতু নির্জীব দুপুর, মেছোহাটায় দরাদরি;
ঘুম ভাঙলেই খবরের কাগজ, আঙুল আর দূ: স্বপ্নে মাখামাখি
ক্যামিকেলে বাচিঁয়ে রাখা তোড়া তোড়া বৃন্তহীন গোলাপের অশ্লীলতা, ফুটপাত জুড়ে . . .
ক্রমাগত বড়ো হয়ে ওঠার গন্তব্যহীন যাত্রা;
আরো যতো ইতংবিতং, ক্রমান্বয়ে ভুল পাঠ।

গেরুয়া নয়, বরং বিষন্নতার ধূসর আচ্ছাদন
আমাকে মুড়ে রেখেছে আজীবন;
চৌকাঠ ডিঙোলেই অন্য পৃথিবী;
দীর্ঘশ্বাস বদলে নিয়ে অনায়াসে
পেয়ে যাবো দীর্ঘসন্যাস;
গুহাশ্রয়ী রক্তে বয়ে আনা আদিম বিষ্ময়
এক ঝাক প্রজাপতি আলতো ছুয়েঁ দিলে
হাত ভরে উঠবে ডানারঙ আল্পনায়।

তবু আর চৌকাঠ ডিঙানো হলো কই?
কই হলো পঞ্চমীর মেটে জোৎস্নায় ঘর ছাড়া?
কই হলো সব কিছু পাশে ঠেলে বলে ওঠা- দূর ছাই !

আমাকে আটকে রাখেনি জীবনের ধারা,
আমাকে আটকে রাখেনি নির্জীব চৌকাঠ;
আমাকে শুধু আটকে দিলি তুই ।

জীবনের চেয়ে বিশাল এই বাধা ডিঙিয়ে
কিভাবে আমি তবে আমাকে ছুঁই ?

১৭ অক্টোবর, ২০০৭
নিকেতন, ঢাকা ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/shufiblog/28737941

বিক্ষত আমি আর আমার নিশীকাব্য- - - - -

বিষাক্ত মানুষ
২৭ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ৮: ৪৫

যেদিন আকাশটাকে নতুন করে দেখতে গিয়েছিলাম
ঠিক সেদিন থেকেই শুরু এই ছুটে চলার
ঘাড়ের উপর সেই পুরোনো হরিনীর নিঃশ্বাস

ছুটতে ছুটতে আজ
একই বৃত্তে. . . . . ক্লান্ত
তবুও একদন্ড জিরোতে দেয় না
আমার হরিনী

নিশীকাব্যের করুণ চাহনি
বার বার দেখেও না দেখার ভান করি
এই নরম মাটিতে
অনেক উঁচু একটা মিনার গড়ার স্বপ্নটা
আজও আকাশটাকে দেখতে দেয় নি
পুরোটা চোখ দিয়ে
মাটিতে মিশে যাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত
বিক্ষত যেন আমি আর আমার নিশীকাব্য

হরিনী. . . একটু থাম , একটিবার দেখি
তারপর না হয়
সেই পুরোনো ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে
দক্ষিনে হাঁটা দেবো সূর্যাস্তের ডাকে

সেই মধ্যাহ্ন থেকে যে সূর্য
. . . আমার প্রতিক্ষায়
. . . আমার আকাশে

http://www.somewhereinblog.net/blog/bishaktomanushblog/28774623

মধ্যরাত, এখন আমি

মৃন্ময় আহমেদ
২৮ শে জানুয়ারি, ২০০৮ সন্ধ্যা ৬: ২৫

বুকের মাঝে কান্না জমে আছে
গন্তব্য তাদের দু' চোখ আমার
নিউরণে সুঁচ ফোটানোর ব্যথা
শূন্য হৃদয়ের নিঃশব্দ চিৎকার!

হৃদয় হরণের স্পর্ধা দেখাইনি
হৃদয় দানের পথটা ধরে চলি,
বিনিময়ের চাহিদায় নিমজ্জিত
মন আমার হয়েছে ব্যথা- ঝুলি!

১৬ জানুয়ারি ২০০৮ @০০: ১৭
http://www.somewhereinblog.net/blog/mreenmoyblog/28765011

এই আমি

তারার হাসি
১৬ ই মার্চ, ২০০৮ রাত ১: ১৮

দাঁড়াবে ?
একটু দাঁড়াও, আমার জন্য।
বলবে ?
কিছু বল, আমাকে ।
সময় ?
একেবারেই কি নেই, আমাদের জন্য !
যাবে ?
এখনতো অবেলা, আমাকেও সাথে নাও।
ভুলবে ?
ভুলে যাও- আমাদের ভালবাসা ।
পথ?
পথ আলাদা, তোমার আমার।
পারবে ?
পোড়াতে পারবে না; আমার শুকনো পাতাগুলি ।
জানো ?
জানার তো কথা না , এই আমি কবেই মরে বেঁচে আছি ! ! !

http://www.somewhereinblog.net/blog/tararhasiblog/28779499

ট্যাক্সি টু দ্য ডার্ক সাইড অভ বাংলাদেশ

জ্বীনের বাদশা
০৪ ঠা মার্চ, ২০০৮ সকাল ১১:০৩

["হোয়াই ডেমোক্রেসী" নামে দশটি ডকুমেন্টারী ফিল্মের একটি সিরিজ তৈরী হয়েছে, বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্রের নামে কিসের মচ্ছব চলছে সেটা জানার জন্য এই ছবিগুলো দেখা জরুরী]

****

১.
আজ সকালের পত্রিকায় দেখলাম আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিকিৎসার জন্য; তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন "দোয়া করবেন যাতে ফিরে আসতে পারি।"
এজায়গাটায় দৃষ্টি আটকে গেল! তার আগেই অবশ্য দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল আবদুল জলিলের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে।

দুটো প্রশ্ন জাগছে, আবদুল জলিল ভিআইপি প্রিজনার। তাঁর চেহারার এই দশা হবে কেন? আরেকটা প্রশ্ন হলো, আপনি কি প্রায়ই শোনেন, বিশেষ করে যখন কোন রাজনীতিবিদ বিদেশে যান চিকিৎসার জন্য তখন তিনি দোয়া চাচ্ছেন যাতে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারেন?

দুটো প্রশ্নের উত্তরই একই সূত্রে গাঁথা, আপনি মানুন আর নাই মানুন, আমি নিশ্চিত এই লোকটার উপর জেরা করার নামে ভয়ানক অত্যাচার চালানো হয়েছে। একটা মানুষ কতটা অত্যাচারের শিকার হলে বেঁচে থাকবেন কি থাকবেননা সেটা নিয়ে মানসিকভাবে এত দূর্বল হয়ে পড়েন -- সেবিষয়ে ভাবার দরকার আছে।

কয়েকদিন আগে একটি ছবি বেরিয়েছিল পত্রিকাগুলোতে, যেখানে দেখা গেল ডোরাকাটা শার্ট পরা একটি ছেলেকে সিলিংয়ের হুকের সাথে দড়িতে ঝুলিয়ে পেটানো হচ্ছে। প্রথমে সম্ভবতঃ বিএনপিপন্থী কোন এক পত্রিকা সেটাকে তারেক রহমানের ছবি বলে চালিয়ে দেয়। পরে অন্য পত্রিকাগুলো সেটা তারেকের ছবিনা, বরং কোন এক সাধারণ ছেলের ছবি বলে দাবী করে, তারেকের ছবি বলে চালানোর অপরাধে পূর্বোক্ত পত্রিকাটিকে নিয়ে উপহাস করে। সেই ছবি নিয়ে ব্লগে ব্লগেও উপহাস হয়।

পরিহাসের ব্যাপার হলো, সেই ছেলেটার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে সে ব্যাপারটা সবার নজর এড়িয়ে যায়, এরকম অত্যাচারের দৃশ্য নিয়ে শুধু পলিটিক্সই হয়। ছেলেটার কথা কেউ ভাবেনা।

২.
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকান নেভীতে ইন্টেরোগেটর হিসেবে কাজ করতেন ফ্র্যাংক গিবনী। বর্তমান বুশ প্রশাসনের আফগানিস্তান/ইরানের উপর অন্যায় আক্রমণ এবং আল কায়েদা নিধনের নামে নির্বিচারে আরব তরুনদের উপর পাশবিক অত্যাচার, যেগুলো ঘটেছিল "ওয়ার এ্যাগেইন্স্ট টেরর" ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নানান বন্দীশালায়, সেগুলো দেখে ফ্র্যাংক হতভম্ব হয়ে যান। ষাট বছর আগে করা তাঁর নিজের কাজগুলোকে যথেষ্ট নিষ্ঠুর মনে হলেও সেখানেও অনেক নিয়ম মানা হতো, আর এখন কোন নিয়মই মানা হচ্ছেনা বন্দীদের জেরা করার ক্ষেত্রে। ফ্র্যাংকের ভ্রু কুঁচকায়, সাথে সাথে তাঁর ছেলেরও।

ফ্র্যাংকের ছেলে এ্যালেক্স, এলেক্স গিবনী। হ্যাঁ, এই এ্যালেক্স গিবনীই ২০০৭ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর সাড়াজাগানো এবং বুশ প্রশাসনের বারোটা বাজানো ছবি "ট্যাক্সি টু দ্য ডার্ক সাইড"। দেড় বছরের পরিশ্রমে আফগানিস্তান, ইরাক আর গুয়ান্তানামোর বন্দী, তাদের পরিবার, আমেরিকার সেনাবাহিনীর সদস্য,

কর্মকর্তা, এ্যাডভোকেট, প্রফেসর মিলিয়ে অন্ততঃ পঁচিশজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষন করেছেন বন্দী নির্যাতন সমস্যাকে।

গিবনী ছবিটির শুরু করেন আফগানিস্তানের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার দিলওয়ারের কাহিনী দিয়ে, একগ্রামে যাত্রীদের পোঁছে দিয়ে ফেরার পথে তিন আফগান মিলিশিয়া ধরে দিলওয়ারকে, তারপর তাকে ছেড়ে দেয় আমেরিকান সৈন্যদের কাছে, বাগরাম কারাগারে। যে দিলওয়ার কোনদিন বাইরে রাত কাটায়নি, পাঁচরাত সেই দিলওয়ারের উপর চলে অমানুষিক অত্যাচার; নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের ফলে পাঁচদিনের মাথায়ই মারা যায় দিলওয়ার। ডার্ক সাইডের সেই ট্যাক্সির হর্ন কি বেজেছিল? আমরা কি শুনেছিলাম? এ্যালেক্স গিবনী শুনেছিলেন, তিনি একে একে ইরাকের আবু গারিব জেল, গুয়ান্তানামো বে'র বন্দীশালা সবখানে ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত হন। বের করে আনেন মৌলিক কিছু তথ্য, সেনাবাহিনীর সদস্যদের মুখ থেকে। যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল, সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী বন্দীদের সাথে আচরণ সম্পর্কে জানলেও, এটা জানতেননা যে সেই দলিল ইরাক বা আফগানিস্তানে প্রযোজ্য কিনা।

আফগানিস্তানকে আর ইরাককে ব্যর্থ রাষ্ট্র ঘোষনা দিয়ে সরকারীভাবে তাঁদের মাঝে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করা হয়, তাদেরকে বলা হয় যেভাবেই হোক তথ্য বের করে আনতে হবে। তারা সেটাই করে, বন্দীদের কুকুরের খাঁচায় আটকে নির্যাতন করা হয়, দুহাতবেঁধে, বাঁধা দুহাতকে পেছনে নিয়ে দুপায়ের সাথে বেঁধে কালোকাপড়ে মুখ ঢেকে অত্যাচার করা হয়। দিনের পর দিন ঘুটঘুটে অন্ধকার ব্ল্যাকহোল (প্রফেসর আনোয়ার হোসেনের জবানবন্দী স্মর্তব্য) ধরনের ঘরে রাখা হয়, বলা হয় কেউ কোন কথা বললেই মেরে ফেলা হবে। আফগানিস্তানের বাগরামের বন্দী আরেক বৃটিশ নাগরিক মোয়াজ্জাম বেগ বলেন, তিনি দুজনের মৃত্যুর সাক্ষী, অন্যদের অত্যাচার করার সময় তাদের সেগুলো দেখানো হতো। মোয়াজ্জেমকে হাজারো নির্যাতন করেও যখন কিছু হলোনা, তখন তারা তাকে শোনায় একজন নারীকে নির্যাতনের অডিও রেকর্ড -- মোয়াজ্জেমের স্ত্রী আর একটি সন্তান ছিল। জেরার নামে পাপাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া হয়।

ছবির শেষভাগে মোয়াজ্জেম বেগের একটি কথা ভীষনভাবে নাড়া দেয়, মোয়াজ্জেম বলেন তাকে পেটাতে পেটাতে আমেরিকান সৈন্যরা বলত,
" তুমি টেররিস্ট হও আর নাই হও, আমরা তোমাকে এমন ধোলাই দেব যে বেঁচে এখান থেকে বের হতে পারলে তুমি টেররিস্ট হতে বাধ্য হবে।"

চিন্তা করা যায়?

৩.
এ্যালেক্স গিবনী সাহস দেখিয়েছেন, সামরিক সরকারের ভয় নয়, জনমতের মতো ভয়কে জয় করে উল্টো স্রোতে ভেসে তৈরী করেছেন "ট্যাক্সি ফ্রম দ্য ডার্ক সাইড", লক্ষ্য একটাই, সত্যকে বের করে আনা।

আমাদের দেশে কি আবদুল জলিলদের উপর অত্যাচার নিয়ে কোন ছবি তৈরী হবে? হবেনা। সে আশাও আমরা করিনা। একটা কলামও ছাপবেননা সম্পাদকেরা, আবার ছবি! শখ কত!! আমাদের তাসনিম খলিলের উপর নির্যাতন নিয়ে প্রতিবেদন করেছে বিদেশী মিডিয়া, আমরা চুপচাপ দেখেছি।

এজায়গাটাতেই বুশের দেশের কাছে আমরা হেরে যাই, সেদেশে সহজেই ছবি তৈরী হয়। শুধু তাইনা, এ্যালেক্স গিবনীর ছবিটি এবার সেরা ডকুমেন্টারী ফিল্মের ক্যাটেগরীতে অস্কার পুরস্কার জিতেছে। আমাদের দেশে এরকম কিছু তৈরী করতে গেলে র‍্যাবের প্যাঁদানীর চেয়ে ভাল কিছু আশা করা যায়না।

কি আর করা, অবশেষে মইন সাহেবের গুনকেত্তন করিয়া শেষ করিলাম।

http://www.somewhereinblog.net/blog/lubdhokblog/28776281

একটি মৃত্যু আর আমার যত আক্ষেপ

ডাক্তার আইজুদ্দিন
০৪ ঠা জুলাই, ২০০৭ দুপুর ১২: ০৯

আমার ভাই মারা গেচে। আমার ভাই সেই চব্বিশের টগবগে যুবক যে দাপিয়ে বেড়াতো সারা পাড়া আজ বহু ডাকে ফিরেও চায় না। তার ডাকে মহল্লায় যেই ঢেউ উঠতো আজ তাতে নেই জোয়ার ভাটার আনা গোনা। জীবনের জোয়ার ভাটার খেলায় সে পরাজিত।

তার পরাজয়ে বিউগল করুন সুরে বেজে উঠবেনা। কেউ দাগবেনা চব্বিশ টি কামানের গোলা। আমার ভাই কোন বীর সেনানি ছিলনা। আমার ভাই মারা যায়নি কোন মহত কারন।তার মৃত্যুটি ছিল তার জীবনের মতনই সাধারন। ফুলের কোন অভাব পড়বেনা বাজারে তার জন্য। কোটি কোটি সমর্থক বিষন্ন মনে ঘুরে বেড়াবে না। আমাদের বিষন্ন পরিবার কানবে, সময়ের প্রয়োজনে আমরাই আবার হাসব। তার মৃত্যু যে বিষিন্নতা বয়ে আনবে সে তার জীবনের মতনই ক্ষনস্হায়ী।

আজ বিষন্ন মনে, মধ্য বয়সে আমি চিন্তা করি যদি একবার সুযোগ পেতাম, তাহলে শৈশবের ক্রিকেট খেলায় তাকে জিতাতাম। ঢিল মেরে আম চুরির বড় আম টা না হয় তাকেই দিতাম। আরো দিতাম তাকে ম্যাকগাইভার হবার সুযোগ। প্রচন্ড গরমে ঠান্ডা পেপসিটা তোকেই দিতাম ভাই। সব দিতে চাই কিন্তু কিছুই পারিনা। দেবার আর নেবার যে ব্যবধান সেটা বড় বেশী বাস্তব, বড় বেশী রূঢ়।

আমার ভাই মারা গেচে অনেক আগে, তার সৃতি মুচে গেচে। তবু সে আসে প্রতিদিন একবার আর ভাবায় কেন দিলাম না কেন তোকে তোর ভালোবাসাটা!

http://www.somewhereinblog.net/blog/DOCTORSblog/28719229

শোন, আমি তোমাকেই ভাবছি. . .

জিহাদ
১৪ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ সকাল ১১: ০৮

সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে বসে আছি। আমি আর ও। আমরা দুজন। বেশ কিছুক্ষন হল এসেছি। আমি আগে। ও পরে। সেই থেকে চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। কিংবা শেষ বারের মত কথা না বলা নীরবতা উপভোগ করার চেষ্টা করছি দুজনই।
প্রথম মুখ খুললো ও।
- আসতে সমস্যা হয়নি তো?
- নাহ।
টঙ্গীতে এক ঘন্টা জ্যামে আটকে থাকার কথা বেমালুম এড়িয়ে গেলাম।
- বের হবার আগে কিছু খেয়ে এসেছিলে?
- হুঁ
- মিথ্যে কথা। তুমি কিছু খেয়ে আসোনি।
আমি কিছু বলিনা। ও কিভাবে যেন সব বুঝে যায়।
ওর মুখে রাগের আভাস।
আমি জানি আসলে ও রাগেনি। আমার উপরে একদম রাগ করতে পারেনা ও। শুধু ছেলেমানুষী ঠোঁট ফোলানো। বাবার ভাষায় আমি হচ্ছি দুনিয়ার মস্ত গাধা। কিচ্ছু বুঝিনা। কিন্তু এটা বুঝি। ও আমার ওপর একটুও রাগেনি।
- এখান থেকে গিয়েই রাতে খাওয়ার জন্য কিছু কিনে রাখবে, ঠিক আছে?
আমি বাধ্য ছেলের মত ঘাড় নাড়ি।
- আর সেবারের মত খালি পেটে আর কখনো কোক খাবেনা। খবরদার।
এবারো কিছু বলিনা। একটানে সেই দিনটাতে চলে যাই। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কোক খেয়েছিলাম। এরপর সারাটা দিন বমি বমি ভাব। কি বিশ্রি অনুভূতি। ওকে বলতেই পারলে ফোনেই আমাকে জুতোপেটা করে।
হঠাৎ মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায়। ও পাশে থাকলে কখনো এমন খারাপ লাগেনা। আজ লাগছে। আর কোনদিন ও আমার একপাশ আলো করে এভাবে বসে থাকবেনা। সেদিনের মত করে আর কোনদিন বকবেনা। আমি ভাল থাকি কিভাবে?

চোখ দুটো জ্বলছে। নির্লিপ্ত মুখ করে তাও বসে থাকি। ওর চোখে তাকাইনি আসার পর একবারো। কিন্তু জানি দুপুরের রোদ ভুলে চোখ দুটোতে কেমন আঁধার জমে আছে।

দুজনেই কিছুক্ষন ধরে আবারো চুপচাপ বসে আছি। যেভাবে চুপ করেছিলাম কথাটা প্রথম শোনার পর। ফোনের ওপাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আমার বুকের ভেতরটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল- এই মেয়ে, একটুও কাঁদবেনা। একটুও না। আমি তোমাকে শেখাবো কিভাবে চারপাশ আলো করে হাসতে হয়। হাতে হাত চেপে ঘন্টার পর ঘন্টা অর্থহীনভাবে হাঁটতে হয়। কিংবা রাতের অন্ধকারে গা ডুবিয়ে দু চোখে কিভাবে তারার আলো মাখতে হয়। শেখাবো আরো অনেক কিছু. . . সব শেখানোর আগে আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবনা. . . কত কিছু আরো বলার ছিল। কিছুই বলা হয়নি। বলতে পারিনি। তখনো চুপ করে ছিলাম। এখন যেমন আছি।

খেয়াল করিনি ওর হাতটা কখন আমার হাতের উপর উঠে এসেছে।
- আমার দিকে তাকাও।
আমি তাকালাম। গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও।
- বল, তুমি আমাকে ভুলে যাবে।
ঐ চোখে অনুরোধ, আকুতি নাকি অসহায়ত্ব? চিরকালের দ্বিধান্বিত আমি আবারো দ্বিধান্বিত হলাম।

আমি কারো চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলতে পারিনা। মাথা নিচু করে আস্তে করে বললাম- হুঁ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/xihad76blog/28770450

ছোটগল্প : খচ্চর (১৮+)

অমি রহমান পিয়াল
০৫ ই অক্টোবর, ২০০৭ রাত ১২: ৫৩

১.

ওসি বেশ মনযোগ দিয়ে ইলাস্টিকটা টেনে টুনে দেখছেন। 'হুমম, মহিলাতো বেশ মোটা মনে হচ্ছে। আচ্ছা এই ৩৯ ব্যাপারটা বুঝলাম না। ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস তো জোড় সংখ্যায় হয় জানি। ও থাইল্যান্ড! ওরা তাহলে বেজোড় মাপে' - বলেই নিজের রসিকতায় হো হো করে হাসলেন। থামলেন। এবার সেই ফিচকে হাসির রেশটা মুখে লাগিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তারপর শামীম সাহেব। লাশটা কোথায়?'

শামীম দরদরিয়ে ঘামছে। মিনমিনিয়ে কোনোমতে বলল, 'কিসের লাশ? কী বলছেন এইসব'। এই ঠাণ্ডাতেও তার গরম লাগছে। পিঠ ভিজে গেছে। আবার তলপেটে কামড় ও দিচ্ছে খুব। পেশাব পেয়েছে। ইচ্ছা করছে উঠে একটা ভো দৌড় দিতে। আসলে অনেক চিন্তা একসঙ্গে মাথায় জট পাকিয়ে গেছে। নিপা যদি জানতে পারে কী হবে! ও কি বাপের বাড়ি চলে যাবে? ডিভোর্সের মামলা করবে? সাদিয়াই বা জানলে কী ভাববে? ও যে মেয়ে, তাতে তসলিমা নাসরিন টাইপ একটা স্ক্যান্ডাল দাড় করিয়ে দিতে পারে। নিজেকে ওঠাতে গপ্পো বানাতে ওর জুড়ি নেই। ভাবতেই মেজাজটা এবার খিচড়ে গেলো। ক্যানো সে কাজটা করতে গেলো। এবার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে শামীমের।

২.

আজ একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছিল। বসকে মিথ্যে বলেই। সাদিয়ার বাসায় একটা সাহিত্যসভা হওয়ার কথা। সে নতুন কিছু লিখলেই বাসায় একটা সভা বসায়। খাওয়াদাওয়ার আয়োজন থাকে। উপস্থিতদের করণীয় একটাই- জটিল হয়েছে, দারুণ লিখেছ, বাংলা সাহিত্যে নতুন এক সূর্য্যের দেখা আমরা পেয়ে গেছি।' কথাগুলো শোনার সময় সাদিয়ার এক্সপ্রেশন খেয়াল করে শামীম। জুলজুলে চোখে তাকিয়ে থাকে, গদগদ ভাব। অর্গাজমিক আনন্দ পায় বুঝি! একটা সাহিত্য ফোরামেই পরিচয়। শামীম অবশ্য নিজে লেখে কম, তবে সমালোচক হিসেবে ইদানিং নাম করেছে। বেশ কিছু পত্রিকায় বই-পত্রের রিভিউ করে পয়সা আসে ঘরে। আজো সেরকমই এক সভা। সাদিয়া নতুন কবিতা লিখেছে। গিয়ে দেখে অতিথি সে একাই। একটু অস্বস্তি লাগে। সাদিয়ার সবচেয়ে বদগুণ হচ্ছে বেমক্কা মন্তব্য। হাসির ছদ্মবেশে এমন একটা কিছু বলবে যে ভিত নাড়িয়ে দেয়। সেদিন ভরমজলিশে বলল- শামীম ভাই আপনি অমন ঝুকে হাটেন ক্যান। কার্টুনের কচ্ছপরা দাড়িয়ে যেমন হাটে তেমন। হিহিহিহি।'

মেজাজ খারাপ হয়, তারও বলতে ইচ্ছে করে- আমারো তোমাকে দেখলে ভেটকি মাছের কথা মনে পড়ে। ট্যাগরা চোখ মুখের দুইপাশে ছড়ানো। গলা নাই, ঘাড়ের উপর মাথা বসানো। বুক-পেট-পাছা একাকার। কার্টুনে যেমন ব্যাটারির দুটো পা লাগিয়ে দেয়, তোমাকে দেখলে আমার সেই ছবি মনে আসে। হাহাহাহা।' বলে না। মুখ বুজে সয়ে যায়। কবিতা না ছাই। বাচ্চারা যেমন হাত দিয়ে প্লেন ওড়ানোর ভঙ্গি করে, অনেকটা কালোয়াতি ঢংয়ে কবিতাটা আবৃত্তি করে সাদিয়া। তার কণ্ঠ ভালো। কিন্তু কবিতাটা জঘন্য। ভিড়ভাট্টা নেই বলেই শামীম ধরিয়ে দেয় ঘাটতিগুলো- সাদিয়া তোমার বক্তব্য পরিষ্কার। কিন্তু ধারাবাহিকতা নেই। তুমি নারীর সামাজিক বৈষম্য তুলে ধরতে চেয়েছো। তবে এই জায়গাটা দেখো এখানে তোমার গাথুনী যতটা সবল শুরু বা শেষে সেটা নেই।' সাদিয়া গম্ভীর হয়ে যায়। 'চা খাবেন শামীম ভাই? বসুন এনে দিচ্ছি। আচ্ছা চলুন বারান্দায় বসি। ওখানে জোসনা দেখতে দেখতে চা খাওয়া যাবে।'

৩.

চিপা বারান্দা। এখনকার ফ্লাট বাড়িগুলোয় যেমন হয় আর কি। কাপড় শুকানোর জন্য সানশেডটা একটু গ্রিল দিয়ে ঘিরে বারান্দা বানিয়ে দিচ্ছে ডেভেলপাররা। পিঠ কোনোমতে ঠেকিয়ে পা গুটিয়ে জড়োসড়ো বসতে হয়। জোসনার কোন ঠাহর শামীম পায় না। বরং আশেপাশের কোনো বাড়ির বাতির ছটাই গায়ে পড়ছে বলে মনে হয়। বসার জায়গা করতে গিয়ে দেখে সারসার কাপড় ঝুলছে। একটা কালো ব্রার সাথে মুখ বাড়ি খায়। সরিয়ে বসে শামীম। সেই আধো-আধারে দুহাতে কাপ নিয়ে আসে সাদিয়া। 'চিনি একটু কম দিলাম। আপনার তো ভুড়ি হয়েছে, এখন থেকে ব্লাডসুগার কন্ট্রলে রাখার চেষ্টা করবেন।' শামীম একটু ঘাবড়ে যায়। না ভুল ধরিয়ে দেওয়াটা ভুল হয়েছে। এবার সাদিয়া তাকে হেনস্থা করা শুরু করবে।

আন্দাজ সঠিক। 'শামীম ভাই, আপনি কি জানেন আপনার মধ্যে একটা ছোকছোক ভাব আছে? আপনার তাকানোর স্টাইল হচ্ছে যাকে বলে চোরা চাউনি। আমার ধারণা আপনি সংসার জীবনে অসুখী। তো কবিতার কথা যা বলছিলেন। আপনি আসলে কবিতার ক-ও জানেন না। এর কোনো ধারাবাহিকতা নেই? একটা মেয়ে জন্মানোর পর সে ভালো করে হাটতে পারেনা, নাজুক থাকে। যখন যুবতী তখন সে সবল। আবার যখন সে বৃদ্ধা আবারো দুর্বল। কবিতাটায় আমি এটাই ফুটিয়ে তুলেছি। আপনি বুঝতেই পারলেন না। আবার সমালোচনা করেন। আপনাদের এই প্রবলেম, বোঝেন ঘণ্টা রাধেন ঘন্ট।' এক নিশ্বাসে বলে দম নেয় সাদিয়া। ক্ষোভ-অপমান-বিতৃষ্ণা সব একসঙ্গে খেলা করে শামীমের মনে। 'ভাবীর জন্য একটা গিফট কিনেছিলাম। আপনি দিলেন মুডটাই নষ্ট করে। আমি আপনাকে কত বড় লেখক ভাবতাম। আপনার জন্য আমার মনে কত শ্রদ্ধা, আর আপনি কিছু না বুঝেই আমার কবিতাটা ফালতু বানিয়ে দিলেন। কী কুক্ষণে যে আপনাকে শোনাতে গিয়েছিলাম। আর জ্যোতি দা'টা যেন কেমন। প্রতিদিন সকাল-বিকাল ফোন করবে- কি লিখলে সাদিয়া। আসতে বললাম অমনি সব আহ্লাদ উধাও, ওনার কাজ আছে! ব্যস্ত। আসতে পারবেন না। কাদের সঙ্গে মিশি!' সব আগুন উগড়ে দিয়ে থামে। শামীম কোনোমতে বলে, 'আমি ওভাবে ভেবে দেখিনি আসলে। আচ্ছা তাহলে উঠি আজ?' 'যাবেন? ঠিক আছে যান। দেখি কবিতাটা নিয়ে আবার বসতে হবে। ফোন করব আপনাকে। চলেন।' সাদিয়ার পিছু পিছু বেরুতে গিয়ে ওঠার সময় আবার মাথায় বাড়ি খায় ব্রাটা। কী এক অদ্ভুত প্রতিহিংসায় সেটা খপ করে পকেটে পুরে ফেলে শামীম।

৪.

ঠিক কী কারণে ভেবে পায়না। রিকশায় বসার সময় পকেটে হাত ভরে মুঠো করে ধরে রেখেছে কাপড়টা। দাম্পত্য জীবনে দারুণ সুখী শামীম। নিপার মতো মেয়েই হয় না। সব অর্থেই কথাটা খাটে। একবার ভাবে ব্রাটা নিয়ে মাস্টারবেট করলে ক্যামন হয়? মনে মনে হাসে। সাদিয়া যে টাইপ মেয়ে, তাতে কামভাব জাগে না। উল্টো পালাই পালাই করবে। ঠিক এমন সময় রিকশা থামায় টহল পুলিশ। 'নামেন, রিকশা চেক করব।' শামীম ভয় খায়। অদ্ভুত এক আতঙ্ক নিয়ে নেমে দাড়ায়। একজন কনস্টেবল সিট খুলে চেক করে। শামীম মুঠো আকড়ে থাকে পকেটের পাশে এক সেপাই। ফেলতেও পারছে না। 'উনারে সার্চ করব স্যার? - ওয়ারল্যাস হাতে দাড়ানো এক এএসআইকে জিজ্ঞেস করে সে।

অফিসার তাকান শামীমের দিকে। 'কী করেন?' 'জ্বী, কিছু করি নাই- আউলে যায় শামীমের। তার মুখে কী আসলেই চোর চোর ভাব। সাদিয়া কী এই চোরা চাউনির কথাই বলেছিল? 'কিছু করি নাই মানে? পকেটে হাত দিয়ে রাখছেন ক্যান? পকেটে কী?' 'কিছু না কিছু না' বলে পকেট থেকে হাত বের করতে গিয়েও করেনা। বরং ঠেসে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যেন। অফিসার এইবার সন্দীহান। 'চেক করোতো ব্যাটাকে।' শামীম বলে, 'স্যার আমি ভদ্রলোক। এক কোম্পানিতে চাকরি করি। আপনে খোজ নিয়ে দেখেন।' 'চুপ ব্যাটা হাত বাইর কর'- ধমকে উঠে এইবার সেপাই। বডি সার্চে যায় না। সরাসরি হাত দেয় পকেটে। বের করে আনে দুটো ত্রিভুজ জোড় লাগানো কাপড়খানা।

'স্যার মাইয়া মাইনষের ব্রেসিয়ার।' 'আচ্ছা!'- কিছুটা কৌতুক, কিছুটা কৌতুহল অফিসারের মুখে। 'তা মিস্টার ভদ্দরলোক। মাগীবাড়ি থেকে আসতেছেন নাকি। আসার সময় টাকা উসুল করতে বউয়ের জন্য গিফট- নাকি! গাড়িতে ওঠেন।' সামনে অন্ধকারে পার্ক করা পিকআপটার দিকে আঙুল তোলে। শামীম বলে, 'বিশ্বাস করেন স্যার আমি কিছু করি নাই।' অফিসারের এক ধমক, 'চুপ। একদম চুপ। কারে খুন কইরা কাপড় খুইলা নিয়া আসছস বিশ্বাস নাই। তোর মুখ দেইখাই বোঝা যায় তুই ক্রিমিনাল। চুপচাপ গাড়িতে ওঠ। যা ক'বি থানায় গিয়া, এখন চুপ।'

৫.

গাড়িতে কেউ ছিল না আর ঝেড়ে একটা দৌড় দেওয়ার চিন্তা এসেছিল। কিন্তু পায়ে সাড়া পায়নি। মাথায় চিন্তার ঘুরপাক। জানাজানি হলে কী হবে। কীভাবে সাহায্য পাবে? ফোন করতে পারে বসকে। সেখানে চাকুরি হারানোর ভয়। মোবাইলেও বড়জোর মিসকল দেয়া যাবে। নিপাকে ফোন করার প্রশ্নই আসে না। সাদিয়াকে তো না-ই। একবার ভাবে অফিসারের পা জড়িয়ে কান্নাকাটি করে। কিন্তু তাতে রেহাইর বদলে সন্দেহটা আরো পাকাপোক্ত হ ওয়ার জোর সম্ভাবনা। শুনেছে পুলিশ ঘুষ খায়। কিন্তু তার পকেটে কেচেকুচে পঞ্চাশ টাকাও হবে না। দিশেহারা লাগছে শামীমের।

থানার ওসি ব্যস্ত মানুষ। তাকে বসতে দিয়ে ফোনে কথা বলছেন এখানে ওখানে। ওয়ারল্যাসে নির্দেশ দিচ্ছেন। দর্শনার্থীও আছে কয়েকজন। আসামী ছাড়াতে এসেছে। ধান্দাবাজিটা প্রকাশ্যেই হচ্ছে। এক ফাকেই তাকে আবার বললেন কথাটা- 'লাশটা কই।' শামীমের রা সরছে না মুখে। কোনো উত্তর নেই। যা হবে হবে। সংসার ভেঙ্গে যাবে। চাকুরি হারাবে। জেল খাটবে। তাতেও যদি প্রায়শ্চিত হয়। কিন্তু সে আর চাপ নিতে পারছে না। ভেবেই মনের জোরটা যেন জুড়ে বসে। এখন আর কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

৬.

শেষটা অনেকভাবেই হতে পারত। এখানে অস্বাভাবিক কিছু হয়নি। ওসি একটু পর বললেন, 'ফরেনসিকে পার্ভারশন নানারকম হয়। এর একটা হচ্ছে ফেটিশ। মেয়েদের আন্ডার ওয়ার নিয়ে যৌন কল্পনা। পারলে ট্রিটমেন্ট করান, সাইকোলজিস্ট দেখান।' শামীমের ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, 'ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আর সাইকোলজিস্ট না, সাইক্রিয়াটিস্ট।' চুপ থাকে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার আনন্দটা পেল ওসি যখন শেষ করলেন এই বলে- 'আপনারা উচু তলায় অদ্ভুত সব ফ্যাসিনেশন নিয়া ঘোরাফেরা করেন। ক্রাইমের লেভেল পাল্টাচ্ছে দিনকে দিন। যান, বাসায় যান। আর যাওয়ার আগে এই মুচলেকাটায় সই করে যান। নাম-ঠিকানা ঠিকঠাক লিখবেন।' মুচলেকা বলতে একটা ডিমাইসাইজ সাদা কাগজ। কিছু লেখা নেই। নিচে এক কোনায় নাম-ধাম লেখে শামীম। এরপর বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে একটু বেগ কমায়। ব্রাটা নিয়ে যাবে? থাক, ভেবে জোর হাটা দেয়। সেদিকে তাকিয়ে হাসেন ওসি। ড্রয়ারে ব্রা'টা রাখতে রাখতে বলেন, 'খচ্চর। এখনো মাথায় ফাউল চিন্তা।'

http://www.somewhereinblog.net/blog/omipialblog/28735513

নির্বাসিতের আপনজন পর্ব- ১৯(ঘ) ।

নির্বাসিত

১.
২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ১১: ১৫

শুনেছি যখন তার জন্ম হয়, সেদিন আকাশে ছিল মেঘের ঘনঘটা। ঝোড়ো হাওয়ার সাথে বজ্রের হুংকার আর বিদ্যুতের চমক। জন্মের পরমুহূর্তেই শিশুটি প্রথম যা দেখেছিল যা ছিল প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি। হয়তো সে কারণেই বড় হবার পর শিশুটি অমন একটি রুদ্ররূপকে তার নিজের স্বভাবের অন্তর্গত করে নিয়েছিল।

শিশুটির বয়েস যখন পাঁচ বছর তখন তার মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতৃহারা শিশুটি তাই অল্প বয়সেই এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মায়াময় জিনিসটি হারিয়ে ফেলে। স্নেহহীন, মমতাহীন, ভালবাসাহীন একটি ভুবনে বেড়ে ওঠার কারণেই শিশুটির চোয়ালে ক্রমে ক্রমে জন্ম নেয় কাঠিন্য? এই কারণেই কি সে অবলীলায় যাবতীয় কোমল জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে?

শিশুটির বাবা ছিলেন একজন অতি দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। মা-হারা শিশুটি সংসারে তাই প্রতিনিয়ত দেখেছে অভাবের আগুন, ক্ষুধার দাবানল। সেই থেকেই কি সে বড় হয়ে সর্বক্ষণ শুধু কাজে ব্যস্ত রেখেছে নিজেকে? এমনই ব্যস্ত যে নিজের পরিবার-পরিজনের সাথে তার দিনের মধ্যেও পনেরো মিনিটও দেখা হোতনা?

এতসব প্রশ্নের জবাব আমাদের কারোরই জানা নেই। কেননা এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে পারার মতো বুকের পাটা নিয়ে জন্মানো মানুষ আমি দেখিনি।

আমি যে শিশুটির কথা বলছি, সে যখন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হোল, তখন তার দাপটে চারিদিকে ধুন্ধুমার অবস্থা। তার ধারেকাছে ভিড়বার মতো সাহস ছিলনা কারো। এই মানুষটি আমার বাবা। মিস্টার হিটলার নাম্বার টু।

বাবা ছিলেন আইনজীবি। আমি আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখছি যে বাবা হচ্ছেন একজন মহাব্যস্ত মানুষ। সূর্য্যোদয় থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বাবা ব্যস্ত থাকতেন। তার সকাল বেলাটা কাটতো তার চেম্বারে তার ক্লায়েন্টদের সাথে। দশটার দিকে ভেতরবাড়ীতে ঢুকে দ্রুত কোট-টাই পরে কোর্টে চলে যেতেন। ফিরতেন সেই বিকেল পাঁচটায়। তাড়াতাড়ি কিছু একটা মুখে দিয়ে চলে যেতেন ল' কলেজে। সেখানকার তখন তিনি ভাইস-প্রিন্সিপাল, পরে প্রিন্সিপালও ছিলেন বহুদিন। এরই ফাঁকে চলছে অল্প-বিস্তর রাজনীতি, আর সমাজসেবা। রোটারী ক্লাব সহ গোটা পনেরো সংগঠনের সাথে খুব অ্যাকটিভ্লি জড়িত ছিলেন।

এই পর্যন্ত পড়ে আপনাদের অনেকেই নিশ্চয়ই ভুরু কুঁচকে বলছেন, "ওয়েট আ মিনিট। ধান ভানতে শিবের গীত বলে মনে হচ্ছে। শিরোনামে লেখা রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, আর ভিতরে চলছে কোথাকার এক উকিল সাহেবের কেচ্ছা। ঘটনা কি?"

অভিযোগটি আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। এবং একই সাথে এখানে বলে রাখছি যে আজকের এই পর্বটির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংস্রব নেই। এই পর্বটিতে আমি একজন দোর্দন্ডপ্রতাপ পুরুষের কথা লিখছি। আমি আমার বাবার কথা লিখছি।

অতএব যারা এই পর্বটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে খুঁজতে যাবেন, তাদেরকে আমি এখনই সতর্ক করে দিচ্ছি যেন তাঁরা আর না অগ্রসর হন। ও জিনিস সামনে নেই।

যাই হোক- ফিরে আসি যা বলছিলাম। বাবাকে আমার চিরটা কাল মনে হয়েছে তিনি যেন সূর্য্যের মতোন। যার আলো নিয়ে, উত্তাপ নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু তার কাছে যাওয়াটা যেন ঠিক হবেনা। কাছে গেলে তার প্রবল উত্তাপে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবো। তার থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখাটাই হচ্ছে নিরাপদ।
ছেলেবেলা থেকেই মনে হয়েছে বাবা যেন দূরের মানুষ, বাইরের লোক। তাতে অবশ্য আমাদের কোন সমস্যা ছিলনা। দিনের যে পনেরো মিনিট তিনি ভেতরবাড়ীতে থাকতেন, সেই পনেরো মিনিট আমরা সবাই মহা তটস্থ থাকতাম। তিনি বেরিয়ে গেলেই যেন বাঁচোয়া। আমরা (এমনকি মা সমেত) যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। আবার ফিরে আসতো নিশ্চিন্ত গল্পগুজবের পরিবেশ।

বাবার ধারেকাছে না যাওয়াটাই শ্রেয় ছিল। কিন্তু বছরের কয়েকটা দিন তার কাছে যেতেই হোত। যেমন স্কুলের প্রগ্রেস রিপোর্টে তার দস্তখত নেবার দিনটি। রেজাল্ট ভালই হচ্ছিল, কিন্তু বাবারাতো সবসময়েই চান আরো ভাল রেজাল্ট। তায় সই করবার আগে প্রতিবারই ভুরু কুঁচকে তিনি বলতেন, " হুমম- অংকে পেয়েছ পচানব্বই। এখন তুমি পড়ো ক্লাস সিক্সে। এখন যদি পাও পচানব্বই, তাহলে ক্লাস এইটে পাবে পচাত্তর, আর ক্লাস টেনে পাবে পঞ্চান্ন। ম্যাট্রিকে তার মানে পাবে পয়তাল্লিশ, আর এই রেটে চলতে থাকলে ইন্টারমিডিয়েটে অংকে করবে ফেল। এখনো সময় আছে। পড়াশুনা করতে যদি ইচ্ছে না হয়, তাহলে এখনই আমাকে বলে দাও। খান দুয়েক রিকশা কিনে দেই। তুমি আর তোমার ভাইয়েরা রিকশা চালানো শেখা শুরু করো। শুনেছি আজকাল নাকি রিকশা চালিয়ে বেশ ভাল পয়সা রোজগার করা যায়।"

অংকের এই পর্যায়ক্রমিক অধঃপতনের দুরূহ ক্যালকুলেশন ক্লাস সিক্সের একটি ছেলের মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। তাই বাধ্য হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি।

ছেলেদের মাথায় লম্বা চুল রাখাতে বাবার ছিল চরম গাত্রদাহ। তখন স্কুলের ওপরদিকে পড়ি। লম্বা চুল রাখা ফ্যাশন তখন। বড় ইচ্ছে করে ছবিতে দ্যাখা রবীন্দ্রনাথা বা নজরুলের মতো ঘাড় বেয়ে নেমে যাবে চুল। আমি সেই চুল নিয়ে বাবড়ি দোলাবো, অ্যাফ্রো ফোলাবো, পনি টেইলের ঝুঁটি বাঁধবো। কত শত প্ল্যান। কিন্তু চুল আধা ইঞ্চি বাড়তে না বাড়তেই বাবার রাডারে ধরা পড়ে যাই ঠিকই একদিন।
কোর্টে যাবার আগে আমায় ডেকে নীরবে দুটো টাকা হাতে ধরিয়ে দেন। মুখে কিছু না বললেও নির্দেশনা পরিষ্কার। "বিকেলে আমি বাড়ী ফিরে যেন তোমার মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল দেখি। তা না হলে---।"
তা না হলে কি হবে, সেটা জানবার সাহস হয়নি কোনদিন। আমার মাথাতো একটাই, নাকি?

(এখানে বলে রাখা ভাল, যে ঢাকাতে পড়তে গিয়েই আমার প্রথম কাজটি ছিল লম্বা চুল রাখা।)

বাবা ছিলেন কাজের মানুষ। সংসারের চার দেয়ালে তিনি কোনদিন নিজেকে আটকে রাখেননি। তার কাছে কাজই ছিল ঈশ্বর। শহরের একজন সফল আইনজীবি হিসেবে তার পরিচয় ছিল। এর বাইরে তো অন্য পরিচয় তার ছিলই। ছোটবেলায় অতটা বুঝিনি, কিন্তু পরে কে জানিনে আমার মনে হোত যে বাবা আসলে কাজের মধ্যেই হারিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তার কোমল দিকটিকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। হয়তবো তিনি টের পেয়েছিলেন যে একবার যদি তার কোমল দিকটির সন্ধান আমরা পেয়ে যাই, তাহলেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে সব নিয়মকানুনের ইমারত। অতএব তিনি মুখে চড়ালেন মিস্টার হিটলারের কঠিন মুখোশ।

আমার আমার ভাইবোনদের কাউকে বাবার কোলে চড়তে দেখিনি। আমার ছোট বোনটি যেদিন প্রথম শাড়ী পরলো, আমার মনে পড়েনা যে বাবা তার দিকে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে বলেছিলেন, "আমার মামণি কবে এতো বড় হয়ে গেল? কি সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে।"
কখনো দেখিনি বাবা আমাদের মাথার চুল নেড়ে দিচ্ছেন সোহাগ করে, গালে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। (এইখানে বলে রাখা ভাল যে আমার গালে বারদুয়েক বাবার হাত স্পর্শ করেছিল। অনুভূতিটি মোটেও সুখকর ছিলনা। চড়ের দাপটে মাথার ঘিলু অবধি নড়ে গিয়েছিল।)

বাবা আমাদেরকে কখনোই আর্থিক প্রাচুর্য্যের স্বাদ পেতে দেননি। যদিও তার সে সামর্থ্য ছিল। কিন্তু দেননি। স্কুল আর কলেজ জীবনের গোটা সময়টাই দুটো প্যান্ট আর দুটো শার্ট দিয়েই চালিয়েছি আমরা সবাই। নানান রকম ঝুলোঝুলি করে একটা টেনিস বল কিনতে পারলেই মনে হোত হাতে পৃথিবীটাকে পেয়ে গেছি। সেই টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলতাম, ফুটবল খেলতাম, হকি খেলতাম, এমনকি দু একবার ভলিবল খেলারও চেষ্টা করেছি। বাবার কল্যাণে টেনিস বলের নানান ব্যবহারে জেনেছি।

এটাও সত্যি যে আজকালকার মতো এত বেশ জিনিসপত্র পাওয়া যেতনা তখন। তার পরেও যা দু একটা জিনিস পাওয়া যেতো সেগুলোও কিনে দিতেও বাবার মহা আপত্তি। রাগে তখন মাথা ঝিম ঝিম করতো। কিন্তু কি আর করবো? উনি যে মিস্টার হিটলার নাম্বার টু। কথা বলতে গেলেই ফায়ারিং স্কোয়াড এর হুকুম জারী হয়ে যাবে।

তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে বসে আছি। কাজকাম নেই। মাঝেমাঝে স্কুল-কলেজের বন্ধুরা আসে, ওদের সাথে রাজা-উজির মারি।

এমনি এক সময়ে বাবা ডেকে বললেন, "দুদিনের জন্যে চিটাগং যাবি নাকি?"
আমি সে প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেইনা। কে জানে আমাকে কি ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোন এক জায়গায় নিয়ে ফেলে দিয়ে আসবে নাকি? সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞেস করি, "চিটাগং যাবো? কেন?"
"আমার একটা কাজ আছে চিটাগং কোর্টে। দিন দুয়েক লাগবে। তোর তো এখন কোন ক্লাশ-টলাশ নেই। ইচ্ছে করলে যেতে পারিস। ফেরার সময়ে ঢাকা হয়ে ফিরবো।"
শুধু চিটাগং নয়, এর সাথে ঢাকাও রয়েছে! বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মত আধো আধো গলায় বলতে ইচ্ছে করছে তখন, "এত সুখ আমার ভাগ্যে সইবে তো?"
আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা তাড়া দিলেন, "কিরে চুপ করে আছিস কেন? যাবি কিনা তাই বল তাড়াতাড়ি। আমাকে প্লেনের টিকিট বুক করতে হবে।"
ও মাই গড! প্লেনে করে যাবো! আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম সকালে?
আর চুপ করে থাকাটা সমীচীন হবে না। মাথা নাড়লাম। আমি যাবো, আমি যাবো।

খবরটা যখন বাড়ীর আর সবার কানে গেল, তখন তো সবাই ভয়ানক ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লো আমার সৌভাগ্যে। একেবারে প্লেনে করে চিটাগং যাওয়া! চাট্টিখানি ব্যাপার না।
আমার এক পুরনো স্কুলের বন্ধু তখন ঘটনাক্রমে চিটাগং থাকে, তাকে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম যে আমি আসছি। আমি জানি যে আপনারা অনেকেই "টেলিগ্রাম" করার কথা শুনে হাসছেন। যেহেতু তার ফোন নাম্বার জানতাম না, দ্রুত খবর পাঠানোর এটাই তখন ছিল সর্বোত্তম উপায়।

প্লেনের জার্নিটা ছিল অসাধারণ। পাশে বাবা বসা ছিলেন বলে বিমানবালাদের দিকে বিশেষ নজর দিতে পারিনি, জানালার পাশে সিট থাকায় সারাক্ষণই বাইরে তাকিয়েছিলাম। আর বারবার বাবাকে দেখছিলাম। তাকে আমার অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। স্বাভাবিক, একজন আর দশটা বাবার মতো। একবার তিনি আমার সিটবেল্টটা ঠিক করে বেঁধে দিলেন। বিমানবালার দেওয়া তার ভাগের চকোলেটটা নিজে না খেয়ে আমাকে দিয়ে দিলেন।

চিটাগং পরের দুদিন কাটলো স্বপ্নের মধ্যে। আমি আর আমার বন্ধুটি গোটা শহর তোলপাড় করে ঘুরলাম। বাটালী হিলে উঠে সূর্যাস্ত দেখা, বিপণিবিতানের এস্কেলেটরে ওঠানামা করা, লাভ লেনের বিখ্যাত পান খাওয়া, সবই হোল প্রথম দিনে। পরের দিনে বাসে করে চলে গেলাম কাপ্তাই। পকেটে না চাইতেই বাবার দেওয়া টাকা কচকচ করছে। তা দিয়ে এ জিনিস কিনি, সে জিনিস খাই।

সাথের বন্ধুটি আমার বাপজানকে ভালভাবেই চেনে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ব্যাপার খানা কি বলতো? চাচা হঠাৎ এত দিলদরিয়া কেন?"
আমি ঠোঁট ওলটাই। "নো আইডিয়া।"

"সাংঘাতিক ব্যাপার। হিটলার থেকে একেবারে দাতা হাতেম তাই। তোকে নিয়ে এলো চিটাগং, তারপর পকেটে টাকা পুরে দিয়ে আমার সাথে ঘোরাঘুরি করতে পাঠিয়ে দিল। রীতিমত অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।"
আমরা তখন গাছের ছায়ায় বসে আইসক্রীম খাচ্ছিলাম। মুখভর্তি, তাই কথা বলিনা বেশী। উত্তেজিত বন্ধুটি অবশ্য থামেনা। সে কথা বলেই চলে। "আমার কি মনে হয় জানিস? আমার মনে হয় চিটাগং এর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে চাচার মনটা নরম হয়েছে।"
"কে জানে? হতেও পারে। মানুষের মন বলে কথা।"
"তাই যদি হয় তাহলে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।"
এর পাল্লায় পড়ে তো দেখছি শান্তিমতো আইসক্রীমও খাওয়া যাবে না। "বল কি বুদ্ধি?"
"তুই চিটাগং এ থেকে যা আরো কদিন। এই ধর আরো পাঁচ-ছয় দিন।"
"বুঝিয়ে বল।"
"আমার খুলনা যাবার একটা প্ল্যান আছে শিগগীর। চাচাকে বলে তোকে রেখে দেই এখানে কয়েকদিন। তারপর আমি আর তুই একসাথে খুলনা যাবো। ওই কয়দিন তুই আমাদের বাসাতেই থাকবি। তুই আর আমি মিলে ওই কয়দিন শুধু ঘুরে বেড়াবো। কত জায়গায় যাওয়া হয়নি। কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, টেকনাফ। এসব জায়গায় গেলে তুই একদম পাগল হয়ে যাবি, এমন সুন্দর। আর কক্সবাজারে বার্মিজ মেয়েদের কথাতো বললামই না। তোর চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।"

তার কথা শুনে আমারও বুকের ভিতরটা নড়চড়ে ওঠে। বুদ্ধিটা খারাপ না। কিন্তু পরমুহূর্তে বাবার মুখটি মনে আসতেই আবার চুপসে যাই। এই প্ল্যানে জনাব হিটলার রাজী হবেন সেটা মনে হয়না।

"বাবা এতে রাজী হবেন না। বাদ দে এইসব প্ল্যান। পরে কোন একদিন হবে।"
বন্ধুটি নাছোড়বান্দা। সে বলে, "আরে রাজী উনি হবেনই। তোদের হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ালে দূরের পাহাড় গুলো খুব সুন্দর দেখা যায়। আজকে ঠিক সূর্য্য ডোবার সময় ওইখানে বসে আমরা চা খাবো চাচার সাথে। দু এক কথা বলে আমি চাচার মন ঠিকই নরম করে ফেলবো। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ। এক কোপে আমি একদম গলা নামিয়ে দেবো।"

তার উপমাটা ঠিক পছন্দ হয়না আমার। হিটলার হোক আর কঠিন-হৃদয়ের লোকই হোক, আফটার অল বাবাতো।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বন্ধুটি আবার বলে, "কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোর? কেন মনে নেই স্কুলে পড়ার সময়ে কিভাবে আমি হেড স্যারের কাছ থেকে ছুটি আদায় করতাম?"
সেটা অবশ্য সত্যি কথা। আমাদের স্কুলের হেড স্যার ছিলেন মাহতাব সাহেব। ভয়ানক কঠিন লোক। তাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে আমরা বেশ কয়েকবার ছুটি আদায় করেছিলাম। এবং প্রত্যেকবারেই আমার এই বন্ধুটি ছিল স্যারের সাথে কথা বলার জন্য আমাদের প্রতিনিধি। প্রথমে বিনীত অনুরোধ, পরে যুক্তিসহ তর্ক, তাতে কাজ না হলে কাঁদোকাঁদো গলায় অনুনয়, ইত্যাদি নানান ধরণের স্ট্র্যাটেজীতে সে ছিল অতিশয় দক্ষ। এবং প্রতিবারই সে সাফল্যের সাথে ছুটি বাগিয়ে নিয়ে এসেছিল।

এবার আমার মনেও কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়। সত্যিই কি তবে বাবাকে সে রাজী করাতে পারবে?

বন্ধুটি বলে, "কেন নয়। উনি আমাকে চেনেন, আমার গোটা ফ্যামিলিকে চেনেন। তোর সাথে আমি একসাথে স্কুলে পড়েছি বহুকাল। আর তুই চিটাগং এ আমাদের বাসায় থাকবি, আর তারপর আমরা দুজন একসাথে খুলনা যাবো। এমন তো না যে আমি তোকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ভেগে যাবো, আর তুই পথ হারিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবি।"
একদম হক কথা। যুক্তিতে কোন ভুল নেই। আমি নিজেই রাজী হয়ে যাই।
বন্ধুটি তাড়া লাগায়, "তাহলে তাড়াতাড়ি চল। সন্ধ্যের আগেই হোটেলে পৌঁছুতে হবে।"
আমি আপত্তি জানাই। "কিন্তু কাপ্তাইটা যে ভাল করে দেখা হোলনা।"
"আরে সব পরে হবে। আগে চাচাকে রাজী তো করাই, তারপর কাপ্তাই হবে, পতেঙ্গা হবে, ফয়েজ লেক হবে।"

শেষ বিকেলে আমরা হোটেলে পৌঁছে যাই। বাবাও ততক্ষণে ফিরেছেন। আমাদের দেখে তার মুখ হাসি হাসি হয়ে গেল। "কি তোমরা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? ঘোরাঘুরি শেষ?"
বন্ধুটি মাখন মাখন গলায় বলে, "আজকে আমরা তিনজনে বারান্দায় বসে চা খাবো চাচা। ওখান থেকে পাহাড়গুলোকে সূর্য্য ডোবার সময়ে যা সুন্দর দেখা যাবে।"
বাবার মুখে হাসিটি লেগেই থাকে। "তাই নাকি? চলো তাহলে।"

হোটেলের বারান্দা থেকে যা দেখা গেল তা আসলেই সুন্দর। বাবাও বেশ হাসিমুখে তার একটি ভ্রমনের গল্প করলেন। সূর্য্য যখন পশ্চিমা আকাশে ডুবুডুবু করছে তখন আমার বন্ধুটি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে হাত কচলে বললো, " চাচা, একটা কথা ছিল।"
বাবা হাসিমুখে তার দিকে তাকালেন। "বলো, কি বলবে?"
বন্ধুটি খুবই নরম গলায় তার অনুরোধটি পেশ করলো। বাবা চুপ করে তার পুরো কথাগুলো শুনলেন। তারপর আগের মতোই হাসিমুখে বললেন, "না- এটা সম্ভব না। ওকে আমি এখানে একা রেখে যাবো না।"

বাবা উঠে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। আমরা দুজন প্রায়ান্ধকার বারান্দায় চুপ করে বসে থাকলাম। দুজনেই পরিস্কার বুঝতে পারলাম যে এটি সুপ্রীম কোর্টের রায়। ফাইনাল ডিসিশন। কোনভাবেই এর নড়চড় হবেনা। বন্ধুটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "এই প্রথম আমি ফেল মারলাম।"

মিনিট দশেক পর বাবা বারান্দায় ফিরে এলেন। "আমাদের প্ল্যানে একটু পরিবর্তন হয়েছে। আমি জানতাম না যে চিটাগং থেকে রাতের বেলায় ঢাকা যাবার একটি ট্রেন ছাড়ে। আমরা তাই আজরাতেই চলে যাবো। আমি স্টেশনে ফোন করে টিকিট বুক করে রেখেছি। রাত দশটার সময় ট্রেন ছাড়বে। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও।"

২.
২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ ভোর ৫:০৮

সেইদিনের সন্ধ্যাবেলার কথা আমার আজো পরিস্কার মনে আছে। বন্ধুটি ততক্ষণে চলে গেছে। আমি আর বাবা চুপচাপ রাতের খাবার খেয়ে নিলাম হোটেলে। আমার খিদে বলতে গেলে তেমন ছিলইনা, তবু কষ্ট করে গিললাম। সেই রাতে বাবার সাথে আমার বেশী কথা হয়নি। বাবাও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি মন খারাপ করে আছি। তাই তিনিও আমাকে তেমন বেশী কিছু বলেননি।

আসলে আমার সে দিন মন খারাপ ছিলনা। আমার মনে ছিল প্রচন্ড রাগ। আশ্চর্য্যের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে প্রথমে আমার রাগ হয়েছিল আমার নিজের প্রতি। কেন আমি আমার বন্ধুটির কথায় নেচে উঠলাম? আমি কি জানতাম না যে বাবা কোনভাবেই এই রকম একটি প্রস্তাবে রাজী হবেন না।
রাগটা তারপর গিয়ে গড়ালো আমার বন্ধুর প্রতি। আমি নাহয় একটা ভুল আশা করলাম, কিন্তু সেও তো জানে আমার বাবা কি রকমের লোক। কিভাবে সে আমার মনে এইরকম একটা মিথ্যে আশার আলেয়ার আলো জ্বালিয়ে দিলো?
রাত বাড়ার সাথে সাথে রাগের পরিমানটিও বাড়তে থাকে ভিতরে। এবং সেটা আস্তে আস্তে গড়িয়ে যায় বাবার দিকে।

যখন আমরা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন আমার সারা শরীর রাগে কেঁপে উঠছে। চিটাগং ভ্রমনের যাবতীয় আনন্দ ততক্ষনে কর্পূরের মতো উবে গেছে। আমার নজরে তখন শুধু আমি বন্ধুটির সাথে কি কি আনন্দ করতে পারলাম না, তাইই শুধু ভাসছে। অথচ প্রথম থেকেই তো আমি জানতাম যে আমরা দুদিনের জন্য চিটাগং যাচ্ছি। যা দেখেছি সেটুকুও যে দেখতে পারবো তারও কোন প্ল্যান ছিলনা।

সেই রাতে আমি জীবনের একটি মহা সত্যকে আবিষ্কার করেছিলাম। আমাদের জীবনের সুখ বা দুঃখ আমরাই নির্ণয় করে থাকি। এবং সেটি নির্ণিত হয় আমাদের আশা দ্বারা। আশার অধিকই সুখ, আর আশার কমতিই দুঃখ।

তারপরেও মানুষের মন অবুঝ। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। রাগে দুঃখে তখন মনে হচ্ছে আমি স্টেশন থেকে দৌড়ে কোথাও চলে যাই। বাবার দিকে তাকাতেও আমার ইচ্ছে করছিল না।
রেলগাড়ীতে আমরা দু বাংকের একটি কামরায় উঠলাম। বাবা তো উপরের বাংকে উঠবেননা, তাই আমিই উঠলাম সেখানে। স্টেশন থেকে কিনেছিলাম ম্যাক্সিম গোর্কির "মা" উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ। তাই পড়েই রাত কাটিয়ে দেবো, এই প্ল্যান।

রাগে তখনো মাথা দপ দপ করছে। বইয়ের পাতায় মন বসছে না কিছুতেই। একটু পরে বাবা ঘুমিয়ে গেলেন। আমি জোর করে বইয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে চাইছি। আস্তে আস্তে মনটা শান্ত হয়ে আসতে থাকে। কেন কে জানে? হয়তো ম্যাক্সিম গোর্কি পড়ার সুফল। হয়তো আমি নিজেই ততক্ষণে বুঝে গেছি যে এই রাগ করার কোন মানে হয়না।

শেষ রাতের দিকে চোখে ঘুম এলো বটে কিন্তু তখন আবার অন্য সমস্যা এসে ভর করলো। তখন ছিল শীতকাল, আর আমি রাগের মাথায় কোন গায়ের কম্বল না নিয়েই উপরের বাংকে উঠে গেছি। আগেতো মাথা গরম থাকায় ঠান্ডা টের পাইনি, কিন্তু মাথা ঠান্ডা হবার সাথে সাথে শীতটিকেও বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া শুরু করলাম।
কিন্তু তখন আমার করার নেই তেমন কিছু। নীচে বাবা ঘুমাচ্ছেন, নামতে গেলে তার গায়ের উপর পড়ে যেতে পারি এই ভয়ে নীচে নামতে পারছিনা। কিন্তু এদিকে দারুন শীতে আমার দাঁতকপাটি লাগার মত অবস্থা। গায়ে একটা পাতলা সোয়েটার ছিল বটে, কিন্তু সেটাকে গুটিশুটি করে বল বানিয়ে তখন বালিশ হিসেবে ব্যবহার করছি। ম্যাক্সিম গোর্কিকে বালিশ হিসেবে মাথার নীচে চালান করতে পারতাম, কিন্তু পাতলা সোয়েটারটি গায়ে দেওয়া আর না দেওয়া সমান ব্যাপারই ছিল। অগত্যা, দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা আমার হাতে।

তাইই করতে হোল। শুধু ভরসা ছিল একটা। বাবা ঘুম থেকে ওঠেন খুব সকালে। ফজরের নামাজ পড়ার জন্য। অতএব চোখ কান বুজে সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় থাকলাম। রেলগাড়ীর দোলানীতে নাকি ঘুমের উদ্রেক হয় খুব সহজে, কিন্তু সে রাতে টের পেয়েছিলাম যে শীতের কষ্ট কাহাকে বলে। (অবশ্য এখানে বলে রাখা ভাল যে অনেক পরে একবার আমাকে শূন্যের পয়তাল্লিশ ডিগ্রি নীচে তাপমাত্রায় বাইরে থাকতে হয়েছিল। সে যাত্রায়ও বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।)

এক সময় রাত পোহায়। বাবার ঘুম ভাংলো। উপরে আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান ধরে পড়ে আছি। প্ল্যান করছি যে বাবা বাথরুমে গেলেই আমি আমার ব্যাগ থেকে চাদর বের করবো। কিন্তু বাবা বিছানা থেকে নামলেন বটে কিন্তু ঘরের দরজা খুললেন না। চোখ বন্ধ করে আছি যেহেতু তাই ঠিক বুঝতেও পারছিনা যে তিনি কি করছেন।
এমন সময় হঠাৎ আমার গায়ে যেন কিসের স্পর্শ পেলাম। চমকে উঠে ভাবছি সাপ বা মাকড়সা জাতীয় কিছু নয়তো? চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাবা তার নিজের গায়ের শালটি আমার গায়ে বিছিয়ে দিচ্ছেন। তিনি ভেবেছিলেন আমি হয়তো ঘুমিয়ে, তাই চুপিচুপি আলতো করে কাজটি সারলেন। যেন আমার ঘুম না ভাংগে, যেন আমি তার এই কোমল রূপটি না দেখি, যেন আমি জানতে না পারি তিনি আমাকে কতখানি ভালবাসেন।

শালটিতে তখনো বাবার গায়ের গন্ধ লেগে আছে, তার শরীরের ওম জড়ানো। নিদ্রাহীন আমার চোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো মুহূর্তে। বাবার ভালবাসাটি আমিও খুব গোপনে নিজের মধ্যে ধারণ করলাম। এ জিনিস তো কাউকে বলবার নয়, এ জিনিসের কথা তো আর কারোর জানার কথা নয়। এ শুধুই আমার একার। সে রাতের কথা কেউ জানে না, এমনকি বাবাও না। সেদিন বাবা টের পাননি যে আমি মহামতি হিটলারের হৃদয়টিকে গোপনে দেখে ফেলেছিলাম। আমিও আমার চোখের জলটিও তাকে দেখতে দেইনি।

এর অনেক দিন পরের কথা। আমার বিদেশ চলে আসার প্রাক্কালে মা বললেন, "তোকে একটা নতুন শাল-টাল কিনে দেই। শীতের জায়গায় যাচ্ছিস, মাঝেমাঝে গায়ে দিবি।" আমি গোপনে বাবার আলমারী খুলে সেই পুরনো শালটিকে আমার স্যুটকেসে ভরে নিয়ে চলে এসেছিলাম। ততদিনে শালটি জীর্ণ আকার ধারণ করেছে, গায়ে লেগেছে কিছু সময়ের দাগ, তৈরী হয়েছে পোকায় কাটা কয়েকটি ফুটো।
আজও শালটি আমার কাছে আছে। শীতকালে ঘরের ভিতরে সেটাকেই গায়ে দেই। বৌ আপত্তি করেছিল প্রথম প্রথম, ছেলেমেয়েরাও পছন্দ করেনি। কিন্তু শালটিকে আমি যখন গায়ে দেই, তখন আমি আমার বাবার গায়ে গা ঘেঁষিয়ে বসে থাকি যেন। যা বাস্তবে কোনদিন হয়নি। তাতে কি? এটাই এখন আমার বাস্তব। মহামতি হিটলার চিরটাকাল এমনিভাবে আমার কাছটিতেই থাকবেন।

আগের একটি পর্বে (পর্ব-৪) আমি লিখেছিলাম যে মাস্টার্স পড়ার সময়ে আমি বাবার সাথে আর্থিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। তারপর ছাত্র পড়িয়ে, স্কুলে এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারী করে যা পয়সা পেতাম, তাতে আমার বেশ ভালই চলে যাচ্ছিল। একা মানুষ, হোটেলে তিনবেলা খাওয়া খরচ বাদ দিলে আর থাকে বিড়ি-সিগ্রেটের খরচা আর মাঝেমাঝে রিকশা ভাড়া। আর বিপদে পড়লে আমার সদা প্রস্তুত বন্ধুরাতো রয়েছেই। বাবার কাছ থেকে পয়সা নেওয়া বন্ধ করার মূল কারণ ছিল যে তার উপরে আর আর্থিক বোঝা চাপাতে চাইনি আমি, এছাড়া খামাখা আমাদেরকে অহেতুক কৃচ্ছতার মধ্যে রাখার জন্যে তার প্রতি আমার এক ধরণের অভিমানও ছিল।

এমন করে ভালই চলছিল দিন। এরই মধ্যে খবর এলো যে আমেরিকার স্কলারশিপটি আমি পেয়ে গেছি। তিনমাস পর আমাকে যেতে হবে। বাবাকে খবরটি দিলাম ফোন করে। বাবা বললেন, "প্লেনভাড়ার জন্যে চিন্তা করিস না। আমি দিয়ে দেব।"
আমার পুরনো অভিমান মাথার মধ্যে নাড়াচাড়া করে উঠলো। একটু বাঁকা সুরে বললাম, "আমি চিন্তা করছি না বাবা, কেননা স্কলারশিপ যারা দিচ্ছে, তারা আমার প্লেন ভাড়াটাও দিয়ে দিচ্ছে।"
বাবা যেন একটু চুপসে গেলেন, "ও তাই নাকি? ভাল, বেশ ভাল। কিন্তু তোর তো নতুন জামা কাপড় কিছু কিনতে হবে। আমি কালই মিনারের (ছোটভাই, পর্ব-১২) হাতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"
"লাগবে না বাবা। আমার জমানো কিছু টাকা আছে, তাতে দু তিনটে জামা-প্যান্ট হয়ে যাবে।"
স্যুটও তো বানাতে হবে একটা।"
"আমি স্যুট পরিনা বাবা। আমার স্যুট লাগবে না।"
"পথের খরচ তো লাগবে কিছু। আমার কাছে কিছু ডলার আছে। হজ্ব করার সময়ে কিনেছিলাম, সেগুলো তুই নিয়ে যা তাহলে।"
আমি কঠিন স্বরে বলি, "আমিতো বললামই তোমাকে বাবা যে আমার সমস্ত পথ খরচা ওরা দিয়ে দিচ্ছে। আমাকে একটা পয়সাও পকেট থেকে দিতে হবে না। আমি তোমাকে ফোন করেছি খবরটা দেওয়ার জন্য। তোমার কাছে আমি টাকা চাইতে ফোন করিনি। আমার কাছে টাকা আছে।"
বাবার স্বরটি কেমন যেন নরম হয়ে গেল। "তাহলেতো ভালই। যদি কিছু লাগে আমাকে অবশ্যই জানিও।"
"আমার কিছু লাগবে না বাবা।" আমি ফোনটি সশব্দে রেখে দেই। মনে মনে বলি, হিটলার সাহেব, আমি এখন স্বাধীন মানুষ।

আস্তে আস্তে আমার যাবার দিনটি এগিয়ে আসে। ঢাকাতে আমার ব্যস্ত সময় কাটে। ভিসার জোগাড়যন্তর, জিনিসপত্র কেনাকাটা, ব্যাংক এ্যাকাউন্ট বন্ধ করা ইত্যাদি। সবকিছু শেষ করার পর হাতে যা পয়সা বাকী ছিল, তা দিয়ে ডলার কিনে ফেলি। ব্যাস- আমার ঢাকার জীবন সমাপ্ত। হিসেব-কিতেব সব চুকিয়ে দিয়েছি, এবার আমার যাবার পালা।

যাবার দিন এয়ারপোর্টে সবাই এসেছে। বাবা, মা, ছোট ভাই বোনেরা। ছোট বোনটি জিজ্ঞেস করলো, "আবার কবে দেশে আসবে দাদা?"
আমার মা চুপচাপ মানুষ। তিনি বললেন, "বেশী মন খারাপ করোনা আমাদের জন্য।"

বাবা এদিক সেদিক পায়চারী করছেন। মাঝে মাঝে এসে আমাকে বার কয়েক শুধোলেন, "সব কিছু ঠিক আছে তো? কিছু লাগবে? লাগলে বল্‌। ডলারগুলো কিন্তু আমি নিয়ে এসেছি সাথে করে।"
আমি মনে মনে হাসি। নাহ্‌- কিচ্ছু লাগবে না আমার। আমি সব জানি। আমি স্বাধীন। আমার উপর তোমার আর কোন জারিজুরী খাটবে না মিস্টার হিটলার।

মাইক্রোফোনে ঘোষণা দিল। এবার আমাকে যেতে হয়। কাঁধে ব্যাগটি তুলে নেই। সবাই এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগোই আমি। ওরা সবাই চোখে জল নিয়ে হাত নাড়ে।

গেটের সামনে একজন ভদ্রলোক বসে টিকিট, পাসপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা করছেন। তাকে এগিয়ে দেই আমার কাগজ পত্র। সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকান। "এইবারই কি প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছেন?"
আমার মেজাজ খারাপ হয়। কেন আমাকে দেখতে কি ইডিয়েটের মতো লাগছে নাকি?
"হ্যাঁ- আমি স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় পড়তে যাচ্ছি (বেশ ডাঁট মেরে বলেছিলাম কথাগুলো)।"
ভদ্রলোক হাসেন। "এটাই যে আপনার প্রথম বিদেশ যাত্রা, সেটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি।"
আমার মেজাজ চড়ে যায়। মুখ বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করি, "তা কি দেখে বুঝলেন, সেটা কি আমি জানতে পারি?"
"আপনি আপনার ট্রাভেল-ট্যাক্সটি দেননি। প্রথম যারা বিদেশ যায়, তাদের অনেকেই এই ভুলটি করে থাকে। যান-পাশের ব্যাংকের কাউন্টারে গিয়ে ট্যাক্সটি দিয়ে আসুন। ওরাই তখন আপনার বোর্ডিং পাসে একটা স্টিকার লাগিয়ে দেবে। ওটা এখানে এসে দেখালেই আপনি খালাস।"

রাগে গরগর করতে করতে আমি ফিরে আসি। আমাকে দেখে বাবা এগিয়ে আসেন আমার দিকে।
"কোন সমস্যা?"
"ট্রাভেল-ট্যাক্স দেওয়া হয়নি আমার। সেটা দিয়ে আসি।"
"ও-আচ্ছা।"
বাবা আর তেমন কোন কথা না বলে আমার পিছন পিছন ব্যাংক কাউন্টার অবধি আসেন।

কাউন্টারের ভদ্রলোককে বলি, " ট্রাভেল-ট্যাক্স দিতে চাই।"
"কজন প্যাসেঞ্জার?"
"আমি একাই।"
"সাড়ে সাতশো টাকা দিন।"
"মানে?"
"সাড়ে সাতশো টাকা হচ্ছে একজনের ট্রাভেল-ট্যাক্স।"
আমার গা ঘামতে শুরু করে। বলে কি এই লোক? আমার পকেটে কুড়িয়ে-টুড়িয়ে বাংলাদেশী টাকা হয়তো দশ-বারো থাকতে পারে, তার বেশী নয়। সাড়ে সাতশো টাকা আমাকে তখন দশবার ঝাড়লেও বেরোবে না। আগেই বলেছি এয়ারপোর্টে আসবার আগেই বাংলাদেশের যাবতীয় হিসেব-কিতেব চুকিয়ে ফেলেছিলাম।
(এই প্রসংগে বলে রাখা ভাল, যে সেই সময়ে সাড়ে সাতশো অনেক টাকা। আমি ঢাকাতে তখন এক কামরা আর একটা বাথরুম নিয়ে থাকতাম শংকর এলাকায়, যার ভাড়া ছিল তিনশো টাকা।)

আমার পিছন থেকে একটি পরিচিত কাশি শুনতে পাই। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করেন, "কি কোন সমস্যা?"
ভাবটা এমন যেন উনি আমাদের আলাপের কোন কিছুই শোনেননি।
"আমার ট্রাভেল-ট্যাক্স দেওয়া হয়নি। এখন তো দেখি বেশ অনেক টাকা।"
"কত লাগবে?"
"সাড়ে সাতশো টাকা।"
"আমি দিচ্ছি। কোন অসুবিধা নেই।"

পকেট থেকে বাবা দুটো পাঁচশো টাকার নোট বের করে আমার হাতে দেন। আমার মনের ভুলও হতে পারে, কিন্তু কেন জানিনে আমার মনে হোল বাবার মুখে একটি অতি সূক্ষ্ম হাসি দেখেছিলাম সেদিন আমি। বাবা যেন বলছেন, "আমি জিতলাম।"
সেদিন নিজের উপর রাগ হয়েছিল। টাকাটা আমার কাছে ছিলনা কেন? কেন এই ব্যাপারটি আগে থেকে চিন্তা করিনি?

আজ মনে হয়, বাবার সেদিন সেই হাসিটি জেতার হাসি ছিলনা। বাবা সেদিন খুশী হয়েছিলেন তার অকাটমূর্খ এই ছেলেটির পাশে দাঁড়াতে পেরে। বাবারা কোনদিনই জিততে চান না, তারা বরং দেখতে চান যে তার সন্তানেরা জিতেছে। এই ধ্রুব সত্যটি বোঝার জন্যে আমাকে আরো অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। যেদিন আমি আমার নবজাত শিশুকন্যাটিকে প্রথম কোলে নেই, সেদিন বিদ্যুৎচমকের মতো আমার চোখের সামনের মিথ্যে অহংকারের পর্দাটি চিরকালের জন্য মিলিয়ে যায়।

এজন্যেই কথায় বলে, গাধারা চিরকালই পানি ঘোলা করে তারপর খায়।

৩.
২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ৯:৪২

আমেরিকায় চলে আসবার পর শুরু হোল নতুন জীবন। পরিচিত কেউ নেই। পরিবার-পরিজন নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই। তাহলে আছে কি? আছে শুধু পড়াশুনা, আছে পরীক্ষা, আছে টার্ম-পেপার। এককথায় হাবিয়া দোজখ।
আমেরিকার যে জায়গাটিতে আমি পড়তে গিয়েছিলাম, সে জায়গাটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য ভুবনবিখ্যাত। কি নেই সেখানে? নীল সমুদ্র আর আকাশছোঁয়া পর্বতরাজি দেখে টুরিস্টরা আহা-উহু করে। সেখানকার মানুষেরাও খুব ভাল। হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল। বিশ্ববিদ্যালয়েও পরিচয় হোল আরো অনেকের সাথে। ভারতের মনজুনাথ, নেপালের নবরাজ, শ্রীলংকার টিসা, আমেরিকার ক্রুস, আরও কত জন।

তবুও মন ভরেনা আমার। ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কি যেন নেই। একা একা ঘরে বসে বাইরের দিকে উদাস তাকিয়ে থাকি। কি করবো তাহলে?

একজন বুদ্ধি দিল, "একটা প্রেম করে ফ্যাল্। প্রেমিকার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে মন খারাপ করার সময় পাবিনে।"
প্রেম? আমি করবো? মনে পড়ে বহু বছর আগে করা হিটলার সাহেবের সতর্কবাণী। তিনি মাকে বলছেন, "মনে রেখো, আমি কিন্তু তোমার ছেলের কোন রকম বেয়াদবী সহ্য করবো না।" (পর্ব-৯)। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠি। তার চেয়ে থার্মোডায়নামিক্স অনেক ভাল।
যেহেতু আমি স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গিয়েছিলাম, সে জন্য আমাকে পড়ার সাথে সাথে আর কোন কাজ করতে হয়নি। মাঝেমাঝে অন্যদের কাজ করার গল্প শুনে বড় খারাপ লাগে। আহা- কত কষ্ট করে লোকেরা পড়াশুনা করে। আর আমি কিনা খামাখা উলটো-পালটা চিন্তা করে সময় নষ্ট করছি। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

দু' বছর পর সামারে দেশে গেলাম বেড়াতে। ভাই-বোনেরা সবসময় ঘিরে রাখে আমাকে। এদের ফেলে আবার কিভাবে ফিরে যাবো আমেরিকায়? এমনি বাড়ীতে একটা ঢেউ উঠলো। দেশে এলিই যখন বিয়েটা করেই ফ্যাল। আবার কবে দেশে আসবি তার কি কোন ঠিক আছে? আমি মুখে কোন কিছু বলিনা।
একদিন মা এসে জিজ্ঞেস করলো, "তোর কি পছন্দের কোন মেয়ে আছে? তোর বাবা জিজ্ঞেস করছিল। থাকলে বল। আমরা কথা-টথা বলি।"
একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? ভূতের মুখে রামনাম! যে বাবা আমাকে পইপই করে করে দিল যে তিনি কোনরকম "বেয়াদবী" সহ্য করবেন না (পর্ব-৯), আজি কিনা তিনি এসে জানতে চাইছেন আমার

পছন্দের কোন মেয়ে আছে কিনা। রাগে আমার মুখে কথা আটকে যায়। শুধু মাথা নাড়ি। আমার কোন পছন্দ নেই। তোমরা যা ভাল মনে করো, তাকেই বিয়ে করবো।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই বিয়েটা হয়েই গেল। নদীর নামের একটি মেয়ের সাথে। বিয়ের সাতদিন পর আমরা উড়াল দিলাম আমেরিকার উদ্দেশ্যে।

তারপর কাটলো আরো কয়েকটি বছর। একদিন আমাদের ঘরে এলো একটি শিশুকন্যা। তাকে নিয়ে পুতুল খেলি আমরা দুজন। শিশুটি আমাদের পাগলামো দেখে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় ভাবে, আমাকে তুমি এ পাগলের ঘরে পাঠালে, খোদা?

এর মধ্যে একদিন দেশ থেকে খবর আসে। খবর শুনে আমার বুক শুকিয়ে যায়। মহামতি হিটলার আমাদেরকে দেখতে আমেরিকা আসছেন।

সর্বনাশ! যার নাগাল এর বাইরে যাবার জন্যে এই সাতসমুদ্দুর তেরনদী পাড়ি দিলাম, তিনিই কিনা চলে আসছেন আমাদের কাছে। তাকে আমাদের এই ছোট্ট ঘরে কোথায় বসতে দেব? কি খাওয়াবো? কি কথা বলবো?
কিছুই করার নেই। তার ভিসা নেওয়া, টিকিট করা শেষ। এখন শুধু ফাঁসীর দড়ি ধরে টান দেওয়াটা বাকী। দুরুদুরু বক্ষে আমরা দিন গুনি শুধু।
বাবা যেদিন এলেন, সেদিন আমি একাই গেলাম এয়ারপোর্টে। ছাত্র মানুষ আমি। বৌকে বেবী সিটিং করতে হয়। তা না হলে সংসার চলেনা। অতএব তাকে বাসাতেই থাকতে হয়।
বাবার কপাল খারাপ যে তাকে ইমিগ্রেশনে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল। এতটা দূরের পথ অতিক্রম করে এসে শেষের এই বিলম্বটুকু তাকে ভয়াবহ রকমের খেপিয়ে তুলেছিল। যাই হোক যখন তিনি ফাইন্যালি সে গেরো থেকে বেরোলেন, তখন আমিও একটু ঘাবড়ে গেছি।

বাইরে বেরিয়ে আদাব-সালামের পর্ব শেষ হলে বাবা বললেন, "একটা ব্যাপার এখনই পরিষ্কার করে ফেলা উচিৎ। আমি কিন্তু তোমাদেরকে দেখতে আসিনি।"
"তাহলে?"
"আমি আমার নাতনীকে দেখতে এসেছি। তোমাদের চেহারা আমি অনেক দেখেছি, আর না দেখলেও চলবে। কিন্তু আমার নাতনীটি কই?"
"ওরা তো বাসায়, বাবা।"
"তাহলে আর এই এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কি? চলো- বাসায় যাই।"

আমরা তখন এক বেডরুমের একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। শুনশান এক রোদেলা দুপুরে বাসায় ফিরলাম আমরা দুজন। লিভিং রুমে তিনটে বেবী সিটিং এর বাচ্চা ঘুমাচ্ছে। তাদেরকে দেখেই বাবার তো চোখ চড়কগাছ।
"আমরাতো শুনেছি তোমার একটা মেয়ে হয়েছে। এখানে তিনটে বাচ্চা কেন?"
আমি মিনমিন করে বলি, "স্কলারশিপের পয়সায় সংসার চলেনা বলে ও বাসায় বসে বেবী সিটিং করে।"
বাবার ভুরুতে ভাঁজ পড়লো। "হুমম! ঐটাতো বলোনি কখনো। তার এর মধ্যে আমার নাতনী কোনটি?"
আমার দুরবস্থা দেখে স্ত্রী এগিয়ে আসে। "বাবা- আপনি বসুন তো। আপনার নাতনী এখানে নেই। সে শোবার ঘরে ঘুমুচ্ছে। আমি নিয়ে আসছি।"

ঘুমন্ত শিশুটিকে শোবার ঘরে থেকে এনে সে তাকে বাবার কোলে দেয়। কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার। মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয় বাবার কপালের ভাঁজ, ভুরুর কুঞ্চন এবং গলার বাজখাঁই আওয়াজ। তিনি অপার মমতায় শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তার হৃদয়ের উষ্ণতায় শিশুটির ঘুম ভেংগে যায়। বাবাকে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষন, তারপর খলখলিয়ে হেসে ওঠে। বাবাও হাসেন। "বাহ্-এতো দেখি আমাকে চিনে ফেলেছে। এইটুকু বাচ্চার এত বুদ্ধি! মাশাল্লাহ্!"

আমরা দুজন বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। বাবার মুখে হাসি? অমাবস্যায় পূর্ণিমা চাঁদ? এও কি সম্ভব?

রাতের খাবার খাওয়ার পর আমার স্ত্রী শোবার ঘরে মেয়েকে খাওয়াচ্ছে। বাবা আর আমি তখন একটু একলা। এই ফাঁকে বাবা তার স্বভাবসুলভ গম্ভীর গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি হচ্ছে?"
আমি সে কথা শুনে সাত হাত পানির নীচে। "কোনটা কি হচ্ছে?"
"তুমি যে বৌমাকে দিয়ে বেবী সিটিং এর কাজ করাচ্ছো, সেটা। আমিতো দেশে ফিরে গিয়ে বেয়াই সাহেবকে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবোনা। লোকে বিদেশ আসে ভাল থাকবার জন্যে, খারাপ থাকার জন্যে না। বৌমাদের বাড়ীর অবস্থা কি রকম তাতো তুমি জানোই। এ জাতীয় কাজ কোনদিন জীবনে সে করেছে?"
"তা আমি কি করবো? আমি ছাত্র মানুষ, আর আমার কাজ করার কোন পারমিশন নেই। সংসার চালাতে তো হবে। ও কাজ না করলে তাহলে তো আমাকে রাতের বেলা চুরি করতে যেতে হয়। তাই কি করবো?"
বাবা এ উত্তর শুনে গুম হয়ে গেলেন।
আমি আবার বলি, "তুমি এটা নিয়ে শুধু শুধু মন খারাপ করছো। আর তোমার বেয়াই সাহেবকে নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তিনি জানেন ব্যাপারটা।"
"ও-তোমার গুণের ব্যাপারটা অলরেডী জানিয়ে দিয়েছো। বেশ-বেশ।"

আমাদের ওখানে বাবা দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। কারণটা আমার জানা। তিনি হচ্ছেন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা স্বভাবের লোক। বিনা কাজে একটা দিন পার করা তার পক্ষে নরকযন্ত্রনা ভোগ করার মতো। একদিন খাবার সময় দেখলাম বলছেন, "আমিতো আর বিদেশ দেখতে আসিনি। আমি এসেছিলাম আমার নাতনীটিকে দেখতে। সে দেখা তো হয়েই গেছে, আর খামাখা এখানে থেকে লাভ কি?"

এমনি সময়ে হঠাৎ তিনি আমায় বললেন, "ভালো কথা-তুমি এখানে যার আন্ডারে কাজ করছো, সেই প্রফেসরের সাথে দেখা করা যাবে?"
আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। প্রফেসরের সাথে দেখা করার কারণটি কি? আমি কি এখনো সেই বাচ্চা আছি নাকি যে আমার টিচারের সাথে দেখা করতে হবে?
"আমি কালকে উনাকে জিজ্ঞেস করবো।"

আমার থিসিস গুরুটি ব্রিটিশ। বয়েস বেশী ছিলনা, স্বভাবও বেশী সুবিধার ছিলনা। আমাদের আশপাশের যাবতীয় প্রফেসরদের সাথে তার আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ছিল। তাকে গিয়ে বললাম আমার পিতাজীর খায়েশের কথা। এবং সেই সাথে তাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বারবার বললাম, "আমি জানি যে তুমি খুব ব্যস্ত মানুষ। সময় দিতে না পারলেও কোন সমস্যা নেই।"
কে শোনে কার কথা। সে ব্যাটা বলে, "তুমি তোমার বাবাকে অবশ্যই নিয়ে আসবে। পারলে আজকে বিকেলেই নিয়ে এসো। প্রথমে ল্যাব-ট্যাব গুলো ঘুরিয়ে দেখাও, তারপর তাকে আমার অফিসে নিয়ে এসো।"
মাথায় হইলো বজ্রাঘাত। এবার মান-সম্মান যেটুকু ছিল, সেটুকুও আর থাকবেনা মনে হয়। নেংটি ধরে টান দিলে আর কিছু কি অবশিষ্ট থাকে?

৪.
০১ লা মার্চ, ২০০৮ রাত ১২:৩৮

বাবা ল্যাব দেখতে আগ্রহী হলেন না মোটেও। "ওসব আমি কিই আর বুঝবো। তার চেয়ে চলো তোমার এ্যাডভাইসারের কাছে যাই।"

কি আর করা? নিয়ে গেলাম তাকে গুরুর কাছে। দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তারপর কেবল আমরা চেয়ারে একটু বসেছি, অমনি বাবা গুরুকে প্রশ্ন করলেন, "তা আমার ছেলেটা কাজকর্ম কেমন করছে? পরীক্ষাগুলোর রেজাল্ট ভাল হচ্ছে তো?"

আমি সে প্রশ্নে মনে মনে প্রমাদ গুনি। কেননা আমি তখন সবে বছর খানেক তার ল্যাবে কাজ শুরু করেছি। অভিজ্ঞজন মাত্রেই জানেন, গবেষনার প্রথম বছরে কাজ তেমন কিছুই হয়না। টেস্টটিউব নাড়াচাড়া করা আর যন্ত্রপাতির সাথে চিন-পরিচয় হওয়া, এইটুকুই। আর আমি এর মধ্যে যা দু একটা এক্সপেরিমেন্টের অপচেষ্টা করেছি, তার কোনটারই ফল ভাল হয়নি। অতএব প্রাপ্তির খাতায় বিরাট শূন্য।

বাবার প্রশ্ন শুনে আমার ব্রিটিশ গুরু হাসেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটি কুটিল হাসি হেসে বললেন, "তুমি তাহলে বাইরে যাও। তোমাকে নিয়েই যখন আলোচনা হচ্ছে, তখন সেটাতো আর তোমার সামনে করা যায়না। আর যাওয়ার সময় দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে যেও।"

ঘরের বাইরে এসে মনে মনে ব্যাটাচ্ছেলেকে ঝেড়ে গালি দিলাম মিনিট পাঁচেক ধরে। ও যে আমার কি গুনকীর্তন করবে, তাতো ভালই বুঝতে পারছি। আর আমার পিতাজীও আমার সাফাই গাইবেন না, সেটাতো আমি ভাল করেই জানি।

মিনিট পনেরো পরে দরজা খুললো। বাবার মুখ গম্ভীর। "চলো, বাড়ী যাই এবার।"
গাড়ীতে বসে কৌতুহল আর চেপে রাখতে পারিনা। বাবাকে জিজ্ঞেস করি, "কি বললো প্রফেসর আমার নামে?"
বাবা উত্তর দিলেন, "হুমম্।"
সেই "হুমম্" এর ব্যাখ্যা চাইবার সাহস হোলনা আমার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পড়াশুনাটা মন দিয়ে করো। আর প্রফেসরের কথা মেনে চলো।"

বাবা এর দুদিন পরই চলে গেলেন। আমেরিকার এই কর্মহীন জীবন তার আর ভাল লাগছিলনা।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। আস্তে আস্তে গবেষণা এগোয়। টুকটুক করে জমা হয় ডেটা। থিসিস লেখার কাজ চলছে পাশাপাশি। থিসিস ডিফেনস করার কয়েকদিন আগে গুরুজী ডেকে পাঠালেন তার ঘরে। থিসিসের ফাইনাল কারেকশনটি আমার হাতে দিলেন। তারপর বললেন, "বসো-কথা আছে।"
বসলাম। আমাকে কি চাপ দিয়ে আরো কিছু কাজ করাবে নাকি?
"তোমার বাবা কেমন আছেন?"
"ভালই। এইতো কয়েকদিন আগেই ফোনে কথা হয়েছে।" (এটি ডাহা মিথ্যে কথা, কথা বলেছি মায়ের সাথে।)
গুরু একটু আনমনা হয়ে গেলেন। "ইন্টারেস্টিং ম্যান ইজ ইওর ড্যাড। তার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তুমি কি জানো-সেদিন আমাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল?"
"না।"
"উনি আমাকে বলেছিলেন যে তোমাদের কালচারে নাকি বাবা-মায়ের পরেই শিক্ষকের স্থান। উনি বলেছিলেন যেহেতু উনারা কেউ এখানে নেই, তাই তাদের অবর্তমানে আমিই যেন তোমার পিতামাতার দায়িত্বটি পালন করি। উনার মতে তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গাধা, তাই আমার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তোমাকে সদুপদেশ দেওয়া, আর তোমাকে ঠিকমতো গাইড করা। তা না হলে নাকি তোমার পি এইচ ডি নাকি

জীবনেও শেষ হবে না। আশাকরি আমি সে কাজে ব্যর্থ হইনি। এখন তুমি আমার ল্যাব ছেড়ে পাড়ি জমাবে অন্য কোন এক ল্যাবে। আমার দায়িত্ব তাই শেষ হোল। উনাকে তুমি আমার শুভকামনা দিও।"

আমি কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি। বাবার স্নেহময় হাতের ছোঁয়া যেন আমার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে গেল। সাত সমুদ্দুর তের নদী পাড়ি দিয়ে অতি গোপনে তিনি এই আমেরিকাতে আমার জন্যে রক্ষাকবচ বপন করে গেছেন। আমি তার কিছুই টের পাইনি।

আর দশটা জিনিসের মতোই তিনি এবারও তার মায়াময় হৃদয়স্পন্দনটিকে আবৃত করে রেখেছিলেন তার চিরাচরিত কঠিন মোড়কে। যেন কেউ জানতে না পারে। যেন কেউ টের না পায়।

তারপর কেটে যায় আরো অনেকগুলো বছর। আস্তে আস্তে দেশের সাথে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। ভিন্ন দেশ থিতু হয়ে বসি।

মাঝে মাঝে মায়ের সাথে কথা হয় ফোনে। অতি কৌশলে এমন সময়ে ফোন করি যখন বাবা বাড়ীতে থাকেন না। তারপরও দু এক সময়ে হঠাৎ তার গলা ভেসে টেলিফোনের তারে। সে আওয়াজে মেরুদন্ড দিয়ে বয়ে যায় ভয়ের শীতল স্রোত। কোন কথা না বলে আস্তে ফোন নামিয়ে রাখি।

একদিন দেশ থেকে ছোটভাই মিনারের (পর্ব-১২) ফোন আসে।
"দাদা- বাবার শরীর ভালনা।"
"কেন? কি হয়েছে?"
"ডাক্তার বলছেন কিডনীর সমস্যা। বেশ সিরিয়াস। ওষুধে কাজ হবে না। ডায়ালিসিস করতে হবে নাকি।"
"তাই নাকি?"
"হ্যাঁ।"

কাজের মধ্যে ডুবে থাকার কারণে ঠিকমতো খোঁজখবর নেওয়া হয়না। আবার মিনারের ফোন আসে। বাবার অবস্থার অবনতি হয়েছে অনেক। রক্তে ক্রিয়াটিনিন আর এ্যামোনিয়ার পরিমান বেড়েছে আশংকাজনক ভাবে। তার ফল হিসেবে বাবা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফোন রেখে চুপ করে বসে থাকি। কেন জানিনে মনে হয়, বাবা যেন ডাকছেন আমাকে। "কতকাল দেখিনি তোকে। কেমন আছিস জানতে বড্ড ইচ্ছে করছে।"

নাড়িতে টান পড়ে আমার। সে ডাক অগ্রাহ্য করতে পারিনে।

দেশে ফিরে হাসপাতালে অচেতন অবস্থায় শুয়ে থাকা বাবাকে দেখে চমকে উঠি। বুকের মধ্যে একটা জোর ধাক্কা খাই। এ আমি কাকে দেখছি? এইই কি আমাদের পরিচিত দোর্দন্ডপ্রতাপ মানুষটি? ছেলেবেলায় পড়া "মহাভারত" এর ভীষ্মের মতো মনে হয় তাকে। যেন শরশয্যায় শুয়ে আছেন। প্রতীক্ষা করছেন দক্ষিনায়নের।

ডাক্তারেরা যা বললেন, সাদা বাংলায় তার অর্থ হচ্ছে যে বাবার দুটো কিডনীই প্র্যাকটিকালি অকেজো হয়ে গেছে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে কাজের মোহে ডুবে থাকা এই মানুষটি সবচেয়ে বেশী অগ্রাহ্য করেছিলেন তার নিজের শরীরটিকেই। বাদ বাকী জীবনটা তাকে ডায়ালিসিস এর সাহায্য নিয়েই চলতে হবে।

সেই দিনগুলোর কথা এখনো স্মৃতিতে উজ্জ্বল। আমি সারাটা দিন ক্লিনিকে বাবার বিছানার পাশে বসে থাকি। তাকিয়ে থাকি তার দিকে। ইতিমধ্যে বার কয়েক ডায়ালিসিস করা হয়েছে। তাতে তার অবস্থার আহামরি কোন উন্নতি হয়নি।

বাবা কি জানেন যে আমি এসেছি? তিনি কি টের পাচ্ছেন যে তার গাধা সন্তানটি তার শিয়রের পাশে বসে আছে? মাত্র অল্প ক দিনের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেনসে পেপার পড়তে হবে ফিরে গিয়েই। তাই বেশীদিন থাকতে পারবোনা। আমি কি বাবার সাথে কথা বলতে পারবো? তিনি কি সুস্থ হয়ে উঠবেন?

ঈশ্বর- তুমি আমার বাবার জ্ঞান ফিরিয়ে দাও।

আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর মেলেনা। ছোট ভাই বোনেরা মুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।
"দাদা- কি হবে? বাবা ভাল হবে তো?"
তাদের প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিনা। যতটুকু বিজ্ঞান শিখেছি, তার আলকে মনে হয় বাবার অবস্থা খুব ভাল না।

যেদিন চলে আসবো, তার আগের দিন দুপুর বেলা। ক্লিনিকে আর কেউ নেই। শুধু আমি একা বসে আছি বাবার বিছানার পাশে। তখন বাবাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। শুধু সেই যন্ত্রটির মৃদু শব্দ ছাড়া আর সব কিছু নিঃশব্দ। পর্দাগুলো টেনে দেওয়া হয়েছে বলে ঘরের ভিতরটিতে অতি অল্প আলো। আমি একদৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

এমন সময় আমাকে অবাক করে দিয়ে বাবা চোখ মেললেন। বড় বড় চোখে তাকালেন আমার দিকে।
আমি বাবার উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম, "বাবা- বাবা।"
বাবা মাথা নেড়ে সাড়া দিলেন যেন।
"তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো?"
"হুঁ।"
"বলোতো আমি তোমার কে হই?"
"ছেলে।"
আনন্দে, উত্তেজনায় আমার চোখে জল আসে। আমি বাবার হাতটি জড়িয়ে ধরি। বাবা কি আমার হাতের স্পর্শ টের পান? তা না হলে তার মুখে কেন আমি এক চিলতে হাসি দেখতে পেলাম?

সেদিন স্বল্পালোকিত ঘরটিতে একটি অহংকারী, মূর্খ এবং অযোগ্য সন্তান তার বাবার কাছে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল। সব ভয়, রাগ, অভিমান ভুলে ছেলেটি সেদিন সূর্য্যপ্রতিম মানুষটির খুব কাছটিতে চলে এসেছিল। সেদিন ছেলেটি বুঝতে পেরেছিল, এতদিন ধরে তারা সবাই একটি বিরাট ভুল করে এসেছে। মানুষটির কাছে এলে তারা একটি অতি কোমল হৃদয়কে দেখতে পেতো।

কতক্ষন ধরে চলেছিল এই কথোপকথন? তার হিসেব রাখেনি কেউ। এক পল, নাকি সহস্র শতাব্দী?

পরদিন খুব ভোরে প্লেনে ওঠার আগে মিনারের সাথে ফোনে কথা হোল।
"মিনার, বাবা এখন কেমন?"
"ভালই দাদা। তুমি চিন্তা করোনা। ভালভাবে যাও। পৌঁছে একটা ফোন দিও।"

অতি শয়তান ভাইটি সেদিন দক্ষতার সাথে আমার কাছে একটি বড় সত্যকে গোপন করেছিল। বাবা তার আধা ঘন্টা আগে মারা গেছেন। কান্নাকে বুকের মধ্যে সে লুকিয়ে রেখেছিল যেন আমি চলে যেতে পারি। কনফারেনসে আমার যে পেপার পড়তে হবে।

চিরটা কাল ওরা এই কাজটিই করে এসেছে। আমি শুধু স্বার্থপরের মতো নিয়েই গেছি। কোনদিন কিছু দেবার সুযোগ পাইনি।

কিছুকাল আগের কথা। এখানে মানে আমেরিকাতে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে দেখছিলাম তার মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তোলা ভিডিও। হঠাৎ করে একজনকে দেখে চমকে উঠি। কে এই লোকটি? আঙুল

উঁচিয়ে কথা বলছে? কে এই লোকটি যার ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে? কে এই লোকটি যার কথা বলার সময়ে চোখ জোড়া নেচে উঠছে?

বন্ধুটি আমার অখন্ড মনোযোগ দেখে ঠাট্টা করলো, "কি ব্যাপার নিজের চেহারা দেখে একদম মোহিত হয়ে গেলেন মনে হচ্ছে। "

এই লোকটি আমি? আশ্চর্য্য! বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার।

সেদিন সবাই ঘুমিয়ে গেলে আমি পা টিপে টিপে ক্লোজেট থেকে বাবার পুরনো শালটি বের করি। তারপর সেটিকে গায়ে জড়িয়ে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়াই। সামনের দিকে তাকিয়ে আবার আশ্চর্য্য হই।

আয়নার ওপাশে দাঁড়িয়ে ও কে? কুঞ্চিত ভুরু, মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল, কে ওই মানুষটি? মহামতি হিটলার?

জীবনের একটি দীর্ঘ সময় ধরে আমায় পালাতে চেয়েছি বাবার কাছ থেকে। রহস্যময় বিধাতা আজ সেই বাবাকে আমার মুখের উপর বসিয়ে দিলেন। দীর্ঘ দৌড় শেষে আমি দেখতে পেলাম যে আমি শেষমেশ আমার উৎসেই ফিরে এসেছি। আয়নাতে জনাব হিটলার একটু মুচকি হাসেন। "আমিই কি তাহলে জিতলাম?"

আশ্চর্য্যের ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে হেরে গিয়ে আমার বিন্দুমাত্র রাগ হয়না। আমার ভিতরটাতে খেলা করে একঝাঁক সোনালী আনন্দ। আমি আয়নার মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলি, "থ্যাংক ইউ, বাবা। আই এ্যাম গ্লাড দ্যাট ইউ কেইম ব্যাক। ওয়েলকাম টু ইওর নিউ হোম। "

বাথরুমের আলো নিভিয়ে দিয়ে আমি বিছানায় ফিরে যাই। আজ আমি বড় সুখী একজন মানুষ, বড় তৃপ্ত একজন মানুষ। বাবা আমার সাথেই আছেন। মহামতি হিটলার এখন আমার ভিতরেই বসবাস করেন।

মনে পড়ে প্রিয় কবিতার একটি পংক্তি।

"যতদূর গেলে পলায়ন হয়, ততদূর কেউ আর পারেনা যেতে। "

কি ভয়ানক সত্যি কথা!

http://www.somewhereinblog.net/blog/nirbasitoblog/28773139

কি হও তুমি ওর?

কালবেলা
১৩ ই ডিসেম্বর, ২০০৭ রাত ১১: ৩৪

\- কি করো?
= স্বপ্ন দেখি।
\- কি দেখ?
= মরে গেছি।
\- শাট- আপ
= হাহ্...হাহ্......
\- চুপ করো।
= চিরদিনই কি বাঁচব বল?
\- মৃত্য নিয়ে স্বপ্ন হয় না।
= কে বলেছে? শোন......তবে

আমি সেদিন মরে গেছি,
আমার নিথর শরীরটা পড়ে আছে মাটিতে
আমার চোখগুলো বুজে আছে গভীর মগ্নতায়,
যেন দিব্য চোখে কি দেখছি!
তোমার কাছে পৌঁছুল সে সংবাদ।
আমাদের প্রেম ছিল জানতো অনেকেই
তাদেরই একজন ,
তোমায় খবর দিল
'ও মারা গেছ' '।
তোমার এলোচুল আরো এলোপাথাড়ি
ভাবলে- এ হয়ত ফাঁকি।
চকিতে তাকালে বেদীর নিচে
নিভেছে প্রদীপ ভাতি।
তুমি শংকায় উঠলে ভাসি,
আর
মৃত আমি'টা ?
শুধু দেখি আর হাসি।

\- চুপ কর তো ! ?
= আরে শোনই না।

তুমি অবিশ্বাসী চোখে সেল ফোন খুঁজছ,
নাম্বার খুঁজে পেতে সময় কিছুটা বেশিই লাগল।
কতো দি- ই- ই- ই- ন ফোন করনা ,
লাগতেই পারে।
দুরু দুরু বুকে রিং করলে
শুনতে পেলে ' সরি সাব্সক্রাইবার ইজ নট
অ্যাভাইল্এবল'
হা...হা. . . এর বদলে-
'সরি সাবস্ক্রাইবার ইজ ডেড'
বললে ভালো হত না!

\- অসহ্য। থামবে তুমি?
= হা...হা......কষ্ট হচ্ছে? আরে পাগলি এটা তো স্বপ্ন?

যাই হোক,
অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করলে
ত্রস্ত পায়ে এসে দাড়ালে আমার শবযাত্রার পাশে
প্রচন্ড পাগলের মত লাগছে।
আমি দেখতে পেলাম
কাউকে কিছু বলছ না তুমি,
অবিরত মুছে চলেছ চোখ
দূরে দাঁড়িয়ে-
সন্তর্পনে হয়ত নিজেকে গোপনই রাখছ
কেউ না বলে বসে- ' কি হও তুমি ওর'?

= কি সুন্দর দৃশ্যটা বলোতো।
\- তোমার মাথা!

http://www.somewhereinblog.net/blog/kalbelablog/28751413

পাথরের গান

রণদীপম বসু
০১ লা এপ্রিল, ২০০৮ রাত ১০:৩২

চোখের মুদ্রায় তুমি যতই আকাশ আঁকো
আমি জানি ওখানে সাগর ;
ভ্রান্তনীল আকাশের ফাঁদে যে পাখিরা
ঝাপ দেবে শূন্যতার ক্ষুধায়,
জানবে না
একে একে ডুবে যাবে ওরা।

ভেসে যাওয়া পালকের স্রোতে
ডুবুরি মাছেরা যদি জেনে যায়-
ওটা তো সাগরও নয়
জলল কল্পনায় গড়া নীল-বিভ্রম শুধু !
চোখের কোটরে রাখা নীল দুই পাথরের
প্রাণহীন চকমকি ঘষে
কী হবে আগুন জ্বেলে আর
তুমিই পুড়বে তাতে।

মাটির জরায়ু ফুঁড়ে শিশুনীল বৃক্ষের
যে কুঁড়ি উঁকি দেবে সবুজ আশায়
ওখানে যে জরা ক্ষয় প্লাবন খরায় নামে
অনার্য আদিম সুর
ঠিকানা গাঁড়বো বলে
বুকের জমিন খুঁড়ে বেঁধেছি নতুন পাড়-
ইচ্ছে হয়
তুমিও দিতে পারো অবাধ সাঁতার।

(০১/০৪/২০০৮)

অপেক্ষা তাহার জন্য

সুলতানা শিরীন সাজি
১৬ ই জানুয়ারি, ২০০৮ রাত ৯:৫৫

যখন সূর্য্যটা পশ্চিম আকাশে
ডুবতে শুরু করেছে
তখন জাহাজের ডেকে বসে
আকাশের দিকে তাকিয়েছিলো সে।

সমুদ্রের পানিতে ভেসে যাচ্ছিলো
ওর চিন্তার ছাঁয়ারা।
কথাহীন হয়ে বসে ছিলো ও অনেকক্ষন।
এবার সমুদ্রে এসে ওর এমন হচ্ছে. . .
কাজ শেষ হলে কেবিন এ এসে বিশ্রাম।
বাকি সময়টুকু ডেকে বসে
পানির দিকে তাকিয়ে ভাবনাদের ভেলা ভাসানো।
আকাশের মেঘগুলো ছুঁয়ে দিয়ে
ইচ্ছের তরী ভাসানো।

অনেকদিন হয়ে গেলো।
মাটির পৃথিবী ছেড়ে পানির এই জীবনযাপন।
শেষ যেবার মাটির পৃথিবীতে ছিলো. . . . .
ওর প্রিয়তমা নারীর সাথে দেখা হয়েছিলো।
মেহেদীর কারুকাজ ছিলো তার দু' হাতে,
আঙুলে হীরার দ্যুতি।
ও বলে এসেছিলো আসবে।
ছয়টামাস পর ই।

আজকের সূর্য্যটা ডুবলো
অপেক্ষার দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে।
কাল ভোরে জাহাজটা যখন
তীরে পৌছুবে. . . . . . .
হাতে একগুচ্ছ সাদা গন্ধরাজ নিয়ে
পড়নে ঢাকার তাঁতের লাল শাড়ী,
কপালে সূর্য্য লাল টিপ. . . .
ওর জন্য বুকের মধ্যে টিপ টিপ প্রতিক্ষা নিয়ে
অপেক্ষার দীর্ঘএক পথ হয়ে আছে সে. . . .
ওর ভালোবাসার মানস প্রতিমা।

গুনে গুনে বিশটা চিঠি এসেছে ওর কাছ থেকে।
নানান বন্দর ঘুরে।
কথারা এসেছে মুখর বলাকা হয়ে।
সেই সব চিঠি অজস্রবার পড়েছে ও।

মানুষের বুকের মধ্যে কথার পায়রা থাকে।
মানুষের চোখের মধ্যে সমুদ্রের বিশাল নীল
থাকে।
মানুষের ঠোঁটের ভাঁজে সীমাহীন সৌরভ থাকে।
মানুষের কানের লতিতে দারুন উষ্ণতা থাকে।
মানুষের দু" হাতের মধ্যে পরম বন্ধুত্ব থাকে।
মানুষের পুরো আমিত্ব জুড়ে কত মহাদেশ
থাকে. . .
এই দারুন মেয়েটার সাথে দেখা না হলে ওর
জানা হতোনা।
জানা হতোনা ভালোবাসার রাজ্যটা এত সুন্দর।
আজকের সূর্য্যটা ডোবার সাথে সাথে নিজের
মধ্যে
দারুন একটা অস্হিরতা অনুভব করে ও।
অপেক্ষার শেষ রাতটা আজর্নির্ঘুম কাটবে ওর।
ও নিশ্চিত জানে . .
ওর প্রিয় মানুষটাও আজএকবার ও
চোখের পাতা বুজবেনা. .
কাল সকালে ওরা একসাথে সূর্য্য ওঠা দেখবে
হাতে হাত রেখে. . . . . . সমুদ্রের কিনারায়।

(আজকের আনন্দর দিনে সবাইকে সবাইকে
শুভেচ্ছা. . . .)

http://www.somewhereinblog.net/blog/sultanashirinshaziblog/28761527

স্বার্থপর আমি

রাশেদ
১২ ই নভেম্বর, ২০০৭ সন্ধ্যা ৭: ৪৪

ভাল লাগে শুধু তোমার সাথে কথা বলতে
ইচ্ছে করে
তোমার পানে তাকিয়ে কাটিয়ে দেই অনন্তকাল
তুমি শুধু আমার

ভাল লাগে শুধু তোমার মৃদু গন্ধ নিতে
ইচ্ছে করে
তোমাকে ঘিরে রাখব ভালোবাসার বলয়ে
তুমি শুধু আমার

ভাল লাগে তোমার পাশে বসে থাকার মুহূর্তগুলো
ইচ্ছে করে
তোমার টোল পড়া গালে শুধু আমার অধিকার প্রমাণে
তুমি শুধু আমার

ভাল লাগে খুনশুটি করে কাটিয়ে দেয়া সময়গুলো
ইচ্ছে করে
তোমাকে আলতো ছুয়ে দিতে
তুমি শুধু আমার

http://www.somewhereinblog.net/blog/rashedsaysblog/28745026

বারবণিতার জবানবন্দী

মানব মানিক
০৫ ই মার্চ, ২০০৮ বিকাল ৫: ৫৬

মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন।
আমাকে সত্য বলার আদেশ দিয়েছেন
তাই সত্য বলব , শুনবেন ?

সেই ছোট্ট বেলায় পুতুল খেলার বয়সে
নেহাৎ মন্দ ছিলাম না
সবাই বলত আমি নাকি চাঁদকুমারী;
ঘোর আমানিশার রাতেও ফুলপরীরা
আমার কপোলে চুম দিয়ে যেত।
মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন
আমাকে নয়ন-মণি বলে জানবেন।

মাস গেলো দিন গড়িয়ে
কখন যেন ছোট্ট হাতে বাবার হাত ধরে
স্কুলে গেলাম মানুষ হতে ,
চারদিকে কেমন কানাঘুষো শুরু হলো
পাড়ার ছেলেরা আমাকে ইশারায় ডাকলেন ।
মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন
আমাকে কিশোরী বলে জানবেন।

বাড়িতে এসে মাকে বললাম ,
" মা, আমি দেখতে কেমন ?
দেখতে কি মালের মতন ?
মাতবর চাচা কেমন যেন আদর করলেন ! "
মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন
আমাকে নারী নয়, ভোগের দারুণ এক পণ্য বলে
জানবেন ।

মা আমার কথায় আঁচলে মুখ ঢাকলেন
"এমন কথা কাউকে বলো না ।"
কিন্তু আমার বাবা কথাটা ঠিকই শুনলেন ।
আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ হলো ;
চোখের জলে পুতুল ভাসলো
শহরতলীতে আমার বিয়ে দিলেন।
মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন
আমার বাবা সমাজে তাঁর সম্মান বাঁচালেন ।

শ্বশুর বাড়িতে আমার মাতাল স্বামী
আমাকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।
টাকার লোভ আর মদের নেশায়
বাসর ঘরে আমাকে অন্যের হাতে তুলে দিলেন।
হায় আমার সতীত্ব ! কোথায় হারালো নারীত্ব !
মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন
আমার স্বামীকে সুপুরুষ বলে চিনবেন।

কতরাত কাঁদলে তোমার ঘুম ভাঙ্গে
কতরাত প্রার্থনা করলে তোমার মন ভরে
হায় খোদা , হা ভগবান , হা ঈশ্বর !
কতদিন উপোস থাকলে তোমার দেখা মেলে ?
আমার কান্না কেউ শোনেনি
আমি নরক হতে আরো দূর দূর নরকে তলিয়ে
গেলাম. . . !
মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন
বিধাতাও যে পুরুষ ছিলেন . . . . ।

আমার মহুয়ার গন্ধে সকল পতঙ্গ ছুটে এলেন
ডাক্তার- কবিরাজ - ব্যবসায়ী
ছাত্র - পুলিশ থেকে বুদ্ধিজীবি,
সবাই আমাকে দারুণ উপোভোগ করলেন ।
মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন
তাঁদের কে সমাজের মাথা বলে চিনবেন।

আর তলিয়ে যাওয়া নয়
আর কান্নার মোহ নয়
আমাকে নারী নয় , মানুষ হতে হবে
প্রতিবাদ করলাম সকল অপবাদের
শহরতলীর অলিতে গলিতে প্রায় প্রতিরাতে
থানার দারোগা ভন্ডসমাজের লাশ খুজে পেলেন
,
মাফ করবেন মাননীয় বিচারক
আমার বেয়াদবী মাফ করবেন
সুশীল সমাজ আমাকে আজ বেশ্যা বলে
ডাকেন. . . . ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/ManobManikblog/28776650

‘‘অপমান’’

এরশাদ বাদশা
০৪ ঠা নভেম্বর, ২০০৭ রাত ১:৪০

দুপুরের কড়া রোদে ঝিম মেরে আছে গোটা শহর। রাস্তার পিচ গলে যাবার মতো গরম চারিদিকে। এই কড়া রোদের মধ্যেই লোকটা ফুটপাতের উপর পড়ে আছে মড়ার মতো। তালপাতার সেপাইয়ের মতো শরীর ওর। পরনে শতছিন্ন লুঙ্গি, গা উদোম। পায়ের পচন ধরা ঘা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, আর তারই লোভে মাছিরা ওর আশে-পাশে ভনভন শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। লোকটা খানিক চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিয়েছে, তাড়ানো যাচ্ছেনা ওগুলোকে।

ফুটপাত দিয়ে একটা-দুটো লোক যাচ্ছে, দয়া হলে আট আনা, এক টাকা দিচ্ছে। লোকটার সামনে একটা বাটি আছে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে হাত দিচ্ছে, হয়তো দেখছে কতো টাকা হলো। কেউ কেউ ওর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে হাত দিচ্ছে, দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য।
জায়গাটা এখন নির্জন, লোকজনের চলাচল নেই বললেই চলে। দুপুরের এ তালপড়া রোদে বাইরে বেরুনোর চেয়ে, ঘরের আরাম আশ্রয়ে থাকাকেই শ্রেয় মনে করছে হয়তো। তবে এ নির্জনতার অবসান হলো কিছুক্ষনের মধ্যেই।

ফুটপাতের উপর সুশ্রী চেহারার একটা মেয়ে এসে দাঁড়ালো। পরনে সবুজ রঙের সালোয়ার-কামিজ। কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ। বারবার ঘড়ি দেখছে মেয়েটা, কারো জন্য অপেক্ষা করছে হয়তো। প্রচন্ড গরমের মধ্যে দরদর করে ঘামছে মেয়েটা, হাতের রুমাল দিয়ে মোছেও কুলিয়ে উঠতে পারছেনা।

রাস্তার পাশে পানের দোকানে হিন্দি গান বাজছে। পুরোনো দিনের গান; ‘‘জওয়া হ্যায় মোহাব্বত, হাসি হ্যায় জমানা, লুটায়া হ্যায় দিলমে. . . . . . . ’’
দোকানের লাগোয়া বেঞ্চিতে তিনজন যুবক বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন গানের সাথে সাথে মাথা দোলাচ্ছে। অন্যজন, যার চেহারা মোটামুটি ভদ্র; সে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। অন্য দুজনের দিকে তাকালেই ভয় লাগে। একজন বেশ লম্বা, ঢ্যাঙা ধরনের, গালে লম্বা কাটা দাগ। অপরজনের মুখে অনেকগুলো ব্রনের দাগ, চোখ দুটি লাল টকটকে।
প্রথমে সেই দেখলো মেয়েটাকে। তারপর অন্য দুজনের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো-‘গান থামা, ওইদিকে দ্যাখ। ’
তিনজনেই ভালো করে দেখলো মেয়েটাকে। তারপর ঢ্যাঙা বলে উঠলো-‘ আরি! মাইয়াডাতো বেজায় সোন্দর!
জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো লাল চোখ, বললো-‘পাছাটা, ইস! মাইরি বলছি, খাসা একখান মাল! ’
‘তুই হালা মাইয়াগো খালি পাছায় দেহছ, ’ বললো ঢ্যাঙা, তারপর মেয়েটার দিকে লোলুপ দৃষ্টি হেনে বললো-‘ বুক দুটো দেখনা, গরমে বগলের তলা ঘামছে, ইস! না জানি আরো কি কি ঘামতেছে! ’
‘কিরে খোকা, ’ এবার তৃতীয়জনের দিকে তাকিয়ে বললো ঢ্যাঙা, ‘ তোর কিমুন মনে অয়, মালটা টেস্ট করা দরকার না?’
ওদের অশ্লীল এই আলাপে দারুন অস্বস্তি বোধ করছিলো ভদ্র চেহারা, ঢ্যাঙার কথায় একেবারে কুঁকড়ে গেলো ভয়ে। তাই দেখে হেসে উঠলো অন্য দুজন।
ভার্সিটি থেকে ফেরার পথে ওকে পাকড়াও করে ঢ্যাঙা ও লাল চোখ। প্রায় প্রতিদিনই এভাবে বিরক্ত করে। ব্যাপারটা প্রথমে শুরু হয় হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে, শেষ হয় ওর কাছ থেকে টাকা খসানোর মধ্যে দিয়ে। কখনো কখনো শয়তানীর শেষ সীমা করে ওরা। একদিন টাকা দিবেনা বলেছিলো সে, আর তাতেই ওরা ওর সাথে যা করে, সে কথা মনে করলে এখনো ভয়ে শিউরে উঠে ও। প্রথমে ওর পরনের সবকিছু খুলে নেয়, তারপর রাস্তার পাশে বসিয়ে রাখে একঘন্টা! শাসায়, কাউকে বললে একেবারে জানে মেরে

ফেলবে। সে এমনিতেই খুব ভীতু, তারউপর এইভাবে অপদস্থ হওয়ার পর ওদেরকে যমের মতো ভয় করে ও। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে রুখে দাঁড়ায়, পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলে ও দুটোকে। কিন্তু পারেনা, ইচ্ছেটা ইচ্ছেই থেকে যায়। সাহসের দারুণ অভাব ওর।

‘পরথম আমি, ’ বললো ঢ্যাঙা, ‘‘তারপর তোরা। ‘‘
‘‘আ . আমি, যা. . বোনা। ‘‘ মিনমিন করে বললো ভদ্র চেহারা।
‘‘কছ কিরে, ’’ বললো লাল চোখ, ‘‘হাতের কাছে ইমুন জিনিস, আর তুই কছ কিনা. . . . . ’’একটু থামলো ও, তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে আবার বললো, ‘‘তোর ওইটা নাই নাকি রে?’’ বলেই হেসে উঠলো হো হো করে, ওর সাথে যোগ দিল ঢ্যাঙা।
‘‘আইচ্ছা যা, তোর যাওনের দরকার নাই, তুই খালি দ্যাখ, কেউ আহে কিনা, আমরা যাইতাছি। ‘‘ বললো ঢ্যাঙা।
উঠে দাঁড়ালো ঢ্যাঙা ও লালচোখ, এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। দাঁড়ালো ওর সামনে, ‘‘কি গো ময়না পাখি, কারো লাইগ্যা অপেক্ষা করতাছ নাকি?’’ সুর করে বললো ঢ্যাঙা।
তাকালো মেয়েটা, চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো ভয়ে। ‘‘ডরাইয়োনা, আমারা তোমারে কিছু করবোনা, খালি. . . একটু আদর করুম। ‘‘ বললো লালচোখ, লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে।
‘‘কথা দিতাছি, মোডেও ব্যাথা পাইবানা। ‘‘ বললো ঢ্যাঙা, লোভে চোখ দুটো চকচক করছে।
এবার মেয়েটা সত্যি সত্যি ভয় পেলো, চলে যাবার জন্য দ্রুত পা বাড়ালো। সাথে সাথে বিদ্যুত খেলে গেলো দুই ষন্ডার শরীরে। ঘিরে ফেললো মেয়েটাকে।
‘‘দেখুন, আমাকে যেতে দিন, ’’ কাঁদছে মেয়েটা, হাতজোড় করে মিনতি করছে ওদের দুজনকে। ‘‘আমার সর্বনাশ করবেন না। ‘‘
অথর্ব ভিখারিটা এতক্ষন খেয়াল করছিলো সমস্ত ব্যাপারটা। ওর অকোজো শরীরটা বিদ্রোহ করতে চাইছে সেই তখন থেকেই। সারা অঙ্গে আগুন জ্বলছিলো, আর সেই আগুন বেরুচ্ছিলো দুচোখ দিয়ে।
আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করলো ও, খুব কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কেউ স্টিম রোলার দিয়ে পিষছে ওকে, এতোই ব্যাথা সারা শরীরে।
‘‘আসো, ময়না পাখি, সোনার চান; দিরং কইরোনা। ‘‘ হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে ওরা, মেয়েটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়ানোর।
ভিখারিটা চেষ্টা করছে নিজেকে সোজা করার, পারছেনা। একটু নড়লেই মনে হচ্ছে কেয়ামত হয়ে যাচ্ছে, ব্যাথায় মারা যাবার মতো অবস্থা।
মেয়েটার চিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছে চারপাশের আকাশ-বাতাস। লোকগুলো শুইয়ে ফেলেছে ওকে, কাপড় ধরে টানাটানি করছে।
ইতিমধ্যে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। সবাই দুরে দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ এগিয়ে আসার তাগিদ বা সাহস কোনটাই অনুভব করছেনা। কারণ সবাই জানে ওরা কার লোক।
প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি সাহায্য করলো ভিখারিকে। সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে, তীব্র কষ্টের স্রোত ওর গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তবে ভিখারি চেষ্টা করছে অসহ্য সেই ব্যাথা ভুলে থাকার। খুব ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো সে। যেন হাঁটছেনা, নিজেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
মেয়েটার গায়ের কাপর প্রায় অর্ধেক খুলে ফেলেছে ওরা, হামলে পড়তে যাচ্ছে ওর উপর; ঠিক এ সময় একটা কন্ঠস্বর শুনতে পেলো ওরা: -‘‘ছেড়ে দে মেয়েটাকে! ’’ দৃড় প্রতিজ্ঞ, কন্ঠে প্রচ্ছন্ন কৃর্তত্বের সুর।
ঢ্যাঙা ও লালচোখ তো ফিরে তাকালোই, জড়ো হওয়া সমস্ত লোকজন একযোগে ফিরে তাকালো ভিখারির দিকে।
উপবাসে গায়ের সবগুলো পাজর বেরিয়ে পড়েছে, পায়ের ক্ষত থেকে পুঁজ ঝরছে লোকটার। নিজেকে সোজা রাখার প্রাণান্ত চেষ্টায় রত। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলো -এই লোক বলে কি! মারা যাবার শখ হয়েছে নাকি!
নিজেদের কাজে ক্ষান্ত দিলো ঢ্যাঙা ও লালচোখ। এগিয়ে এলো লোকটার দিকে, ওকে মাঝখানে রেখে ঘুরলো কয়েক পাক। তারপর একযোগে হাসতে শুরু করে দিলো দুজনে।
‘‘ওরে ল্যাংড়া ফকির, ’’ হাসতে হাসতে বললো ঢ্যাঙা, ‘‘হিরো হইবার সাধ হইছে নি, আরে নিজের দিকে তাকাইয়া দেখ আগে। ‘‘

“এই হালা লুলা” লোকটার চুলের মুঠি ধরে বললো লালচোখ, “সোজা নিজের জায়গায় গিয়া হুইয়া থাক, নয়তো. . . . . . . ”
“আমি আবার বলছি মেয়েটাকে ছেড়ে দে! ”
এবার ধৈর্য্যরে বাধ ভেঙে গেলো লালচোখের। প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো ভিখারির মুখে, কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেলো লোকটা।
তামাশা দেখতে থাকা লোকগুলো ভিখারির জন্য সহানুভূতি বোধ করলো, মেয়েটার জন্য হয়তো মারাই গেলো লোকটা।
ঢ্যাঙা এবং লালচোখ ফিরে গেছে নিজেদের কাজে। মেয়েটা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য একহাতে ধরে রেখেছিলো ওকে ঢ্যাঙা।
অসহায় মেয়েটা সর্বশক্তি দিয়ে নিজের সম্ভ্রম বাঁচানোর চেষ্টা করছে, দুই কামোন্মাদের লালসা ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো ওকে।

ভিখারি মারা যায়নি, অবশ হয়ে গেছে, তবে শরীরে প্রাণ আছে। মনে মনে আল্লাহকে ডাকছে ও, -
“আল্লাহ আমাকে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি দাও। চোখের সামনে এভাবে মা-বোনের ইজ্জত লুটে যাওয়া দেখতে পারিনা আমি। একাত্তুরেও পারিনি, এখনও পারিনা। আর একবার খোদা, আর একটিবার সেই শক্তি আমাকে ফিরিয়ে দাও! একজন মুক্তিযোদ্ধাকে এতোবড়ো অপমান তুমি করোনা! ! ”

http://www.somewhereinblog.net/blog/Baadshablog/28742466

মা, তোমাকে।

নরাধম
২০ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ৩: ১৪

উৎসর্গঃ প্রবাসী সবাইকে, যারা প্রতি মুহূর্তে দেশে থাকা প্রিয়জনদেরকে, বিশেষ করে মা'কে, মিস করে। মন খারাপ হয়ে গেলে দুঃখিত।

মা, মনে আছে আমি বলতাম সারা বিশ্বে বিপ্লব ঘটাব? সমস্ত মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করব? মা, আমি এখন আর বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিনা। তোমার সাথে বসে তোমার হাতে রান্না করা গরম ভাত খাওয়াই আমার স্বপ্ন এখন। পিজার গন্ধ আর পাউরুটির স্বাদ নিতে নিতে এগুলো দেখলেই বমি আসে। রাইস কুকারে রান্না ভাতে কোনমতেই তোমার রান্না ভাতের গন্ধ আসেনা। শীতল পাটিতে বসে ভাত খাব, মা। পাশে ভাইয়া থাকবে। আমি হাসির কথা বললে সে সবসময়ের মত অট্টহাসি দিয়ে চরম মমতায় আমার মাথায় একটা চাটি মারবে। ছোটবোন কিছুক্ষন পর জিজ্ঞেস করবে কৌতুকটা কি। সবাই আবার হাসব। গরম ভাতের গন্ধ থাকবে নাকে। ছোটভাই ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং করে ফিল্ডিং না করেই পালিয়ে আসলে তাকে ক্ষেপাব। ছোটবোন যে আমাদের ছোটবোন না, তাকে কুড়িয়ে পেয়েছি সেটা বললেই সে কাঁদবে। মা, ছোটবোনটা কি এখনও সেরকম বোকাসোকা আছে? আমি আসার সময় সে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। মা, ছোটবোনের জন্য তো কোনদিন কিছু করিনি, বরং খালি ক্ষেপাতাম। কিন্তু কেন সে অমন করে কাঁদল? আমি সারাটা পথ ধরে ওর কান্নার কথা মনে করেছি। এখনও ১৪/১৫ বছরের কোন কিশোরী মেয়ে দেখলে আমি আবার তাকায়, খুঁজে ফিরি ছোটবোনের কোন চিহ্ন তার মধ্যে আছে কিনা। ছোটবোন চট্টগ্রাম গেলে প্রতিবারই আমাকে পরবর্তীবার আসার সময় চুড়ি, কানের দুল এসব আনতে বলত। আমি কোনদিন মনে করে নিয়ে যায়নি। মা, বিশ্বাস কর, এবার আমি গেলে সারা মার্কেটের সব চুড়ি, কানের দুল তার জন্য নিয়ে যাব।

তুমি দেখ মা, আমি ছোটভাইয়ের জন্য তার পছন্দের সব জুতা কিনে দিব। তার জন্য আইসক্রিম ফ্যাক্টরির সব আইসক্রিম নিয়ে যাব। ভাইয়ার সাথে দেখা হয়না তিন বছর। তাকে ছোটকালে সারাজীবনটাই খালি জ্বালিয়েছি। আমার হয়ে কত মার খেয়েছে সে। তার কপালে এখনও আমার মারা ইটের আঘাতের দাগ আছে। এবার গেলে ভাইয়াকে বলব যে আমার সব সফলতার ৯৯ ভাগ তার জন্য, তার মাধ্যমেই। আসার সময় যতক্ষণ তোমাদের সামনে ছিলাম ততক্ষণ একটুও কাঁদিনি। খুব স্বাভাবিক ছিলাম। যখন ঢাকা আসার গাড়িতে উঠলাম তখন আমি অনেক কেঁদেছি, মা। ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদেছি। বাসের সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তাকাক, আমি আজ কাঁদব। আমি জানি মা, সে যে তোমাকে ছেড়ে এসেছি আর কোনদিন তোমার কাছে চিরদিনের মত ফিরে যেতে পারবনা। আধুনিক জীবন যে আমাদেরকে যাযাবর বানিয়েছে। সফলতার পিছনে দৌড়তে দৌড়তে আমরা যে সব হারাচ্ছি মা, আমি সব জানতাম, তাই আমি মন উজাড় করে কেঁদেছি।

মা, হারভারড/স্ট্যানফরড/হোয়ারটন/শিকাগো তে পিএইচডি করে আইভি লীগে শিক্ষকতা করার স্বপ্নের কথা বলেছিলাম মনে আছে? মা, আমার কাছে সে স্বপ্নের এখন কানাকড়িও মুল্য্ নেই। বিখ্যাত হওয়ার কোন প্রয়োজন আমার কাছে এখন নেই, মা। শুধু তোমার পাশে বসে গল্প করতে চাই। ঢাকায় থাকার সময় চট্টগ্রামে বাড়িতে গেলে সারাদিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে রাত বারটায় আসতাম। তুমি রাগ করতে খুব তোমাদের সাথে গল্প না করেই আবার ঢাকায় চলে আসতাম বলে। মা, এবার তুমি দেখ, দেশে গেলে শুধু সারাদিন তোমার পাশে বসে থাকব। একটুও নড়বনা। সময়মত নামাজ পড়তামনা বলে তুমি অনেক সময়ই রাগ করতে। এখন আমি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত পড়ি, মা। সকালে উঠেই কোরান পড়ি। আল্লাহকে সন্তুষ্ঠ করার জন্য না, তুমি বলতে বলে। বাবা সবসময় রাগী ছিলেন। তুমি বলতে আসলে তিনি খুব ভাল মানুষ। আমাদের গোসলের পর লুংগী ধুয়ে দিতেন। শোয়ার সময় মশারী টাংগিয়ে দিতেন। রাতে উঠে কিছুক্ষণ পরপর দেখতেন মশায় কামড়াচ্ছে কিনা। কোনদিন এগুলো নিয়ে চিন্তা করিনি, মা। এবার দেখ, দেশে গেলে আমিই বাবার লুংগী ধুয়ে দিব। রাতে আমি বাবার

মশারী টাংগিয়ে দিব। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে প্রতি ঘন্টা পরপর ঘুম থেকে উঠে বাবাকে মশাই কামড়াচ্ছে কিনা দেখব। সকাল বেলা বাবাকে জোর করে হাঁটতে নিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি মা, তুমি যেরকম চাইতে সেরকম হয়ে যাব।

মা, তোমার কি মনে আছে ঢাবি' তে পড়ার সময় আমার একবার খুব অসুখ করেছিল? কিছুই খেতে পারতামনা। হাঁটার শক্তিও নেই। তবুও নানীর কথা না শুনেই জোর করে চট্টগ্রাম চলে গিয়েছিলাম। ভাইয়ার বুয়েটে তখন ওর পরীক্ষা চলতেছিল। পরীক্ষা না দিয়েই সে আমাকে চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়েছিল। ঘরে পৌঁছেই তোমাকে দেখামাত্রই আমার একশ তিন ডিগ্রী জ্বর এক মুহূর্ত্তেই কমে গিয়েছিল। সবাই সে কি হাসাহাসি আমাকে নিয়ে। ওরা ত জানেনা মা, তোমাকে দেখলে আমার জ্বর না, ক্যান্সারও ভাল হয়ে যাবে। অসুখের সময় আমি গরুর মাংশ খেতে পারছিলামনা মুখে স্বাদ নেই বলে। তুমিও কোরবানীর ইদের মাংশ খাওনি যতদিন আমি খাইনি। মা, তুমি এরকম কেন? তুমি কি জানতেনা এসব স্মৃতি তোমার ছেলেকে পরে কোন একসময় চরম কষ্ট দিবে?

মা, আর কোনদিন কি ভাইয়া, বাবা, আমি, ছোটভাই, ছোটবোন, তুমি সবাই একসাথে বসে গরম ভাত খেতে পারব? সবাই যে নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। সবাইকে একসাথে করা যাবে কি আর? আর কোন ইদ কি সবাই একসাথে করতে পারব? অথবা কোন কোরবানীর গরু একসাথে কাটাতে পারব? খাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে গল্প কি হবে আর কোনদিন? কিংবা সবাই একসাথে হাসতে পারব? অথবা সবাই একসাথে কান্না? মা, তোমার অসাধারণ ভাল একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে একসময়, তোমার বড়ছেলের সংসার হয়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবে। আমিও হয়ত থাকব অন্য কোন দেশে। মা, সেই সব দিনগুলো কি আর কোনদিন ফিরে আসবেনা? মা, যে সফলতার নাম সবাইকে ছেড়ে থাকা সে সফলতা আমি চাইনা, মা। আমি কুপমন্ডুক হব, গরীব থাকব, অলস থাকব, তবুও আমি সারাজীবন তোমার পাশে থাকতে চাই মা, শুধু এটাই আমার চাওয়া, মা, শুধু এটাই।

মা, সবাই জানে আমি আবেগহীন। মনে করে বাড়ির জন্য, তোমার জন্য, সবার জন্য আমার কখনও মন খারাপ হয়না। তুমি ত জান মা আমি কত বেশি আবেগপ্রবণ। এখনও প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলি। প্রায় প্রতি রাতেই স্বপ্ন দেখি তোমার কাছে গেছি, তোমার সাথে গল্প করতেছি। সমাহায়ারইনের মাকে নিয়ে কোন লেখায় পড়িনা আমাকে কাঁদায় বলে। মা, তুমি নিশ্চয় জান উপরে যতই শক্ত মনের মানুষ মনে হোকনা কেন আমি ভিতরে ভীষন দূর্বল মনের। মা, তাই প্রতিদিন তোমাদের কথা মনে করি। মা, সারাজীবন তোমাকে কাছে পেয়ে কোনদিন উপলব্ধি করিনি তুমি আমার জীবনের কতটুকু অংশ জুড়ে আছ। কোনদিন তোমাকে জড়িয়ে ধরে বলিনি মা, তোমাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলবেনা। শক্তমনের ছেলে কি কখনও এরকম বলে? মা, এবার দেশে গেলে তোমাকে জড়িয়ে ধরে বলব "মা, আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে অনেক মিস করেছি। আমি আর কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যাবনা। আমার পিএইচডি' র কোন দরকার নেই, মা। আইভি লীগের শিক্ষক হতে চাইনা আর বিখ্যাত হওয়ার চেয়ে তুমি আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মা। আমি সারাজীবন তোমার সাথেই থাকব, মা, এই এখানেই। "

http://www.somewhereinblog.net/blog/Naradhamblog/28772176

আজও মনে পড়ে সেই প্রিয় মানুষটিকে. . .

তাজুল ইসলাম মুন্না
১৬ ই মার্চ, ২০০৮ বিকাল ৫: ৪৪

আমার দাদী মারা গিয়েছে প্রায় ২ মাস হল। প্রিয় কেউ মারা গেলে কেমন অনুভূতি হয় তা প্রায় সবাই-ই জানেন। কিন্তু প্রিয় মানুষটি কষ্ট পেয়ে ধীরে ধীরে মারা গেলে কেমন লাগে তা হয়তো সবাই জানেনা. . . . . সেই লাগাটাই আমার জীবনে এসেছে।

দাদীকে কেমন ভালবাসতাম তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার জন্মের পর থেকেই দাদীকে অসুস্থ দেখি। তিনি স্ট্রোক করেছিলেন। স্ট্রোক করার পর তিনি বেঁচে ছিলেন প্রায় ৮ বছর। কিন্তু আমার প্রতি দাদীর ভালবাসা এবং তার প্রতি আমার ভালবাসা ছিল প্রচুর। প্রতিনিয়ত দাদীর একটি করে শক্তি শেষ হচ্ছিলো। একজন মানুষের জীবন প্রদীপ কিভাবে আস্তে আস্তে নিভে যায় তা আমি দেখেছিলাম আমার দাদীকে দিয়ে। সে আমাদের বাসায় আমার চোখের সামনে ছিল দীর্ঘ সময়। সময় পেলেই আমি আমার প্রিয় দাদীর কাছে গিয়ে বসতাম। দেখতাম প্রিয় মানুষটির কষ্ট। দেখতে হত। কিছুই করার ছিল না। দাদীকে প্রায়ই আঙ্গুর খাওয়াতাম। এই একটা জিনিস আমার দাদী সবচেয়ে ভাল করে খেতে পারতো। তাও প্রস্তুত করে দিতে হত। আঙ্গুরের উপরের পাতলা আবরণটাকেও সে গিলতে পারতো না। তাই সেটাকে ফেলে তারপর দিতে হত।

আমার দাদীকে আমি যতটুকু ভালবাসতাম তার থেকে অনেক বেশি ভালবাসতো আমার বড় দুইভাই। তারা দুইজন বড় হয়েছিল দাদীর স্নেহ নিয়ে। আমার মা কখনো আমার বড় ভাইদেরকে মারলে বা কিছু বললে তারা সরাসরি আমার দাদীর কাছে গিয়ে নালিশ করতো। তখন আমার দাদী আমার আম্মুকে বকতো।

* *

আমার দাদী যেদিন মারা গেলেন সেদিন বিকাল তেকেই বোঝা যাচ্ছিলো যে তার ভিতরে কিছু একটা হচ্ছে। শ্বাস নেওয়ার সময় ভীষণ শব্দ হচ্ছিলো। আমি একটু পরপর গিয়েই দেখছিলাম দাদীর অবস্থা। আমার দাদীর শ্বাসের সাথে ঘড়ঘড় করে শব্দ হচ্ছিল। শব্দটি এখনো আমার কানে বাজে। আমার দাদীর অবস্থা খারাপ হয়েছিল বিকাল ৪টা থেকে। সে মারা গেল সবাই আসার পরে। তখন ঘড়িতে প্রায় ৭: ৩০টা বাজে। এই প্রথম আমি কাউকে নিজের চোখের সামনে মারা যেতে দেখলাম। সেই প্রথম ব্যক্তিটি আমার প্রিয় দাদী. . . . . . .

আজ দাদীকে খুব বেশি মনে পড়ছে। দাদী উঠতে বসতে না পারায় তার বিছানা থেকে সবসময় একটা গন্ধ আসতো। সেই গন্ধটাকে সরানোর জন্য আমরা একটা রুম স্প্রে ইউজ করতাম। আজকে বাসায় শুটকি নিয়ে আম্মু কি যেন করছে। শুটকির গন্ধ সরানোর জন্য আমি রুমে নিজের অজান্তেই দাদীর স্প্রেটাকে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো আমার দাদীকে। মনে হল আমার সামনের বিছানায়ই আমার দাদী শুয়ে আছে. . . . . .

আল্লাহ আমার দাদীকে বেহেশত নসিব করুক. . . . .

http://www.somewhereinblog.net/blog/tajulislamblog/28779670

একজন বাবা ; তাঁর ষ্টুপিড ছেলের কাছে

আহমেদ শারফুদ্দীন
০৪ ঠা ডিসেম্বর, ২০০৭ রাত ১২: ৩৪

আমার বাবা ৫৭' র ঘরে পা দেয়া, কর্মজীবন ইস্তফা দিয়ে ঘরে ফেরা একজন অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। তাঁর অবসরগুলো কাটে দৈনিক পত্রিকাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষন করে, বিভিন্ন চ্যানেলে ক্রিকেট খেলা দেখে আর বাড়ী ও মসজিদের সেতুবন্ধন পাকাপোক্ত করতে। একমাত্র মেয়ের ঘরের একমাত্র নাতনীটা তাঁর ভাল বন্ধু এখন। সময় পেলেই ছুটে যান আড়াই বছরের টুনটুনিটার কাছে।

টু বা থ্রীতে পড়ি তখন। প্রতি রবি ও বুধবার বিকেল ৫টায় বাবার অফিসের সামনে হাজির হতাম। শুকলাল হাটে যেতে হবে। বাবার হাত ধরে রেললাইন দিয়ে হাঁটতাম। বাবা বলতেন, বুলবুল বলতো ব্যাট্টা: মানব দেহে হাড়ের সংখ্যা কত? পৃথিবীতে কয়টি মুসলিম দেশ আছে? অমুক দেশের রাজধানী কোথায় ?. . . . . চলতো শুকলাল হাট পর্যন্ত।

বাবার বড় স্বপ্ন ছিল তাঁর বড় ছেলেকে বিদেশে অনেক বড় ডিগ্রী নিতে পাঠাবেন; উনার সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে হলেও। বাবার সমস্ত সুখস্বপ্নের স্বার্থে পা মাড়িয়ে নিজেকে আবিষ্কার করেছিলাম নেশার রাজ্যে। খুবই কেঁদেছিলেন বাবা। আজ অন্যের স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে ছুটতে হয়েছে পৃথিবীর কয়েকটা প্রান্তে।

বাবার মেজো ছেলে বায়োমেকানিক্যাল ইন্জিনিয়ার নামক শব্দটার পেছনে হন্যে ছুটছে আর ছোট ছেলে টার্নিং পয়েন্টের টিবিতে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাবার লালিত স্বপ্নের বীজ তাদের মাঝে বুনে দেয়ার কঠিন দায়িত্ব আজ আমার হাতে; আমাকে পারতেই হবে। আজ জীবনের সকল সংকটময় সময়ে সহজ সমাধানের প্রশ্নে বারবার অনুভব করি "বাবা" নামক মহামানবের প্রয়োজনীয়তা। তাই এখন বাবার দেয়া মারগুলোকে ঔষধ আর তাঁর বলা প্রতিটি কথাকে "পবিত্র বাণী" বলে মেনে নিয়েছি।

বাবাকে সন্তান হিসেবে গর্ব করার মত কতটুকুন কি দিতে পেরেছি জানিনা। তবে আমরা বাবাকে নিয়ে একবুক গর্ব করি। হয়তোবা আগামী প্রজন্মও করবে, যতদিন লাল-সবুজের পতাকা থাকবে। আমাদের শোকেজে সাজিয়ে রাখা আমার ১৫/২০টা ক্রেষ্ট ও কাপের মধ্যে পিতলের অনেক পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া একটি কাপ আমাদের অমূল্য সম্পদ। যেখানে খোদাই করে লিখা আছে - "কক্সবাজার গুনীজন সংবর্ধনা পরিষদ। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বীকৃতি স্বরূপ মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ হোছাইনকে প্রদান করা হইল - ১৬/১২/১৯৭২ইং"।

http://www.somewhereinblog.net/blog/KONIKAblog/28749239

"জানো, আমি লিখছি বাবা"

শুভ শঙ্কর সরকার (মনের কথা)
ভারত
২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ দুপুর ১২: ৩২

জীবনে কয়টা কলম হারিয়েছি হিসাব করে বলা মুশকিল। সংখ্যা বিশ্বাস্য নাও হতে পারে। কেন জানি ইউজ অ্যান্ড থ্রো হোক আর লাইফ টাইম গ্যারান্টেডই হোক, পরীক্ষার খাতায় লেখার সমাপ্তি অথবা কোথাও সাইন করার পরে তা পকেটে রাখার কথা বেমালুম ভুলে যাই। আফশোষ হয়, তবে সান্ত্বনা পাই যার বেশী প্রয়োজন তার পকেটে গিয়েছে ভেবে। লেখনির সাথে আমার কি মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান তা সহজেই বোধগম্য।

বাবার প্ররোচনায় ছোটবেলা থেকেই আমার বই পড়ার প্রতি প্রচন্ড ঝোঁক। সাড়ে তিন থেকে চার বছর বয়সে ক্লাস ওয়ান এর বইগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো আর মন টানতো না। সেই সময় মস্কো থেকে বাইপোস্টে "সোভিয়েত ইউনিয়ন" বলে একটা মাসিক ম্যাগাজিন আসতো। এই ম্যাগাজিন এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। রাশিয়ার রূপকথাগুলো শুধু নয়, মন নাড়া দিয়ে তাদের জীবন যাপনের কাহিনী গুলোও। রুদ্ধশ্বাসে পড়তাম তাদের সাফল্যের ইতিকথা। বাবা বুঁঝতে পেরেছিলেন থরে থরে সাজানো বইয়ের আলমারী খুলে দেওয়ার সময় এসেছে। কোন দিন কিছু পড়তে বাধা দেন নি। উৎসাহ দিয়েছেন। আমিও সোৎসাহে পড়ে ফেলেছি গোর্কি, পুশকিন, আন্তন মাকারেঙ্কো, লেনিন, সাথে রামায়ণও। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বঙ্কিম, শরৎ, দিজেন্দ্রলাল, মধূসূধন, গিরিশ সব। বাবার আফশোষ, এ দেশে আসার সময় হাজার তিনেক বই ফেলে আসতে হয়েছে, যার অনেকগুলোই দুস্প্রাপ্যতার কারনে পড়াতে পারলেন না। বাবার সাথে সাথে আমারও খুব আফশোষ হত। তবুও পড়েছি অনেক কিন্তু লিখিনি তার কনা মাত্র।

বাবা বললেন, লিখতে শুরু কর, আমি বললাম , ধুর পড়তেই মজা। বাবা জোর করে ছড়া আর গল্প লিখিয়ে প্রতিযোগিতায় পাঠালেন, জেলায় প্রথম হলাম। তাতেও বিন্দুমাত্র লেখার উৎসাহ পাইনি। আমাকে পাঠকের সাথে সাথে লেখক বানানোর কোনো অভিসন্ধিই কাজে আসেনি। আসলে আমার কিছু করার ছিল না। জমিতে হাল দেওয়ার খাটনি আর নিয়মিত কলম দিয়ে কাগজে লেখা আমার একই মনে হত। আর বেটা মাতাল কলম কিছুতেই আমার হাতে সোজা পথে চলতনা। আমি লিখতাম বাংলায় আর ওর মাথা দিয়ে যেটা বের হতো তা মনে হয় হিব্রুই হবে। বাবা, মা কারোরই হিব্রু ভাষায় দক্ষতা না থাকায় আমাকে চরম ভৎর্সনার শিকার হতে হতো। বাবা ভীষণ দুঃখ পেতেন। কিন্তু আমার কলম কখনোই কথা শোনেনি, সেই কারনেই বোধকরি এখনও কলমের সাথে আমার দীর্ঘসহাবস্থান হয়ে ওঠে না।

আপাত দৃষ্টিতে সাহিত্য চর্চায় এই ছিল আমার বাহ্যিক রূপ। কিন্তু একটা গোপন কথা আছে। আমি ভীষণ ভাবতে ভালবাসতাম। তেপান্তরের মাঠে ঘোড়ার পিঠে রাজকন্যা নিয়ে চিন্তা করতাম নিজেকেই। নিজেই তৈরী করতাম রূপকথার রাজমহল। রাশিয়ার লালফৌজের সৈনিক হয়ে নিজেকেই খুঁজে পেতাম পাহাড় ও স্তেপে। প্রচন্ড ইচ্ছে করতো লিখতেও, কিন্তু সেই কলম!

সাম হোয়ারের ব্লগার "অনুমান" আমাকে প্রথম এই ওয়েবসাইট দেখান। ওনার উৎসাহেই শুরু। ওপরে নীল আকাশ, নিচে আমি তুমি ধপাস অথবা আমি তুমি মিলে তাল গাছের নিচে টালির ঘর বানিয়ে থাকবো, ক্ষিদে পেলে তাল খাব পিপাসায় তাড়ি। যাই লিখিনা কেন তা পঠনযোগ্য আর অপঠনীয়ই হোক, লিখছি তো! সবচেয়ে সুখের কথা এখানে কলমের ঝামেলা নেই, হাতের লেখাও নিখুঁত।

আজ আমার শততম পোস্ট হলো। আউট যখন হইনি ইনিংস সহজে শেষ হবেনা। এই ওয়েব সাইটের খোঁজ, এত সুন্দর প্ল্যাটফর্ম এবং এতদিন পর্যন্ত আমাকে সহ্য করে প্রেরনা দেওয়ার জন্য "অনুমান", "সামহোয়ার ইন ব্লগ" ও সর্বোপরি আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে ভীষণ বলতে ইচ্ছে করছে "জানো, আমি লিখছি বাবা"।

http://www.somewhereinblog.net/blog/monerkothablog/28774212

খসে পড়া কেশগুচ্ছ

মুকুল
২০ শে নভেম্বর, ২০০৭ রাত ১১: ১৫

মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগকে আমি মজা
করে বলতাম 'চলমান সংসার'।
এমন কোন খুঁটিনাটি জিনিস নেই
যা পাওয়া যায় না তাদের 'চলমান সংসারে'।

ভ্যাসলিনের কৌটো থেকে শুরু করে লিপস্টিক
সেফটিপিন থেকে চিরুনি
ভাঁজ করা নীল ছাতা
বিশেষ বিশেষ সময়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন. . .

একদিন অভ্যাসবশতঃ কথার ফাঁকে তোমার চলমান সংসার থেকে
চিরুনি বের করে আঁচড়ে নিচ্ছিলে কুঞ্চিত কেশদল,
স্বাভাবিক নিয়মেই ঝরে পড়ছিলো
পুরোনো স্মৃতির মত খসে পড়া কেশগুচ্ছ।

খসে পড়া কেশ মুড়ে ফেলে দেয়াটাই দস্তুর।
না, ফেলতে দিইনি। মাটি ছোঁয়ার আগেই
একগুচ্ছ কেশ কাগজে মুড়ে সযত্নে
রেখেছিলাম মানিব্যাগের ভাঁজে,
যেন কত দামী জিনিস, রাখতে হয় টাকার ভাঁজে!

কিম্বা তার চেয়েও মূল্যবান, তাই ততোধিক
সাবধানতায় রাখি ডায়রির ভাঁজে তালাবদ্ধ ড্রয়ারে,
কোন বেরসিক পকেটমারের হাতে পড়ে যেন আবার
বেহাত না হয়ে যায়!

তোমার অনুপস্থিতিতে বের করে দেখি
ঘ্রাণ নিই
যেন কত তৃষ্ণার্ত প্রবাসী-
ঘরে রেখে যাওয়া সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে কাতর!

তুমি নেই,
আছে তোমার খসে পড়া কেশগুচ্ছ।
গৌতম বুদ্ধের কেশধাতুর চেয়েও সযত্নে আগলে রাখি
মহামূল্যবান সম্পদ!

নভেম্বর ১৬, ২০০৭
http://www.somewhereinblog.net/blog/mukulbdblog/28746638

শালিকপুরাণ

মুজিব মেহদী
০৩ রা মার্চ, ২০০৮ রাত ৮: ৪৩

একটা কোনো শালিক হলো
অথচ তা দেখেই তুমি
হঠাৎ কেমন আঁতকে ওঠো
শিউরে ওঠো
রোদের মতোন লাফিয়ে ওঠো
ঘাসফড়িঙের মতোন করে
এদিক ছেড়ে সেদিক ছোটো
একটা কোনো শালিক হলো

মানুষ কোনো একলা হলেই
বিষণ্নতায় সাঁতার কেটে
কুড়ায় দারুণ স্মৃতির ঝিনুক
ডুবসাঁতারে উঠিয়ে আনে
গতদিনের দেউড়ি থেকে
হারিয়ে যাওয়া বোধের শালুক

শালিক যদি একলা হলোই
কী আসে যায় আমার তোমার
কী আসে যায় তেমন করে
গাছ- পাহাড়ের ফুল- পাখিদের
একটা কিছু যায়ও যদি
আসেও যদি
তাও তো কেবল ওই শালিকের

একটা কোনো শালিকই নয়
অথচ তা দেখেই তুমি
হঠাৎ কেমন আঁতকে ওঠো
শিউরে ওঠো
রোদের মতোন লাফিয়ে ওঠো
ঘাসফড়িঙের মতোন করে
এদিক ছেড়ে সেদিক ছোটো
একটা কোনো শালিক হলো
http://www.somewhereinblog.net/blog/MuzibMehdyblog/28776130

গাঙচিল চোখ

শেখ জলিল
১৯ শে মার্চ, ২০০৮ রাত ১০: ১২

গাঙচিল চোখ দেখে অতিদূর নীলে
তোমার সাজানো ঘর, সুখের সংসার
যোজন যোজন দূরে কোন্ দেশে রয়েছো যে তুমি?
নীলিমার ওপারে নীলিমা, সাগরের ওপারে সাগর!

সেই এক সন্ধ্যার আঁধার-
খেয়ে গেলো আমার চোখের আলো, রংধনু রং
ভাবনার নক্ষত্রটা গেলো মিশে অসীম আকাশে
হতাশার অন্ধকারে ভরে গেলো নিকানো উঠোন
দিনান্তের সমস্ত নির্যাস সযতনে বেঁধে তবু
রাখলাম তুলে সব তোমার আসার অপেক্ষায়।

আসার কথাটি ছিলো অনেক আগেই
বাতায়নে ডেকেছিলো দোয়েল- চড়ুই
জানালার ঘুলঘুলিটাও ছিলো খোলা
অপেক্ষায় ছিলো ভোরের উর্বর আলো
এলার্ম বাজানো ঘড়িটাও নিতেছিলো দম

সময়ের অপেক্ষা- আসবে তুমি ভেঙে যাবে ঘুম।

গাঙচিল চোখ খোঁজে সাগর কিনারা, নীল নীল ঢেউ
তোমার অদূর সাহসী আহ্বান ওই দশটি আঙুল
দেখে যোজন যোজন দূর তোমার ঠিকানা
পাবে কী সে খুঁজে ফের ভোরের আলোয়
একদিন সহসা তোমার আসার লগন! ?

১৮. ০৪. ২০০৬

http://www.somewhereinblog.net/blog/SheikhJalilblog/28780635

বসন্ত চলে যায়. . . তুমিও চলে যাও. . . .

পথিক
০৪ ঠা এপ্রিল, ২০০৮ সকাল ১১: ২৩

শব্দ কুঞ্জে মেলেনা শব্দ
পুষ্প কুঞ্জে ফুল
ঋতুকুঞ্জে মেলনা আচার
বসন্ত বৃষ্টি কি ভুল?

তুচ্ছ আমি নিজের কাছে
অনেক অনেক বেশী
আরও ছোট হতাম
যদি বলতে ভালবাসি।

বসন্ত সে বৃষ্টি গায়ে
মাখব বলেই পথে
বৃষ্টি কেবল বর্ষাঋতুর
রইলে যে সে মতে।

ঠান্ডা শীতল কষ্ট সবই
সহ্য করেই নিতাম
বসন্ত— এই বৃষ্টি শেষে
তোমায় যদি পেতাম

ছোট্ট আমি মনে মনে
যতই বেশী ভাবি

বসন্ত এই বৃষ্টি মনে
আঁকুক যতই ছবি. . .
তুমি যদি একটু খানি
বৃষ্টি ছুঁয়ে দিতে
বর্ষা আসার আগেই মনে
ঝড়ের আভাস পেতে।

শব্দ কুঞ্জ হারাই আমি
হারাই পুষ্প গন্ধ
বসন্তে কই শান্তি আমার
কোকিল সুরই বন্ধ।

তুমি তুমি করে আমি
ঋতু কুঞ্জও হারাই
ঋতু ছাড়া অসময়মাঝে
সময় খুঁজে বেড়াই।

শব্দ , ঋতু , পুষ্প সবই
আপন খেয়াল মানে
তোমায় নিয়ে ভাবনা কেন
তারা কি তা জানে?

http://www.somewhereinblog.net/blog/pothe_potheblog/28785181

অয়েট. . .

ছায়ার আলো
০৬ ই ডিসেম্বর, ২০০৭ রাত ১০: ৫৪

জীবনের প্রথম থেকেই শুরু. . . অপেক্ষা
প্রথম স্কুলে ভর্তির দিন. . . অপেক্ষা
পরীক্ষার আগে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা
পরীক্ষার পরে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা
লিটমাস লাল হবে না নীল হবে? অপেক্ষা
এস এস সি কি পার হলাম, না হলাম না? অপেক্ষা
যাক হয়েছি. . . এখন কি করা? অপেক্ষা!
আবার পরীক্ষা! আবার অপেক্ষা! !
এইচ এস সি পার হতে পারব তো? অপেক্ষা!
কুইদা মুইদা পার হইলাম. . . আবার ভার্সিটির ফর্মের জন্য অপেক্ষা
চার বছরের কোর্স মাত্র সাড়ে ছয় বছরে পার করলাম. . .
চাকরীর ইন্টারভিউ এ ডাকের জন্য অপেক্ষা
বাসের লম্বা লাইনে অপেক্ষা
যেমন তেমন একটা চাকরী হল,
প্রতি মাসে বেতনের জন্য অপেক্ষা!
আরো কি কি জানি লিখতে চাইলাম, মনে করতে পারছিনা
এখন মনে পরার জন্য অপেক্ষা করছি. . .
উফফ্ ! !
লাইফে এই অপেক্ষা নামক জিনিষটা না থাকলে কার কি ক্ষতি হতো?

http://www.somewhereinblog.net/blog/shadowlitblog/28749859

বৃদ্ধাশ্রম (একটি ফিউচার ফিকশন)

জেবতিক আরিফ
৩০ শে জুন, ২০০৭ দুপুর ১: ৫৭

এক

"আমার একটা দরকার, ৯৫ বছরের বেশি হতে হবে" অনিক তার চাহিদা জানায়।
কেয়ার টেকার ফিস ফিস করে বলে, "৯৫ বছরের বেশি মাল বেশি নাই, এগুলার জন্য ডিমান্ড বেশি। ধার হিসেবে দিতে পারি, ১৫ দিন পরে ফেরত দেবেন। "

"ধার হিসেবে নিয়ে কী করব?" অনিক বিস্ময়ের সাথে জানতে চায়।
"অনেকেই ছবি আকাঁর জন্য নিয়া যায়। তাছাড়া হিউম্যন স্কাল্পচার না কি যেন একটা হইছে, সেইখানে জিন্দা মানুষ খাড়া করাইয়া রাইখা এক্সিবিশন করে। এই সব কারনেও আর্টিসরা নিয়া যায়। আপনে কি কামে নিবেন?

অনিক বুঝতে পারে। তার চাহিদা অন্য। সে এসেছে ডি. এন. এ গবেষনার কাজে। বিদেশী ফান্ড, টাকা পয়সার সমস্যা নেই। সুতরাং তার দরকার একজন ৯০ বছরের বৃদ্ধ মানুষ যার পুরো ডি. এন. এ প্রোফাইল বের করার পর, তাকে কেটে কুটে কিছু নতুন জিনিষ দেখতে হবে। মৃত মানুষ দিয়ে কাজ হবে না, কারন নতুন কিছু হরমোন টেস্ট করতে হবে । যুগান্তকারী ফলাফলের আশা করছে ইউনিভার্সিটি, সুতরাং তাদের তাড়া আছে। বিদেশীদের ফান্ড ব্যবহারেও তাড়া আছে। জুন মাসের মাঝে একটা রেজাল্ট না দিলে ফান্ড ফেরত যাবে।

সুতরাং তাকে একটা ৯০ প্লাস মানুষ কিনে নিতে হবে। দ্রুত কেয়ারটেকারের সাথে দরদস্তুর শেষ হয়। এই টাকাগুলো কেয়ারটেকার নিজে মেরে দেয়, যারা কিনে কিংবা ভাড়া নেয়, তাদের সবাই বিষয়টি জানে। এভাবে বৃদ্ধাশ্রম থেকে লোক বের করে নেয়া বেআইনি, কিন্তু সরকার দেখেও না দেখার ভান করে সবসময়।
সময় পরিবর্তিত হয়েছে, একসময় এইসব বুড়োবুড়ির দায়িত্ব নিত পরিবার, এখন পরিবার সিস্টেমটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর মালিকানাবিহীন শিশুতে ভরে উঠছে শিশু সদন গুলো, আর দলে দলে মানুষ বুড়ো হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে সরকারী বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে। এই জনবল সরকারের কোন কাজে আসছে না, অথচ গুচ্ছের টাকা খরচ হচ্ছে। তাই যেন তেন উপায়ে এদের কাছ থেকে মুক্তি পেলেই চলে। কেয়ারটেকার যখন বিক্রী করে দিয়ে "মৃত" লেখে ফাইল বন্ধ করে দেয়, তখন সরকার তাই খুশিই হয়।

দুই.
মহিলাকে দেখে অনিকের পছন্দ হয়। বয়েস ৯২ হলেও বেশ শক্ত সমর্থ মহিলা। গুটুর গুটর করে এসে অনিকের গাড়িতে উঠে বসেন। সারা মুখে তার হাসি। কেয়ারটেকার বলে দিয়েছে, আপনাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, এজন্য তার সুন্দর সাদা শাড়িটা পরে এসেছেন। সারা মুখ জুড়ে কেমন নিষ্পাপ হাসি। অনিক একটু বিষন্ন হয়।

তিন.
ভুরু কুচকে অনিক তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে। মহিলার সবগুলো অর্গান আলাদা আলাদা জারে ভরে লেবেল লাগিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে তার আপাতত: কোন কৌতুহল নেই। সে অবাক হয়ে দেখছে মহিলার ডি. এন. এ প্রোফাইল। অনিকের ডি. এন. এ প্রোফাইলের সাথে অদ্ভুত মিল। সে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো চেক করলো। এই মহিলা নিশ্চিত ভাবে অনিকের পূর্বপুরুষদের একজন দাদী অথবা নানী। অনিকের কপাল বেয়ে সুক্ষ ঘামের ধারা বইতে থাকে।

চার.
পরদিন অনিক আবার যায় সেই বৃদ্ধাশ্রমে। কেয়ারটেকারে সাথে কথা বলা দরকার। মহিলার ঠিকানা ঠিকুজি কিছু বের করতে পারলে অনিক সেখানে খোজঁ নেবে। কে জানে হয়তো, অনিক তার মা কিংবা বাবার দেখা পেয়ে যেতে পারে।

কেয়ারটেকার অফিসে নেই। ফিরতে ঘন্টাখানেক দেরী হবে। গেস্টরুমে বসেই এ সময়টা কাটিয়ে দেবে ভাবে। গেস্টরুমে আরেকজন মানুষ অপেক্ষা করছে কেয়ারটেকারের। হয়তো, সে ও একজন মানুষ কিনবে।

অনিক তার সাথে গল্পের চেষ্টা করে। সময় কাটানোর চেষ্টা। সেই লোকটি গল্পে আগ্রহী নয়। তার কাছে কেয়ারটেকারের অপেক্ষাটাই মূখ্য।

পরিচালক সেট সাজিয়ে বসে আছে সকাল থেকে। জরুরী ভাবে একজন ষাটোর্ধ মহিলা দরকার, আগের জন একটা কাজ করার পরই কাল রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেছে। প্রায় পুরো টাকাটাই জলে গেছে।
তাই আজ একজন নতুন মহিলা দরকার। আবার টাকা ইনভেস্ট। অবশ্য এই ইনভেস্টে প্রডিউসারের আপত্তি নেই।
আজকাল মানুষের রুচি বদলে গেছে।
এডাল্ট সেক্স মুভিতে বিনিয়োগ করতে তাই প্রডিউসাররা পিছপা হন না।
টাকা যাই লাগুক, দুই মাসের মাঝেই হাজারগুন হয়ে ফেরত আসবে।
লাভ, সবই লাভ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/Arif-Jebtikblog/28718624

বাঙালি মুসলমানরাই সবচেয়ে লিবারেল?

ফাহমিদুল হক
০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ১১:১১

মালয়েশিয়ায় এসে আমি মালয় মুসলমান, আরব মুসলমান, আফ্রিকান মুসলমান, ভারতীয় মুসলমান, পাকিস্তানী মুসলমান, ইন্দোনেশীয় মুসলমান -- এরকম হরেক জাতের মুসলমানকে কাছে থেকে দেখলাম। বলা দরকার এসব নানান জাতের মুসলমানকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে একটি মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার সুবাদে। সব জগতের মুসলমানকে পর্যবেক্ষণ করে আমার উপলব্ধি হলো, বাংলাদেশী মুসলমান হলো সবচেয়ে লিবারেল। অন্য অর্থে ধর্মীয় আচার পালনে ও ধর্মীয় চিন্তা লালনে বাংলাদেশীরা হলো সবচেয়ে 'ফাঁকিবাজ'। আরেকভাবেও বলা যায়, পৃথিবীর সব মুসলমান একরকম, আর বাংলাদেশী মুসলমান অন্যরকম। পাকিস্তানীরা যে বাঙালিদের 'সাচ্চা মুসলমান নয়' বলতো, তা তারা ঠিকই বলতো।

নামাজ-রোজার প্রসঙ্গেই তুলনাটা প্রথমে করা যাক। আরবসহ পৃথিবীর সব মুসলমানই নামাজটা পাঁচ ওয়াক্ত কায়েম করার চেষ্টা করে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদটা মূল গেটের পরপরই এবং তা সবসময় বিদেশী মুসল্লি ছাত্রদের পদচারণায় মুখরিত। রোজার দিনে কোনো মুসলমানের প্রকাশ্যে খাওয়া সরকারীভাবে নিষিদ্ধ, সরকারী মাওলানা বাহিনী ঘুরে ঘুরে তা নিশ্চিত করে। পুলিশ তো আছেই। আমি যে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে থাকি, সেখানে আরব আর আফ্রিকান মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোনো গানবাজনার আওয়াজ আশপাশ থেকে শোনা যাবেনা, কেবলই কোরান তেলওয়াতের অডিও বাজে। এখানকার বিদেশী ছাত্ররা এপয়েন্টমেন্ট দেন ও নেন মসজিদে।

মালয়েশিয়ার শতকরা ৪০ ভাগ মানুষই অমুসলিম, কিন্তু মুসলিম পরিমণ্ডলে পরম মুসলিম আবহাওয়া পাওয়া যাবে। মালয় মেয়েরা পর্দা করে মাথায় স্কার্ফ বেধে, যদিও তাদের অনেকেই সঙ্গে জিন্স-টিশার্ট পরে। রাষ্ট্রীয়ভাবে মালয়েশিয়া সরকারের 'ইসলাম হাদারি' প্রকল্প রয়েছে। ইসলাম হাদারি হলো ইসলামনির্ভর উন্নয়নপরিকল্পনা। আমাদের দেশে এমনটা ভাবা যাবেনা, তা যতই সংবিধানের মুসলমানি দেয়া হোকনা কেন।

চীনা মেয়েদের স্বল্পপোশাক আপনাকে (যদি আপনি পুরুষ হন) যতই ভিস্যুয়াল প্লেজার দিক না কেন, মুসলমান হয়ে মালয়েশিয়ায় বাস করা মানে আপনাকে ইসলামী পরিমণ্ডলে বাস করতে হবে। টুরিস্ট হিসেবে যদি আপনি আসেন তবে মডার্ন মালয়েশিয়াকে পাবেন। আর বাস করতে আসলে মুসলিম মালয়েশিয়াকে পাবেন।

গড়পড়তা বাংলাদেশী মুসলমান হিসেবে আমি এই ইসলামী চাপে চ্যাপ্টা হয়ে আছি। আমি জানি আমাদের দেশের অনেক মানুষই ধর্মপ্রাণ। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই নিয়মিত আচার পালন করেনা। একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়মিত নামাজ পড়ে, কিন্তু তার চাইতে বড়ো অংশ নামাজ পড়েনা। সেই বৃহত্তর অংশের একজন হয়ে এখানে এসে মুশকিলে পড়েছি। এতটা ইসলামী পরিবেশে আমি কখনোই বসবাস করিনি -- পরিবার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মজীবন -- কখনোই না।

সত্যি বলতে কি, আমি এই লিবারেল বাঙালি-মুসলমান পরিচয়ে গর্বিত। পূর্ববঙ্গের ইসলামের ইতিহাস অন্য যেকোনো অঞ্চল থেকে ভিন্ন। এখানে তুর্কিদের অস্ত্রের কিংবা আরবদের কড়া অনুশাসনের চাইতে ইরানীয় সুফি ধারা বেশি প্রভাব রেখেছে ইসলামপ্রসারে। সুফি-দরবেশদের শান্তির বাণী অবিকৃতও থাকেনি, স্থানীয় বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মিশেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ইসলামের জন্ম হয়েছে। আমাদের মুসলমানিত্ব তাই নামাজসর্বস্ব নয়, আমাদের মেয়েরা তাই পর্দায় বন্দী নয়।

তবে রাজনৈতিক অসততার অবসরে ইসলাম বাংলাদেশে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, দ্রুত মানুষের মনোযোগ পাবার জন্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনও কেবলই মুসলমান নয়, বাঙালিও।

http://www.somewhereinblog.net/blog/fahmidulhaqblog/28767004

একটি ধর্মের উতস সন্ধানে

দিগন্ত
১৭ ই জুলাই, ২০০৭ সকাল ১০:৫৭

ধর্মের উতস নিয়ে রিচার্ড ডকিন্সের লেখা অনুবাদ করেছি। তার মধ্যে একটি অংশ খুব মজার – যেখানে ডকিন্স একটি নতুন ধর্মমত কিভাবে তৈরি হয় তা নিয়ে একটি কেস স্টাডি করছেন। কেস স্টাডি হল কার্গো কাল্ট নিয়ে।

কার্গো কাল্ট হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসগুলোর একটি সম্মিলিত নাম। এরা মনে করত কার্গো জাহাজ গুলো আসলে স্বর্গীয় দূতের প্রেরিত – আর সব সামগ্রী তাদের জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত। জাহাজের ইউরোপিয় নাবিকরা কিভাবে রেডিও শোনে, কিভাবে রাতে আলো জ্বালায় – সবই ছিল এই আদিবাসীদের বিস্ময়ের বিষয়। আসলে উন্নত টেকনলজির সাথে ম্যাজিকের খুব একটা তফাত নেই। পরবর্তীকালে তাদের ধর্মবিশ্বাসেও এইসব ‘ম্যাজিক’ প্রবেশ করে, গঠিত হয় মিশ্র ধর্ম।

ভানুয়াটুর তান্না দ্বীপে আমেরিকান নাবিকদের রীতিমত পূজো করা হত। তান্নায় একটি কাল্ট এখনও আছে – যার কেন্দ্রে আছে জন ফ্রাম নামে এক নাবিক। যদিও নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেনা এই নামে সত্যি কেউ ছিল কিনা, সরকারি নথি আনুসারে, ফ্রাম দ্বীপে এসেছিলেন ১৯৪০ সালে। তিনি অনেকগুলো ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছিলেন। তার বক্তব্য আনুসারে, তিনি আবার দ্বীপে ফিরে আসবেন, জাহাজ ভর্তি সামগ্রী নিয়ে, আর সাদা আমেরিকান ও মিশনারীদের দ্বীপ থেকে তাড়িয়ে দেবেন। এমনকি, তার পুনরাগমনের সময় তিনি প্রচলিত ঔপনিবেশিক মুদ্রার পরিবর্তে নতুন ধরণের মুদ্রার প্রচলন করবেন। সেই প্রভাবে ১৯৪১ সালে আদিবাসীরা কাজ বন্ধ করে দিল। যা টাকাপয়সা ছিল তা দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে শুরু করল। দ্বীপের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিছুদিন পরে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকান বাহিনী দ্বীপে পদার্পণ করল, আদিবাসীরা মনে করল জন আসবে এবার। জনের বিমান যাতে দ্বীপে নামতে পারে, সেজন্য দ্বীপে রানওয়ে তৈরি হল, বাঁশের কন্ট্রোল টাওয়ার, হেডফোন বানানো হল।

পঞ্চাশের দশকে চিত্রপরিচালক ডেভিড অ্যাটেনবরো দ্বীপে যান তথ্যচিত্র তৈরির জন্য। দেখেন, নাম্বাস নামে এক স্বঘোষিত পুরোহিত নবগঠিত কাল্টের দায়িত্বে আছেন। তিনি জনের সাথে নিয়মিত ‘যোগাযোগ’ রেখে চলেন। জনের রেডিও-র সাথে যোগাযোগের পন্থাও অদ্ভূত। এক বৃদ্ধা, কোমরে বৈদ্যুতিক তার জড়ানো, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে অস্ফুটস্বরে কথা বলতে থাকে। নাম্বাস সেটা বুঝে সবাইকে জানায় – এটাই হল জনের বার্তা। স্বাভাবিকভাবেই, তাদের সমাজে নাম্বাসের কদরই অন্যরকম। নাম্বাসের বক্তব্য অনুসারে কোনো এক বছর ১৫ই ফেব্রুয়ারী জন ফিরে আসবে। তাই, ঐ দিনে ধর্মীয় উৎসব পালন হয়, সবাই একটা খোলা জায়গায় একত্রিত হয়ে জনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়।

সব দেখে অ্যাটেনবরো তার বন্ধু স্যামকে জিজ্ঞেস করেন যে কেন জনের পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতির ঊনিশ বছর পরেও এরা একইভাবে জনের অপেক্ষায় বসে থাকে? স্যামের উত্তর, যদি আমরা দুহাজার বছর ধরে খ্রীষ্টের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করে যেতে পারি – তবে এরাই বা কেন মাত্র ঊনিশ বছর জনের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারে না?
সম্পূর্ণ অনুবাদ :
ধর্মের উতস সন্ধানে
http://www.somewhereinblog.net/blog/digantablog/28721298

বঙ্গভঙ্গ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

বিবর্তনবাদী
১৮ ই জানুয়ারি, ২০০৮ বিকাল ৩:১৫

পূর্ববঙ্গ তথা আমাদের আজকের এই বাংলাদেশের বিবেক আমাদের প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর যাত্রা শুরু ১৯২১ সালে। ঢাবির এই ৮৭ বছরের ইতিহাস যেমন ঘটনাবহুল তেমনি এর প্রতিষ্ঠা পূর্ব ঘটনাবলীও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ভারতের শাসন ভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে বৃটিশ রাজের হাতে হস্তান্তর হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর থেকে। এ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল বৃটিশ ভারতের বাংলা থেকে। ভারতীয় জাতিগুলির মধ্যে বাঙালিরা ছিল সবথেকে সুচিহ্নিত জাতীয় স্বকীয়তার অধিকারী এবং তারা ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম ছিল। বাঙালিরা চিরকাল পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিল। বাংলার বিদেশী শাসন কখনই সুস্থির হয়নি। ফলে বৃটিশরা এক্ষেত্রে তাদের বিভেদনীতি প্রয়োগের কূটকৌশল গ্রহণ করে।

দুই বাংলায় বিভেদ সৃষ্টির উপকরণ বৃটিশদের হাতেই ছিল। এর প্রথমটি ছিল ধর্ম ও দ্বিতীয়টি ছিল পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ মুসলমান, এবং পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ মানুষ হিন্দু। অন্যদিকে বাংলার সব থেকে উৎপাদনক্ষম অংশ হওয়া স্বত্তেও পূর্ব বাংলা শিল্প-বানিজ্য, শিক্ষা, প্রভৃতিতে পশ্চিম বাংলা থেকে অনেক পিছিয়েছিল। কলকাতায় বিলাসবহুল জীবপন যাপন করা জমিদার সম্প্রদায়ের বেশির ভাগের জমিদারীই ছিল পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলার প্রধান শহর ঢাকা, পশ্চিম বঙ্গের কলকাতার তুলনায় কিছুই ছিল না। অথচ, ঢাকা শহর যখন মুঘল সম্রাজ্যের বাংলা সুবার রাজধানী কলকাতা তখন নিছক কতিপয় গ্রামের সমষ্টি।

বৃটিশদের সাথে বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে ও ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে বাংলার হিন্দুরা সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজধানী কলকাতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রভাব পোক্ত হয়। এর অন্যতম কারন পশ্চিমবঙ্গ ছিল হিন্দু অধ্যুষিত অন্য দিকে পূর্ব বঙ্গ ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। জনসংখ্যার দিক দিয়ে সমগ্র বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ট ছিল। সেই অনুপাতে পূর্ব বঙ্গের শিক্ষার অবস্থা ছিল বেহাল। গরীব পূর্ববাংলার জনগনের উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে হত কলকাতা। পূর্ববঙ্গের সকল কলেজের মঞ্জুরির ক্ষমতা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এবং পরীক্ষার উত্তরপত্র তারাই মূল্যায়ন করত। কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের নম্বর প্রদানে প্রায়ই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠত।

এদিকে এ সময়ে বাংলা সাহিত্যে যে জোয়ার আসে, তার মূলে ছিলেন কলকাতা নিবাসী হিন্দু লেখক সাহিত্যিকরা। যদিও তারা তাদের লেখনিকে সমগ্র বাংলার মানুষের সমাজ জীবনের প্রতিফলন বলে প্রচার করতেন, কিন্তু তাতে শুধুমাত্র হিন্দুদের কথাই ফুটে উঠত। বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক একবার তাই বলেছিলেন, "তৎকালীন সাহিত্য গুলোতে যত গুলো চরিত্র আছে তাদের নাম পাশাপাশি রেখে পরিসংখ্যান করলেই দেখা যাবে রাম শাম যদু মধুদের সংখ্যা কত আর রহিম করিমের চরিত্রের সংখ্যা কত। অথচ, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ মুসলমান ছিলেন। অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যেও পূর্ববাংলা তার স্থান পায় নি।

এহেন পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেয়। তারা তাদের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রচার করে প্রশাসনিক সুবিধা ও পূর্ববঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গবাসীর কাছে এ ঘোষণা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কারন, নতুন প্রদেশ হলে ঢাকা হবে তার রাজধানী ফলে শুধু মাত্র এই কারনে পূর্ব বঙ্গ আগের থেকে অনেক বেশি সুবিধা লাভ করবে। অন্যদিকে, কলকাতার এলিট সমাজের প্রায় সকলেই

এর বিরুদ্ধে যায়। এই এলিটদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদাররা যাদের জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গে। বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ব বঙ্গকে আর শোষণ করা সম্ভব হবে না এটা তাদের কাছে পরিস্কার ছিল।

তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে পূর্ব বঙ্গের মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী কেউ ছিল না বললেই চলে। এখানকার কতিপয় নেতারা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের দলকে সৈণ্যহীন পান। ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় এবং পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা আবারো তার রাজধানীর গৌরব হারায়। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, টাঙ্গাইলের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রধান নেতা। এরা একপর্যায়ে ভাইসরয়ের সাথে দেখা করেন, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। বলাবাহুল্য, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান শিক্ষিত হবার সুযোগ পেত, সেই সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়লদের প্রভাব থেকে পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো মুক্তি পেত। ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফর করেন এবং ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ফলে এর পেছনে লেগে পড়ে সেই পশ্চিমবাংলার লবি। ড. রাশবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে দেখা করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধীতা করে স্মারকলিপি প্রদান করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অত্যন্ত সক্রিয় ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধীতা করেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জির ব্যাপক প্রতিরোধের ফলে এক পর্যায়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ তার সাথে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়। অবশেষে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন পাঁচটি নতুন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লড়াইয়ে ক্ষান্ত দেন। কিন্তু, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মঞ্জুরী ক্ষমতা প্রদান করতে দেননি। বিধায় ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সব কলেজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই থাকতে হয়েছিল।

এদিকে ১৯১৫ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ মারা গেলে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর নবাব আলি চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হাল ধরেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে ভাটা পড়ে। ১৯১৭ সালে লন্ডনে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নওয়াব আলি চৌধুরী অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। অবশেষে, সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে।

পশ্চিম বঙ্গ লবি এরপরও ক্ষান্ত দেয় না। পূর্ব বঙের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ মুসলমান হওয়ায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ইসলামের ইতিহাস শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ফলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলত "মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়" অথবা "মক্কা অব দি ইস্ট"। অথচ, প্রতিষ্ঠার প্রথমে দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্ররাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ট। তাছাড়া, অদ্ভুত হলেও সত্য হল এই যে এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস এর অধীনে পড়ানো হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম আলাদা বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ খোলা হয়। কলকাতা কেন্দ্রিক এহেন অপমানকর প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাল হয়ে দাড়ান, এর কিছু প্রতিতযশা হিন্দু শিক্ষক। আইনজ্ঞ অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, রসায়নবিদ জ্ঞান ঘোষ, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পদার্থ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং আরো অনেক হিন্দু শিক্ষক সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনার উর্ধে থেকে আমাদের প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার প্রথম দিকে কণ্টকাকির্ন পথ অতিক্রমে সাহায্য করেন। অধ্যাপক নরেশচন্দ্র মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের কাঠামো তৈরি করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দিকে জোর দেন। এই সব শ্রেদ্ধেয় শিক্ষকরা ঢাকার হিন্দু সমাজের কাছ থেকেও বিরোধের সম্মুক্ষিণ হন। প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতা ছিল অনেক বেশি এবং তারা রমনা এলাকায় বঙ্গভঙ্গের সময় গড়ে উঠা বড় বড় সরকারী ভবনে থাকতেন। ঢাকার ঈর্ষান্বিত হিন্দু সমাজ এটা সহ্য করতে অপরাগ ছিলেন।

কলকাতা নিবাসী বুর্জোয়া হিন্দু সম্প্রাদায়ের গোড়ামী বদৌলতেই, এক পর্যায়ে বৃটিশদের কূটকৌশলের জয় হয় এবং মনস্তাত্বিকভাবেই দুই বাংলা পৃথক হয়ে পড়ে। প্রাদেশিক সিমান্ত রেখার আর কোন প্রয়োজন ছিল

না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পেছনে পশ্চিমবাংলার এলিটরা যে সব যুক্তি দেখিয়েছিলেন সেগুলো যে নিছক রাজনৈতিক ছিল তা পরিস্কার হয়ে উঠে ১৯৪৭ এর দেশবিভাগের সময়। আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতারা ভারত-পাকিস্তানের সাথে না গিয়ে স্বাধীন বাংলা দেশের যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি, পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের অসহযোগীতার কারনে। মূলত, ব্যাপারটা ছিল এই রকম, ১৯০৫ সালে পশ্চিমবাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রতিযোগীতায় আসতে পারে এমন কোন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পূর্ব বাংলায় ছিল না। দুই বাংলা এক থাকলে বিনা প্রতিরোধে পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ এ পরিস্থিতি ছিল উলটা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠেছিল একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেনীর নিকট গন্য হয়েছিল প্রতিপক্ষ স্বরুপ। এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে দাড়াবার সাহসের অভাবে কলকাতার বাবুরা আলাদা থাকাকেই শ্রেয় মনে করলেন।

১৯০৫ এ যদি পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হত তাতে ক্ষতি কি হত? ভারতে কত প্রদেশ রয়েছে, তাই বলে কি প্রদেশগুলো এক ভারতের অংশ নেই? সম্পূর্ণ বাংলাকেই যদি তারা এক চোখে দেখে থাকবেন, তবে কেন পশ্চিম বঙ্গের থেকে পূর্ব বাংলা এত পিছিয়ে ছিল? উত্তর একটাই, পশ্চিম আমাদের পূর্ব বাংলাকে শোষণ করেছে। সে পশ্চিমের অংশ যেমন মুঘল, বৃটিশ, পাকিস্তান তেমনি পশ্চিমবঙ্গ। এই পশ্চিমাদের অসহযোগীতায় আমরা পূর্ববাংলাবাসী যদিও পাকিস্তানের সাথে গিয়েছিলাম, তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাঝে স্বাধীনতাবোধ, দেশমাতৃকার প্রতি প্রেম ও বাংলাভাষা কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের যে চেতনার জন্ম দেয় তারই বদৌলতে আমরা জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছি অসম্পূর্ন বঙ্গভঙ্গের সম্পূর্ণ রুপ , আমাদের বাংলাদেশ।

(বিদ্র: লেখাটিতে যে সব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তার সব পাওয়া যাবে নিচের বইগুলোত

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি বছর : অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

২. যদ্যপি আমার গুরু : আহমদ ছফা

৩. বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি : বদরুদ্দীন উমর)

http://www.somewhereinblog.net/blog/onujibblog/28762099

এই খোকা

প্রিয়তি
২৪ শে জানুয়ারি, ২০০৮ রাত ১১:১৯

মনটা খারাপ। কবিতাটা আমি তাদেরকেই উৎসর্গ করছি যারা বাবা, মায়ের কাছে থেকে অনেক অনেক দূড়ে থাকেন।

এই খোকা;
উঠে পর শিগ্রী ভোর হল যে,
স্কুলে যেতে হবে, হাত মুখ ধুয়ে নে।
মন দিয়ে পড়বি সোনা;
খেয়ালের বশে করি না দুষ্টমিটা-
তুই অনেক বড় হবি;
দেশের তরে হবি, এক সূর্যসেনা।

এই খোকা;
মাকে কি মনে পড়ে না তোর?
থাকিস যে তুই সাত সমুদ্রের পর-
জানি তুই অনেক বড় হবি;
মায়ের কথা, খোকা কি ফেলতে পারে?

এই খোকা;
তুই আসবি ফিরে কবে?
এই দু:খিনী মায়ের কোলে।
আচল দিয়ে মোছাবো মুখ;
কোলে নিয়ে ঘুম পারাবো-
চাঁদ মামা মিষ্টি গানের সুরে।

খোকা-
কলমের লিখায় মন যে ভরে না আর

বড্ড দেখতে ইচ্ছে হয় যে তোকে;
আয়না একবার ছুটে আমার কাছে,
দেখবো সোনা, তোকে প্রানটি ভরে।
কতদিন হলো চিঠি আসেনা তোর;
অপেক্ষায় দিন চলে যায়,
মা ডাক শুনবো বলে-
হয় যে মন আকুল-
খোকা, মাকে কি মনে পড়ে না তোর?

এই খোকা,
ভুলিস না যেন নিজের যত্ন নিতে;
অসুখ বাধাস না যেন আবার হেঁয়ালি করে।
মন দিয়ে পড়বি সোনা-
খাবার খেতে ভুলিস না যেন,
একটু সময় করে।

আজ তবে রাখছি;
অনেক চুমু দিয়ে, আমার খোকার গালে;
ভুলিস না তুই লিখতে চিঠি-
তোর দু:খিনী মায়ের তরে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/priotiblog/28763963

আমি.... চিত্র ।

নিবিড় অভ্র
২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ১১:২১

আমার...
জন্মগ্রহন ছিল রৌদ্রের মত প্রখর
চৈত্রের দুপুরে.... মাছ ধরতে যাওয়া বাবাটা আমার,

তার পিঠে চড়া আমার বড় বোন,
ফিরে এসে দেখে আমি এসেছি. . . .
তাদের ঘরে! ! !
যেন একটা ছোট্ট কালো ইঁদুর. . . সময়ের হাত ধরে!
গাঁয়ের লোকেরা আঁধার করে মুখ,
হলোনা ছেলে. . ? আহারে. . . পেলোনা সুখ! ! !
মা আমায় তবু তুলে ধরেন আকাশের কাছে;
শুধু একবার বলে-
চৈত্রের নক্ষত্র_ এই চিত্র,
শুধু আমারই আছে. .

http://www.somewhereinblog.net/blog/nibiravroblog/28773768

"আমার বন্ধু অনিক" - (জনমানুষের ভীড়ে নির্বোধ আরণ্যকের জীবনকাহন)

আরণ্যক যাযাবর
০৩ রা মার্চ, ২০০৮ রাত ১১: ৩০

আমাদের ছেলেবেলায় "মানিকজোড়" বলা হতো,
আমার বাবা বলতেন, অনিকের বাবাও,
আমার আর অনিকের বাবা - দুজনেই বলতেন।
ওরা এক অফিসে চাকুরি করতো,
এক সাথে সকালে জগিং করতে বেরুতো।
অনিকের মা আমার মায়ের সাথে কুটুস কুটুস গল্প করতেন, মাঝেসাঝে এসে।

আমি আর অনিক নাকি "মানিকজোড়" ছিলাম।
আমরা এক স্কুলে পড়তাম, এক সেকশনে এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসতাম।
আবুল হোসেন স্যার আমাদের দুজনকেই একসাথে নীলডাউন
করিয়ে রাখতেন, আমরা দুজনেই একসাথে কথা বলতাম বলে।
গল্পের ভূমিকা এখানেই শেষ।

তারপর করতোয়া নদীর জল অনেক কমে গেছে,
ভাঁপা পিঠা খাওয়া শীতে মফস্বল শহরের ব্রীজটায় দাড়িয়ে
হিমালয়ের চূড়া দেখতে দেখতে আমরা বড় হয়ে উঠেছি।
এরইমধ্যে, আমাদের একই সাথে গোঁফ গজিয়েছে
আমরা একসাথে দুষ্টু ছবি দেখেছি।
আমরা একসাথে বড় হয়ে গেছি। অনিক এবং আমি।
আমরা "মানিকজোড়" ছিলাম।
তারপর আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে পড়ি একদিন,
ধুর, "আমরা" নয়; আমি।

অনিককে আমি ফেলে এসেছিলাম কলেজে
ততোদিনে ও এক দঙ্গল নতুন মানিকজোড় খুঁজে পেয়েছে,

অনিককে ছাড়া তখন মফস্বলের পাতি নেতাদের চলেনা।
আমার মানিকজোড় অনিককে আমি চিনিনা।
ওর মোটরসাইকেল দূর থেকে আসতে দেখলে
আমি অচেনা গলিতে ঢুকে পড়ি।

অনিকের বাবাকে দেয়া কথা আমি রাখতে পারিনি।
উপমা কে দেয়া কথা আমি রাখতে পারিনি।
আমি অনিককে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম।
অনেক দূরে পালিয়ে এসেছিলাম। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে।

অনেক বছর কেটে গেছে। এখনো আমি প্রায়শই আমার মফস্বলে ফিরি।
ছোট্ট মফস্বলের ছোট নদীর ব্রীজের উপরে দাঁড়িয়ে
আমার স্ত্রী ও আমাদের চার বছরের সন্তানটিকে
হিমালয়ের চূড়া দেখাবার চেষ্টা করি।
অনেক খবর কানে আসে।
অনিক এখন ফেন্সিডিলের ব্যবসা করে।
উপমাকে ও বিয়ে করেছে জোর করে তুলে এনে।

প্রিয় পাঠক,
আমি এখন আমার মফস্বলে,
ওয়াই-ফাই এর সুবাদে আপনার খুব কাছাকাছি।
আমার আজখুব অনিকের কথা মনে পড়ছে।
আমার আজখুব অনিকের সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছে।
ওকে জানাতে ইচ্ছে করছে, আমরা আসলেই "মানিকজোড়" ছিলাম।

http://www.somewhereinblog.net/blog/Aronnokblog/28776189

তোমার রক্তপাঞ্জেরী আর আমার ব্লুবেরী রাত

অরন্য আগুন
০৪ ঠা এপ্রিল, ২০০৮ রাত ৯: ৩৫

ম্যাপেল ঝরা ভোরের শীতার্ত আহ্বানে
তোমার বুকের খাঁচা আমার কামনার ওমে,
হার্মিং পাখির মত তিরতির করে কাঁপতো
কত দহন, কত কাঁপন, কত আচড়

ঝিম ধরা দুপুরের মাতাল আবেশে
তোমার এলোচুলে. . . দুপুরের ভাত ঘুমে,
তোমার অগোছালো পোষাক,
আর তোমার ভাজঁ খোলা দেহ. . .
আমার দুহাতের রেখার পরতে পরতে মাখানো. . .
তোমার লোমের গন্ধ!

বিকেলের সোনাঝরা রোদে
আকাশের নীচে হাত পেতে
সমুদ্রে পা ডুবিয়ে থাকা তুমি।
যেন. . . . .
আমার আকাশের পুরোটা জোসনাই তোমার
শরীর থেকে ঠিকরে পরা আতশবাজী!
আর আমার সপ্ততীরের দীপাবলীরা,
তোমাতেই ঠাঁই পায়
তোমাতেই ঘুরে বেড়ায়।

ঘোলাটে সন্ধ্যার আলো-আঁধারীতে
একটুকরো চাদঁ যখন টুক করে গেথেঁ যায় দিগন্তের গায়েঁ,
তুমি এলো চুলে-এলো বেড শীটে।
পরিপাটি এই আমি অহর্নিশ তোমাকে এলেমেলো করে দিই।
তোমার রক্তপাল্জেরীও আমায় পারে না ছুতেঁ! ! !
মাখন তোষক আর মাখন তোমাতে
অসহায় চাঁদের মত
আমি গেঁথে যাই!

আজরাতে আমি স্মৃতিকাতর হবো।
তোমার সোনালী চুলগুলো হবে আমার
ঝলমলে স্মৃতির ছেড়া-খোড়া অংশ।
আজরাতে আমার স্মৃতিরা হবে ইতিহাস!

মাঝরাতের নির্বাক নগরীর মাঝে
তুমি এক উন্মাতাল আর জান্তব শিৎকার তুলে
ক্ষনে ক্ষনেই হারিয়ে যাও অন্ধকারে।
শীতল রাতের শীতল শিশিরেরা এসে
আমাকে আষ্টে পৃষ্টে জাপটে ধরে. . . ।
তবু এতটুকও ভাগ পাবে না তুমি আজ
সেই ব্লুবেরী রাতগুলো আজআর তোমার নয়. . .
সেসব এখন শুধুই আমার।

আবারও নীলচে বেরীতে ছেয়ে যাচ্ছে শীতের রাত।
কাল ভোরে আবারও ম্যাপল ঝরবে।
তিতির পাখি আবারও কাঁপবে আমার বুকের উষ্মতায়।
তবে আমি আর কখনোও কোনদিন ভালবাসা পাবার নেশায়
উদ্বাস্তুর মত সেখানে গিয়ে হোচট খাবো না।

http://www.somewhereinblog.net/blog/aronnoagun/28785275

ভালবাসা! এইতো শেষ।

পুতুল
১৪ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ বিকাল ৪:৩৫

রাধি কি ছিল?
হয়তো কৃষ্ণ!
কে কাকে ভালবাসে!
লাল ফুল ফোটে
সেটাকে কৃষ্ণের জটা ভেবে নাম দেই কৃষ্ণচূড়া।
কামনা করি বলেই হয়তো ফুলটাকে
ভুল করে কৃষ্ণের দান ভেবে মিথ্যে সান্তনা।
প্রকৃতির জঠরে এমন কত যাদু-কুমন্ত্রনা!
লাল ফুলের প্রেমে ভ্রমর আসে!
কৈ মধু পান হয়ে গেলে আর তো বসে না।
জীবনের সুধারস খোঁজে আর কোথা।
অনেক অলীক স্বপ্নের মত জ্বালবোনা
ধরা দেয় যদি বাস্তব হয়ে কলপনা!
আজগুবি সব আলপনা!
দোষ কী তাতে! কল্পনা?
পরাগ মেলে যন্ত্রনা!
দিক ছড়িয়ে স্বপ্ন বেশ
ভালবাসা! এইতো শেষ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/dollblog/28770538

মৃত্যুতেই ক্ষমা - অপেক্ষায় থাকো আরিফুর রহমান

মনিটর
০৭ ই অক্টোবর, ২০০৭ দুপুর ২:৪২

অন্যায়টা অনেক বড় হয়ে গেছে। মারাত্মক অন্যায় করেছ তুমি। কার্টুন একে আঘাত করেছ - 'ইসলামপ্রেমী' মুমিন জনতাকে। ক্ষেপে উঠেছিল বায়তুল মোকাররমের রাস্তা। ইসলামী জোশে লাল কালো ব্যানার নিয়ে দেশের ইসলামী চৌকিদাররা তেড়ে গিয়েছিল ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিন্যুতে। সাফ ফোয়ারার মোড়ে কবি নজরুলের অসহায় মুখ কেবলই টাইলস মোড়ানো দেয়াল। সাম্যের কবি নজরুল বেঁচে থাকলে কী করতেন জানি না।

প্রগতিশীল মতিউর রহমান তখন পাঞ্জাবী পরে ইসলামী সাজ নিয়ে দু'হাত জোড় দিয়ে ক্ষমা চাইল। বেকার হলো সুমন্ত আসলাম। হয়তো আখেরে ওর লাভই হলো। সামনের বইমেলায় ওর বই আরো হিট হবে, কাটতি বাড়বে। শান্তিনিকেতনী শাল পরে সুমন্ত অটোগ্রাফ দিবে কলেজ পড়ুয়া কিশোরীকে। এইভাবে দিন কেটে যাবে।

তোমার দিন কাটে কিভাবে আরিফ? সেদিনের পর থেকে কোন খবর জানেনি দেশের মানুষ। মতি কিংবা সুমন্তরা চুপচাপ। শিশির বিপুল শান্তরা এখন শান্ত ছেলে। তুমি যাদের হাত থেকে সেরা কার্টুনিস্টের পুরস্কার নিয়েছিলে ওরা আবার কনটেস্ট আয়োজন করেছে। জেনে রেখো - ওগুলো শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। চৌধুরীরা তোমার জন্য কিছুই করবে না।

আমিও না।
রোজার মাসে ইফতারীর নামে গিলে যাচ্ছি বাহারী সব খাবার। মুখে গন্ধ, চেহারায় ক্লান্তি নিয়ে সুশীল সমাজের এক অংশ। পারিনা জিরো পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তোমার মুক্তির দাবীতে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিতে। আমি পারি না। কারন, আমি স্বার্থপর, আমি লোভী, আমি অপরচুনিস্ট। আমি ঝাঁকের কৈ। আজ আমি অনেক লোকের সাথে জাতীয় মসজিদের খতিবের জানাযায় অংশ নেবো। দু'হাত তুলে বলবো - পরম করুনাময়, তুমি হুজুরকে ক্ষমা করে দাও।

আরিফ, পরমকরুনাময় হয়তো তোমাকেও ক্ষমা করবে। কিন্তু ক্ষমা করবে না এই নস্টের অধিকারে যাওয়া সমাজ, বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৬০। অপেক্ষায় থাকো আরো ৩৫/৪০ বছর।

তুমিও ক্ষমা পাবে মৃত্যুর পরে। পৃথিবীর ঈশ্বরেরা হাত তুলে বলবে, আরিফকে ক্ষমা করে দাও। আজ বলে রাখি - সে জানাযায় আমি যাবো না।

http://www.somewhereinblog.net/blog/monitorblog/28736023

উটের মুতে ভেসে যায় আমাদের এস এম এস জীবন

লাল দরজা
০৯ ই অক্টোবর, ২০০৭ বিকাল ৫:২৯

আজকের পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতাকে মৌলবাদ দিয়ে আড়াল করে রাখছে। সাম্রাজ্যবাদের সদর দফতর আমেরিকা ও তার শাহেনশা জে. ডব্লিউ. বুশ পরিস্কার বলেদিয়েছে, হয় তুমি আমাদের পক্ষ(অধীন) নয় আমাদের প্রতিপক্ষ(শত্রু)। একবারতো এই কুম্মান্ড দাবী করে বসল, "God speaks through me." তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, দেব দূত!

বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বে নিবিড় ভাবে মৌলবাদ চাষ করে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে কেবল পদদলিতই করে রাখছে না সেই সাথে এই পৃথিবীকে নিয়ত বাস অযোগ্য করে ফেলছে। এক দিকে লোভ লালসা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছে এক শ্রেনীর নির্বোধদের আর এক দিকে বিপ্লব কে দমিয়ে রাখবার জন্যে উসকে রেখেছে অন্ধ মৌলবাদ।

যে তরুনের কাজ ছিল পৃথিবীকে আলোকিত করবার সে হয় ব্যস্ত কর্পোরেট বেতনে নিজের হেরেম রাঙ্গাতে নয়তো যুক্তি-অন্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দিনরাত হিসেব কষছে কি করে নিজের গোর আজাব আর একটু কম করা যায়। একদিকে যখন কোন শপিং কমপ্লেক্সে সেট পরে ঈদের কোন ঝাকানাকা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের তখন এই শহরেরই আশেপাশের বস্তিতে পলিথিন ব্যাগে মুখ গুজে মরণ এক নতুন নেশায় ডুব দেয় এক দল কিশোর। যার কাছে নেশা করবার দুশ টাকা কোন হুমায়ুন আজাদ কিংবা হুমায়ুন আহমেদের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। বাংলাদেশে ধনী আর দরিদ্রের পার্থক্য কি ভয়ানক বেড়েছে সে দিকে দৃষ্টি দেবার সাহস টেলিভিশনের "ঠগ শো" অলাদের কবে হবে।

মানুষ এখন পুজির দৈত্যদের নানা দুস্কর্মের দিকে আঙ্গুল উচানোর স্থলে অতিষ্ট হয়ে আছে হিজবুত টাইপের নানান হুজ্জতির দ্বারা। এটাইতো চায় বিশ্ব ফেরিবাজেরা। যত বেশী পেরেশানি তত বেশী কথা, তত বেশী এস এম এস। এরা আপনার শীর্ষ খবর খাবে, বিস্তারিত খবর খাবে, রাজনীতির খবর খাবে, কৃষি খবর খাবে, খেলার খবর খাবে কিছু দিন পর শোক সংবাদ ও স্পন্সর ধরে প্রচার করবে। জয় বিজ্ঞাপন তরঙ্গ, জয় বিশ্ব বানিজ্য।

২০০ বছেরর দাসত্ব এক ভাবে শেষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু আজকের মুক্ত পৃথিবী আমাদের কয়শত বছরের পরাধীনতা দেয় কে জানে! অথচ আমরা কেমন অদ্ভুত ব্যস্ত রয়েছি, সাবান সুন্দরী প্রতিযোগীতা এবং বিজ্ঞাপন চিত্রের আইডিয়ার অভিনবত্ব অবিষ্কার নিয়ে। কবি তুমি কত আগেই হুশিয়ার করে ছিলে এ জাতির উট মুত্র সেবনের ভয়াবহ পরিনাম!

http://www.somewhereinblog.net/blog/lalblog/28736475

বাস্তবে কাকে ঈশ্বর ভালোবাসেন?

রাসেল (........)
১৯ শে জানুয়ারি, ২০০৮ সন্ধ্যা ৭: ০৭

হাওয়ার্ড স্টার্ন শো বলে একটা রদ্দি কিন্তু জনপ্রিয় টক শো আছে আমেরিকায়। সচ্ছল মানুষের বিনোদন বিলাসিতা আর যৌনতা যদি সঠিক ধরে নেওয়া হয় তাহলে হাওয়ার্ড স্টার্ন শোয়ের জনপ্রিয়তাকে সঠিক বলতে হবে।
যাই হোক সেই শো তে নিয়মিত বিভিন্ন বিকল্প যৌন চাহিদাপুরণের যন্ত্রের ব্যবহার দেখানো হয় এবং এই অভিজ্ঞতা আদতে বিখ্যাত পর্ণো তারকারা কিভাবে ব্যাখ্যা করছে সেটাও আলোচনায় তুলে আনা হয়।

সেখানে একদিন একজন লোকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে- সে গীনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করতে চায়- তার রেকর্ড হবে একটানা কতজন নারীর সাথে সঙ্গম করতে পারে সে এই বিষয়ে-

সে পেপারে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে- তার লক্ষ্য একটানা ৬০ জনের সাথে সঙ্গম করা রেতঃপাত না করেই- আগ্রহী অনেকেই অন লাইন আপ্লিকেশন করে নাম জমা দিয়েছে- বাছাই চলছে- এমন সময়ে এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে-

হাওয়ার্ড স্টার্ন হোস্ট আর সেই রেকর্ডপাগল ব্যক্তি অতিথি- আলোচনার প্রশ্নগুলো ঠিক মনে নেই- তবে একটা ছিলো এই যে আপনার এই ক্ষমতা এটা সম্পর্কে অবগত হলেন কিভাবে?
অতিথি গম্ভীর মুখে বলছে তার কোনো এক অজানা কারণে সঙ্গম করলেও রেতঃপাত ঘটে না- সে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে দেখেছে সে অনেক জনের সাথে সঙ্গম করলেও বীর্যস্খলিত হচ্ছে না- তার এই যোগ্যতা যেহেতু আছে সে একটা ভিডিও করতে চায় যেখানে সে একটানা ৬০ জনের সাথে সঙ্গম করবে-

আলোচনা জমে উঠেছে- ভালোই লাগলো পরবর্তী অংশ দেখতে- সর্বশেষ সংবাদ হলো সে সে বার ৫৭ জনের সাথে একটানা সঙ্গম করেছিলো এবং রেতঃপাত হয় নি।

ঈশ্বর যাকে অনুগ্রহ করেন তাকে ভীষণ ভাবে অনুগ্রহ করেন-
পেয়ারা বন্ধুকে দেন ৩০ জন পুরুষের সমান শক্তি আর কোনো এক অখ্যাত খ্রীস্টানকে দেন ৫৭ জন পুরুষের সমান শক্তি-

আদতে ঈশ্বর তার অনুগত মানুষদের তেমন পছন্দ করেন না।

http://www.somewhereinblog.net/blog/jontronablog/28762418

মাটির কান্না

লেখাজোকা শামীম
১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ বিকাল ৩: ০৫

মাটির কান্না
রচনা : শাহজাহান শামীম
নির্দেশনা : জিকু আহমেদ
প্রথম প্রদর্শনী : ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭
স্থান : নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় পৌর শহীদ মিনার
নাটকের দল : নাটুয়া
স্থান : কোন এক অখ্যাত স্মৃতিসৌধ
সময় : ভোর বা যে কোন মেঘলা দিন ।
(দীর্ঘলয়ে বিলাপ ও তার সাথে করুণ রাখালিয়া বাঁশী ভেসে আসে। কান্না ও বিলাপের মধ্যে কোন একটা গল্প বা কাহিনী বলা হচ্ছে মনে হয় । কিন্তু কান্নার দমকে ও বিলাপের ধাক্কায় সেই কাহিনী অস্পষ্ট করুণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। করুণ সুর ও বিলাপ ছাপিয়ে ভেসে আসে একটি কণ্ঠস্বর ।
কণ্ঠস্বর : মাটির কান্না কি শুনতে পাও ? কান পেতে শোন মাটির কোটরে ফেনিয়ে ওঠা সেই কান্নার সুর । এখানে বাতাস মানে দীর্ঘশ্বাস, এখানে পানি মানে অশ্রুজল, এখানে মাটি মানে কান্নার সুর। শুনতে কি পাও?
(দূর থেকে ভেসে আসে গানের ও কান্নার সুর)
কোরাস : পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্তলাল, রক্তলাল , রক্তলাল।
সময় এসেছে মহাযুদ্ধের
রক্তলাল, রক্তলাল, রক্তলাল।
(গানের শুরুতে চারজন মানুষ একটি পুষ্পস্তবক হাতে মঞ্চে আসে । তারা ধীর ধীরে হেঁটে যায় । গান শেষ হওয়ার আগেই তারা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ দামামা বেজে ওঠে । লাফ দিয়ে মঞ্চে আসে কাফনের কাপড় পরা এক ব্যক্তি । পুষ্পস্তবকটি হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ।)
ব্যক্তি (১) : বেয়াদবগুলো কী মনে করে আমাদের ? সামান্য ফুল দিয়ে করুণা করলেই আমরা খুশিতে বগল বাজাব? বছর শেষে স্মৃতিসৌধে ফুল দেয়ার জন্যই কী আমরা এদেশটা স্বাধীন করেছিলাম ?
(পেছনে অন্য এক ব্যক্তি চিৎকার করে ওঠে)
ব্যক্তি (২) : এই চুপ কর । একদম কথা বলবি না । তোর মত মৃত মানুষের কথা কে শুনবে?
ব্যক্তি (১) : কে মৃত ? আমরা না ওরা ? আম্রা জীবন দিয়ে অমর হয়ে গেছি। আর ওরা এক মৃত জীবন বয়ে নিয়ে চলছে। বোকার মত এ জীবন বয়ে চলার কোন মানে নেই, কোন ল্য নেই, কোন পথ নেই। কেবলই জীবনকে বয়ে নিয়ে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করা।
ব্যক্তি (৩) : ওই যে, আবার প্যাচাল পারবার লাগছে । আরে তুই ব্যাটা মইরা গেছস , তর তো মাথাই নাই । সেইটা কিনা এত ঘামাস । তর কথা কেঠা শুনবে ?
ব্যক্তি (১) : (ব্যক্তি ৩ কে) এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ তোমার মতো । আগেই ভাবে কে তোমার কথা শুনবে, আর কে তোমার কথা শুনবে না । এসব ভেবে উচিত কথাটা বলে না । তাহলে কি এদেশ বাসযোগ্য থাকবে? সুস্থ ভদ্র মানুষ কি এদেশে বাস করতে পারবে ?
ব্যক্তি (৩) : তুমি ভাগ্যবান যে তুমি মইরা গেছিলা । অনেক দুর্ভাগা অহনও বাইচ্যা আছে । শুধু বাইচ্যা আছে তাই না, গণ্ডায় গণ্ডায় পোলাপানও পয়দা করছে । তাগো সবাই মিল্যা এই দেশে থাকতে হইব। মরণ ছাড়া তাগো যাওনের জায়গা নাই।
ব্যক্তি (১) : এভাবে বিবেকহীন বেঁচে থাকার চেয়ে তো মৃত্যুই ভাল । এ জীবন মানে বন্দিত্ব। তার চেয়ে মৃত্যুই অনেক স্বাধীন।
ব্যাক্তি (২) : আবারও বাজে কথা বলছ ? একই ঘ্যানঘ্যান আর কতদিন করবে?

ব্যাক্তি (৩) : এই কথাই তো কইতে লাগছি, বেহুদা প্যাচাল পাইড়া মাথার সার্কিট গরম কইরা লাভ আছে ?
(একটি মেয়েলি বিলাপ ভেসে আসে)
ব্যাক্তি (৩) : (উৎকর্ণ হয়ে শোনে) কেঠায় কান্দে ?
ব্যাক্তি (১) : চিনতে পারছ না, তোমাদের সবার বিবেক কাঁদে । বিচারের বাণী কাঁদে । শহীদের আত্মা কাঁদে।
(ব্যাক্তি ২ উৎসাহিত হয়ে খুঁজতে থাকে)
ব্যাক্তি (১) : খুঁজো না । ও তোমার ভেতরের কান্না - যা হারিয়েছ তার জন্য কান্না, যা চেয়েছ তার জন্য কান্না।
ব্যাক্তি (৩) : থাকো তোমার কান্না ফান্না লইয়া । আমি এই সবে নাই । বন্দুক ধরছি, যুদ্ধ করছি , দ্যাশ স্বাধীন করছি । আমার জীবনের বিনিময়ে এই দ্যাশ স্বাধীন, এইটা ভাবলেই শরীরের কঙ্কালটা মড়মড় কইরা উঠে । অক্ষকে একটা বিশেষ দিন । পুলাপান যদি একটু স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়া মজা লুটে, লুটুক না, আমার কী ? নিজের জানটা দিয়া দ্যাশটা বানায়া দিছি, সেইটা দিয়া ওরা কি করব , সেইটা ওরা ভাবব ? আমরা ক্যান মাথা ঘামামু ?
ব্যাক্তি ১ দুঃখিত গণতান্ত্রিক নিয়মে আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না। আপনার ব্যক্তিগত কবরকে ফুলশয্যা বানিয়ে সুখনিদ্রা দিন। আপত্তি নেই । কিন্তু আমার দাবি থেকে এক পা পিছিয়ে আসব না । এই কান্না আমি থামাবই।
ব্যাক্তি ২ : পারবে না। এ কাজ কোন মৃত মানুষের নয় । তুমি তো মৃত । ১৯৭১ সালে তোমার জীবন থেকে রূপরসগন্ধ কেড়ে নিয়েছে।
ব্যাক্তি ৩ : আমি যাই, তোমাগো ফালতু প্যাচালে আমি নাই। আবার একটা লম্বা ঘুম দিমু। খাওয়া পরার চিন্তা তো আর নাই। দয়া কইরা কবরের শান্তি নষ্ট কইর না তো।
(ব্যাক্তি ৩ চলে যায়)
ব্যাক্তি ১ : কাপুরুষ।
ব্যাক্তি ২ : কাকে তুমি কাপুরুষ বলছ, ও একজন বীর ।
ব্যাক্তি ১ : আমিও একজন বীর উত্তম । অবশ্য আমি তা মনে করি না । পুরো যুদ্ধটা শেষ করতে পারিনি। সিকিভাগ হওয়ার আগেই সরে পড়তে হয়েছে। তবু ওরা মানে ঐ জীবিত মানুষেরা আমাকে বীর বানিয়ে দিয়েছে।
ব্যাক্তি ২ : ভালো করেছে। ওরা আপনাকে সম্মানিত করেছে। আমার ভাগ্যে তো কোন পদবি জোটেনি।
ব্যাক্তি ১ : (হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে) মরে গিয়েও পদবীর লোভ যায়নি।
ব্যাক্তি ২ : (কিছুটা লজ্জা পায়) সম্মান পেতে কে না চায় ? তুমি চাও না?
ব্যাক্তি ১ : চাই । কিন্তু তার আগে সম্মান পাওয়ার যোগ্য হতে চাই এবং যাদের কাছ থেকে সম্মান পাচ্ছি তারাও সৎলোক হওয়া চাই।
ব্যাক্তি ২ : তুমি এক ছাত্র হয়ে একজন অধ্যাপককে জ্ঞান দিচ্ছ?
ব্যাক্তি ১ : মৃত্যুরাজ্যের এই তো মজা । এখানে সবাই সমান । মৃত্যু সবাইকে সমান করে দেয় ।
(ব্যাক্তি ৪ আসে)
ব্যাক্তি ৪ : সমান আর হতে পারলাম কোথায় ? তুমি যেমন করে ভাবতে পার আমি কি তেমন করে ভাবতে পারি ? মৃত্যুরাজ্যে তো বটেই, জীবিত রাজ্যেও লোকেরা কি ভাবতে পারে তোমার মতো?
ব্যাক্তি ২ : তাতে ওর লাভটা কি হলো ? মাথাটা গরম হওয়া ছাড়া ?
ব্যাক্তি ৪ : শোনেন অধ্যপক যেই বয়সে আপনি মরেছেন মানে শহীদ হয়েছেন সেই বয়সে আসতে আসতে অনেক নোংরা বুদ্ধির খেলা আপনি দেখেছেন। কিন্তু এই মাথা গরম লোকটি , যে কিনা আপনার বিশ্ববিদ্যালযে ভর্তি হলে আপনারই ছাত্র হতো , সে তখনও জীবনের এতসব নোংরা খেলা দেখেনি ।
ব্যাক্তি ১ : আপনার সাথে একমত নই । নোংরা খেলা জানা আর নোংরা খেলায় মেতে ওঠা এক কথা নয় ।
ব্যাক্তি ২ : কী বলতে চাও তুমি ?
ব্যাক্তি ১ : আমি বলতে চাই , জীবনের সব নোংরা খেলা জানি। এজন্যই এসব নোংরা খেলার দাঁতভাঙা জবাব দিতে চাই।
ব্যাক্তি ৪ : কী করবে তুমি ?

ব্যাক্তি ১ : এই স্মৃতিসৌধে আর কখনও ওদের ফুল দিতে দেব না।
ব্যাক্তি ২ : পাগল হয়েছ ?
ব্যাক্তি ১ : পাগল কে ? আমি নাকি ওরা ? ওরা যে হতে ফুল দেয় , সেই হাতেই তো ব্যালট পেপারে সিল মারে। যে হাতে ফুল দেয় , সেই হাতে যুদ্ধাপরাধীকে মালা পরায় । যে হতে ফুল দেয় , সেই হাতেই রাজাকারকে
সালাম দেয়। যে হাতে ফুল দেয় , সেই হাতে আলবদরের হাতে হাত মেলায়। যে হাতে ফুল দেয় , সেই হাতেই স্বাধীনতা বিরোধীকে জড়িয়ে ধরে । তারপরও আমিই পাগল , ওরা নয় ?
(দীর্ঘ বিলাপের সুর ভেসে আসে । ওরা কান পেতে শোনে)
ব্যাক্তি ১ : শোনেন ঐ কান্না, যতদিন স্বাধীনতা বিরোধীর মার্কায় ভোট পড়বে, ততদিন এ কান্না থামবে না । যতদিন এদেশের মানুষ ভণ্ড প্রতারককে নেতা মানবে, ততদিন এ কান্না থামবে না। যতদিন মানুষ দুর্নীতিবাজদের ভোট দেবে, ততদিন এ কান্না থামবে না।
ব্যাক্তি ২ : আমরা জানি সেটা । এদেশের মানুষ বার বার ভুল করে। ১৯৭১ এর ফসল ঘরে তুলতে গিয়ে ভুল করেছে , ১৯৯০ এর ফসল ঘরে তুলতে গিয়ে ভুল করেছে এবং ২০০৮ এও ভুল করবে। জনগণের
বিজয়ের ফসল বার বার তারা তুলে দিয়েছে দুর্নীতিবাজদের হাতে, ভণ্ডের হাতে, প্রতারকের হাতে । ভীষণ রকম বোকা এদেশের লোক। সমাজের সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে জঘন্য, সবচেয়ে নোংরা, সবচেয়ে টাউট লোকটাকে ভোট দিয়ে নেতা বানিয়ে দেয়।
ব্যাক্তি ৪ : দুঃখে বুকটা ফেটে যায়। এই জন্য বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছিলাম ? ভাবতে পারেন, এই দেশের লোক এক যুদ্ধাপরাধীকে ভোট দিয়েছে , এদেশের লোকের ভোটে একজন ধর্ম ব্যবসায়ী , স্বাধীনতা বিরোধী সংসদে বসেছে। মন্ত্রী হয়েছে। স্বাধীন দেশের পতাকা উড়েছে একজন রাজাকারের গাড়িতে।
(ব্যাক্তি ১ পাগলের মত হাসতে থাকে । দীর্ঘলয়ে বিলাপের সুর ভেসে আসে ।)
ব্যাক্তি ৪ : ভেবেছিলাম ওটা সাময়িক ভুল । অল্প কিছু লোকের বোকামি । কিন্তু যে দিন রাজাকারের গাড়িতে এ দেশের পতাকা উড়ল , একটা আগুন মিছিল নামল না রাজপথে, কোন বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনি উঠল না, একটা বজ্রমুষ্ঠি বাতাসে জেগে উঠল না । লজ্জায়, অপমানে আমার হাড়ে হাড়ে কিলবিল করে উঠল । হায় আমাদের স্বাধীনতার কী জঘন্য অপমৃত্যু!
(নেপথ্যে থেকে নারীকণ্ঠের বিলাপ ভেসে আসে । একজন নারী আসে।)
মহিলা ১ : ওরা ভুলে গেছে ওদের জীবনে কোন '৭১ ছিল । ওরা ভুলে গেছে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা । ওরা ভুলে গেছে ২ লক্ষ বীরাঙ্গনার কথা । ওরা ভুলে গেছে সংবিধানের ৪টি মুক্তি সনদের কথা । ওরা এখন অন্ধ, ওরা এখন বোবা, ওরা এখন কালা। ওরা এখন মৃতের চেয়েও বেশি মৃত। পৃথিবীতে এত বোকা জাতি একটিও নেই। বিজয়ী হয়ে পরাজিতের শাসন মেনে নেয়ার এমন নজীর পৃথিবীতে আর একটিও নেই। আমরা মরে গিয়ে যতটুকু জীবিত আছি, ওরা বেঁচে থেকে তার চেয়ে বেশি মরেছে। ওদের বিবেক মরেছে। ওদের সততা মরেছে। ওদের দেশপ্রেম মরেছে। ওরা একটি মৃত জাতি।
ব্যাক্তি ১ : প্রথমে ওরা বলল , পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। যারা পাকিস্তানের পক্ষে নয় তারা মুসলমান নয়। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝলাম , ধর্ম কায়েম নয়, শোষণ কায়েমই ওদের লক্ষ্য। '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা সেই বেড়াজাল ভাঙলাম। কিন্তু ইসলাম নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ হল না । ইসলাম কায়েমের নামে তারা গণতন্ত্রকে তুলোধুনো করল । কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার স্বাদ নেয়ার জন্য তারা ভোল পাল্টাল। নারী শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলল । কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ নেয়ার জন্য নারীর পদলেহন করল । ইসলাম কায়েম এদের কাছে মূল বিষয় না । ক্ষমতায় গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ানোই এদের টার্গেট। যে কোন দুর্নীতিবাজের মতো এদেরও লক্ষ্য নগদ সম্পদ । তাই তারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েও ইসলামের পক্ষে একটি কথাও বলেনি।
(ব্যাক্তি ৩ আসে । বিরক্ত)
ব্যাক্তি ৩ : কবরের শান্তি নষ্ট করবার লগছ ক্যান? দ্যাশটা স্বাধীন কইরা কি বিরাট কাম কইরা ফালাইছ নাকি ?
ব্যাক্তি ১ : জোর করে শান্তি বজায় রাখার মতো অশান্তি আর নেই। সমুদ্রের উপরটা শান্ত থাকলেও ভেতরের স্রোত কিন্তু থেমে থাকে না।

মহিলা ০১ : তাই তো ইসলাম কায়েমের নামে আমরা পেলাম আত্মঘাতী বোমা। ইসলাম কায়েমের নামে দেশ ভরে গেল ভয়ঙ্কর জঙ্গীবাদে। ইসলাম কায়েমের নামে মরে গেল কত নিরপরাধ মানুষ। ইসলাম কায়েমের নামে কত মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেল। ইসলাম - এই পুরোনো অস্ত্রে এ দেশের মানুষ বার বার ঘায়েল হয়েছে। এই পুরোনো অস্ত্রে এদেশে বারে বারে অশান্তি এসেছে। অথচ ইসলাম মানে তো শান্তি। আহ্ শান্তি , তুমি কোথায় ?

কোরাস : পূর্ব - দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল ।
সময় এসেছে মহাযুদ্ধের
রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল ।

ব্যক্তি ৪ : ওই যে , ওরা আবার আসছে । ওদের হাতে পুষ্পস্তবক।

ব্যক্তি ১ : ওদের এই করুণা আর অপমান আমরা মেনে নেব না । ওদের নোংরা হাতের ফুল নেব না।

ব্যক্তি ২ : কী করবে তুমি ?

ব্যক্তি ১ : কিছুই যদি না করতে পারি কমপক্ষে তো ঘৃণায় থু থু ছিটাতে পারব ।

ব্যক্তি ৩ : (লাফ দিয়ে হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে) যার শইলে রক্ত মাংসই নাই, তার আবার থু থু ।

ব্যক্তি ৪ : আমার হাড়ের ভেতর যেটুকু আগুন আছে , সেটুকু আগুন ওদের রক্তেও নেই।

(ব্যক্তি ২ চলে যেতে থাকে)

ব্যক্তি ১ : কোথায় যাচ্ছেন ?

ব্যক্তি ২ : তোমাদের এই হাঙামার মধ্যে আমি নেই ।

ব্যক্তি ৩ : উনি জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবি মানুষ, কুলি কামলার মতো পাছড়া পাছড়ি করব নাকি ?

(দাঁত কেলিয়ে হাসতে থাকে ব্যক্তি ৩)

ব্যক্তি ২ : অসহ্য একটা লোক ।

(ব্যক্তি ২ চলে যায়)

মহিলা ১ : ঐ যে ওরা আসছে ।

কোরাস : পূর্ব - দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল ।
সময় এসেছে মহাযুদ্ধের
রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল ।

(গান গাইতে গাইতে পুষ্পস্তবক হাতে ঢোকে ৩ জন পুরুষ ও একজন নারী । পুরুষদের গায়ে পাঞ্জাবি ও নারীটির পরনে শাড়ি । তারা সবাই গান গাইতে গাইতে পুষ্পস্তবক নিয়ে এগিয়ে যায়। মৃত ৪ জন তাদের ঘিরে একটি বৃত্ত রচনা করে । বাজনার তালে তালে তারা ৪ জন মৃত মুক্তিযোদ্ধা শুরু করে তাণ্ডব নৃত্য । তাণ্ডব নৃত্যের বাজনার তালে জীবিত ৪ জনের গান হারিয়ে যায়। ওরা যখন পুষ্পস্তবক বেদীতে দিতে যায়, সেই মুহূর্তে ৪ জন মৃত মুক্তিযোদ্ধা পুষ্পস্তবক ধরে ফেলে । ওরা চেষ্টা করে পুষ্পস্তবক বেদীতে রাখতে । পারে না । মৃত ৪ মুক্তিযোদ্ধার সাথে ওরা কিছুতেই পেরে ওঠে না । ওরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় ।)

নারী ১ : (ভয় পেয়ে) ও মাগো !

পুরুষ ১ : অবাক কাণ্ড !

পুরুষ ২ : ওটা ঐভাবে শূন্যে ঝুলে আছে কেন ?

পুরুষ ৩ : এরকম অদ্ভুত কাণ্ডতো কখনো দেখিনি !

নারী ১ : চল , আমরা চলে যাই ।

পুরুষ ১ : ওটা কি ওভাবেই ঝুলে থাকবে ?

পুরুষ ৩ : থাক না, সমস্যা কী ?

পুরুষ ২ : দাঁড়াও , ওটাকে আমি স্মৃতিসৌধে নামিয়ে রাখব ।

নারী ১ : ওখানে যেও না

(পুরুষ ২ পুষ্পস্তবকের কাছে যায় । ওটাকে ধরার চেষ্টা করে । পুষ্পস্তবকটি সরে যায় । পুরুষ ২ ভয় পেয়ে যায়।)

কোরাস :

ব্যক্তি ১ : আমরা ফুল নেব না ।

ব্যক্তি ৩ : আমরা ভুল নেব না ।

ব্যক্তি ৪ : আমরা ফুল নেব না ।

মহিলা ১ : আমরা ভুল নেব না ।

(তিন পুরুষ ও এক নারী ভয়ে কুকড়ে যায় । ব্যক্তি ১, ৩, ৪ ও মহিলা ১ পুষ্পস্তবক তুলে ধরে।)

কোরাস : আমরা চাই না করুণার ফুল
আমরা চাই না নোংরা হাতের ফুল
আমরা চাই না অপমানের ফুল
আমরা চাই না ভুল লোকের ফুল

পুরুষ ২ : তোমরা কারা?

ব্যক্তি ১ : আমরা মুক্তিযোদ্ধা ।

পুরুষ ২ : আমরা তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

ব্যক্তি ১ : কারণ তোমাদের দৃষ্টিতে আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তোমরা আমাদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বল ।

পুরুষ ১ : আপনারা কি মৃত ?

ব্যক্তি ৪ : আমরা অমর । প্রতিটি মুক্তিপাগল মানুষের বুকে রয়েছে আমাদের নাম ।

নারী ১ : ফুলটা ওরকম ঝুলে আছে কেন ?

মহিলা ১ : আমরা ফুল নেব না । তোমাদের দেয়া এই ফুল সম্মানের নয়, ভণ্ডামির ।

পুরুষ ৩ : আমরা আপনাদের সম্মান জানাতে চাই ।

(ব্যক্তি ১ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে ।)

ব্যক্তি ১ : গত ছত্রিশ বছর ধরে সবাই সম্মান জানাতে গিয়ে আরও অপমানিত করেছে । আমাদের স্বপ্ন, সংগ্রাম, অগ্নিযুগের কথা সবাই ভুলে গেছে ।

ব্যক্তি ৩ : মানে ব্যপারটা হইল গিয়া আপনেরা আমাগো একদিকে ফুল দ্যান, অন্যদিকে রাজাকারগো ভোট দ্যান - এইটা তো হইবার পারব না ।

পুরুষ ২ : আমরা তো রাজাকারকে ভোট দেই না ।

ব্যক্তি ৩ : তাইলে রাজাকারেরা সংসদে গিয়া ঐ জায়গাটা অপবিত্র করল ক্যামনে ? মন্ত্রী হয়া দেশের পতাকার অপমান করল ক্যামনে ? তারা কি জ্বীন ভুতের ভোটে পাস করছে ? আপনেরা কি ভোট দ্যান নাই ?

(ওরা চারজন পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে)

ব্যক্তি ৩ : তারপর ধরেন গিয়া, শান্তি কমিটির লোকগুলানরে ভোট দিয়া চেয়ারম্যান মেম্বার বানাইছে ক্যাডা? আপনেরা না ? এইসব হালুয়ারুটির লোভী লোকজনরে বার বার ভোট দিয়া দ্যাশটারে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানাইছে ক্যাডা ? আপনেরা না ? আপনেরা কি কোনদিন সৎলোকেরে ভোট দিছেন ? পাশ করাইছেন তাগো ?

নারী ১ : এসব বিষয় নিয়ে নেতারা ভাববে । আমরা তো সাধারণ জনগণ ।

ব্যক্তি ৩ : এই তো ভুল বললেন । নেতা বানানোর যাদুমন্ত্র আপনের হাতে । আপনের ভোট ছাড়া কেউ নেতা হইবার পারব না । আপনের ভোট ছাড়া কেউ কোনদিন সংসদে বসতে পারব না।

ব্যক্তি ১ : এই সব কথা ওরা জানে । এবার আসল কথাটা বলেন।

ব্যক্তি ৩ : আসল কথা , আসল কথা আবার কেনডা ?

ব্যক্তি ১ : আসল কথা হল যতদিন পর্যন্ত এই দেশে একটা যুদ্ধাপরাধী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা ফুল নেব না । আমাদেরকে বার বার অপমান করতে দেব না । নিয়ে যান আপনাদের ফুল ।

(ব্যক্তি ১ ফুলটা ছুড়ে মারে । ধরে পুরুষ ২)

ব্যক্তি ৪ : যেই সব রাজাকারদের নেতা বানিয়েছেন, এ ফুল নিয়ে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিন, আপত্তি নেই । কিন্তু ওদের সাথে সম্পর্ক রেখে আমাদের সম্মান জানানোর ভণ্ডামি আর করবেন না ।

ব্যক্তি ৩ : আমরা সাড়ে তিন হাত কবরে শুইয়া মাটির কান্না শুনি । আমাগো কবরের শান্তি নষ্ট হইয়া যায় ।

ব্যক্তি ১ : কান পেতে শুনুন বাংলা মায়ের কান্না । তার সন্তান হত্যার বিচার আজও হয়নি । খুনীদের বিষাক্ত নিশ্বাসে বাতাসে গুমোট হাহাকার ।

(ভেসে আসে দূরাগত বিলাপ ধ্বনি)

ব্যাক্তি ১ : ওই যে মা কাঁদছে । বিচারহীনতার লজ্জায় তার এই বিলাপ । তবু আপনারা খুনিদের বিচার করবেন না । যুদ্ধাপরাধীদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না ?
ব্যাক্তি ৪ : আর কত অপেক্ষা করবেন? আমাদের ঠাণ্ডা হাড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে অথচ আপনাদের সতেজ রক্তে কোন বিস্ফোরণ নেই । কী হয়েছে আপনাদের ? বিবেক মরে গেছে ? সত্য ভুলে গেছেন ? অন্ধের চেয়েও বেশি অন্ধ, বোবার চেয়ে বেশি বোবা, কালার চেয়ে বেশি কালা । কী হয়েছে আপনাদের ?
পুরুষ ২ : আমরা ভুল করেছি । আগাছা পরিষ্কার না করলে ফসল মরে যায় । পঁচা অঙ্গ না ফেললে মানুষ মরে যায় । আমাদের সমাজের সেই পঁচা মানুষগুলোকে ভাল মানুষের দল থেকে বের করে দিতে হবে, নইলে তারা গোটা সমাজটাকে পঁচিয়ে ফেলবে।
ব্যাক্তি ১ : সাবাশ । আপনি এই প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা । আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি , আপনারা দেশকে রাজাকারমুক্ত করুন । নইলে এ দেশে শান্তিতে থাকতে পারবেন না । আস্তিনের সাপ আপনাকে ছোবল দেবেই ।
মহিলা ১ : যেদিন দেশ রাজাকারমুক্ত হবে, যুদ্ধাপরাধীমুক্ত হবে, সেদিন এদেশ প্রকৃত স্বাধীন হবে । সেদিন থেমে যাবে মাটির কান্না, বাংলা মায়ের দীর্ঘশ্বাস । সেদিন তোমরা ফুলের ডালি নিয়ে এসো, আমরা হাততালি দিয়ে তোমাদের স্বাগত জানাব। ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে এই পবিত্র স্মৃতিসৌধ ।
নারী ১ : আমরা কথা দিচ্ছি, যেদিন দেশ যুদ্ধাপরাধী মুক্ত হবে, এই স্মৃতিসৌধে সেদিন ফুল নিয়ে আসব সেই ফুল হবে শ্রদ্ধার, সম্মানের ; ভণ্ডামির নয়।
পুরুষ ১ : আজথেকে শুরু হল যুদ্ধাপরাধীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ । শান্তির জন্য যুদ্ধ ।
ব্যাক্তি ৪ : পৃথিবীর সব সভ্য দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে । জার্মানীতে, যুগোশ্লাভিয়ায় , কম্বোডিয়ায় - যুদ্ধাপরাধীরা কখনো মুক্তি পায়নি । কক্ষণো নয়। আমরা কি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করব না ? আমরা কি সভ্য জাতি নই ?
পুরুষ ৩ : আমরা কথা দিচ্ছি, দেশকে যুদ্ধাপরাধীর কবল থেকে মুক্ত করব । সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেব , আমরাও সভ্য জাতি ।
ব্যাক্তি ১ : আমরা বিশ্বাস করলাম, আপনারা আমাদের স্বপ্ন , সংগ্রাম ও দিন বদলের সাধনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন । আজকের প্রজন্মের আপনারা আমাদের প্রতিনিধি । আসুন আমরা সেই স্বপ্ন , সংগ্রাম ও দিন বদলের সাধনায় একাত্ব হই ।
(ব্যাক্তি ১, পুরুষ ২কে , ব্যক্তি ৩ পুরুষ ১ কে, ব্যাক্তি ৪ পুরুষ ৩ কে এবং নারী ১ মহিলা ১ কে জড়িয়ে ধরবে । তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এমন এক ভঙ্গি করে যাতে বোঝা যায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা এ প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধাদের দেহে ঢুকে গেল । তারপর শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা চলে যায় ।
এখন পুরুষ ২ ব্যাক্তি ১ এর মত করে , পুরুষ ১ ব্যাক্তি ৩ এর মতো করে , পুরুষ ৩ ব্যাক্তি ৪ এর মতো করে এবং নারী ১ মহিলা ১ এর মত করে কথা বলবে ।)
পুরুষ ২ : এই মৃত পঁচা জীবন আমরা চাই না ।
পুরুষ ১ : আবার যুদ্ধ করমু । এইবার আগাছা সাফ করার যুদ্ধ । রাজাকার মুক্ত করার যুদ্ধ ।
পুরুষ ৩ : হাড়ের মধ্যে যে আগুন আছে, সেই আগুনে পুড়িয়ে মারব ওদের ।
নারী ১ : আমরা ভুলিনি ৫২, ৭১, ৯০ । আবার এক ভোট বিপ্লবে ভেসে যাবে সকল ধান্দাবাজ, দুর্নীতিবাজ ও যুদ্ধাপরাধী। প্রতিটি ভোট আমাদের জন্য একটি বিপ্লব। এই বিপ্লবে ক্ষমতায় আসবে সৎ, কর্মঠ ও দেশপ্রেমিক নেতা।
পুরুষ ২ : দুর্নীতিবাজ, যুদ্ধাপরাধী ভাই ভাই , এক দড়িতে ফাঁসি চাই ।
পুরুষ ১ : আগাছামুক্ত জমিতে আমরা সোনালি ফসল ফলামু । গোলা ভইরা উঠব সুখ আর শান্তিতে ।
পুরুষ ৩ : একটি ভোট বিপ্লবের আগুনে পুড়ে সোনার মত খাঁটি হয়ে উঠবে এই দেশ ।
নারী ১ : আমাদের ভোট বিপ্লব অরাজকতার বিরুদ্ধে , দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে । এসো আমরা সবাই এই বিপ্লবে হাতে হাত রাখি ।
(ওরা সবাই হাতে হাত রাখে)
সমাপ্ত।

http://www.somewhereinblog.net/blog/amishamimblog/28771996

স্টেরিওটাইপের কথকতা

রাগিব
২৬ শে মার্চ, ২০০৮ রাত ১:১৯

স্টেরিওটাইপ শব্দটা মূলত ঋণাত্মক অর্থেই ব্যবহৃত হয় ... কাউকে তার কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঢালাও ভাবে কিছু একটা ভাবাই এর অর্থ। কমেডি ঘরাণার মূল কৌশলগুলোর মধ্যে এটি একটা ... ভাঁড় গোছের চরিত্রকে দিয়ে ভাড়ামি করাতে হলে তাকে স্টেরিওটাইপড করে ফেলা যায়, আর যে গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা, তাদের দুর্নাম যেকারণে, তা দেখিয়ে দর্শকদের (যারা আবার ঐ গোত্রে পড়েনা) বিস্তর আমোদ দেয়া চলে।

বাংলা নাটকে এই রকম স্টেরিওটাইপের ছড়াছড়ি। আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে যেসব নাটক হতো, তার নাট্যকারেরা উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসতেন বলে মনে হয় (হয়তোবা আমিও এখানে স্টেরিওটাইপে ফেলছি তাদের)। সেজন্য অধিকাংশ নাটকেই কমিক রিলিফ চরিত্রটি হতো নোয়াখালী বা চট্টগ্রামের, অবোধ্য অমার্জিত শব্দ চয়নে যাদের বিমল আনন্দ। নাটকের ঘটক হবে গোলটুপী পরা, বাম গালে একটা বড় আঁচিল থাকবে, হাতে একটা ছাতা। আদিবাসী কাউকে দেখাতে হলে তার নাম হবে মলুয়া, কথা বলবে “বটেক”, “বাবু”, “হামি” এরকম ভাষাতে। গ্রামবাসী নায়ক নায়িকার মা কথা বলবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রংপুরের ভাষাতে, অথবা নিতান্তই “শুদ্ধ” ভাষাতে। মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রটি হবে হতদরিদ্র, এবং অধুনা-ক্ষমতাধর-পূর্বে রাজাকার মোড়লের হাতে নিগৃহীত। নাটক থেকে সিনেমাতেও আসবে এসব স্টেরিওটাইপ, নায়িকার বড়লোক বাবার নাম হবে অবধারিত ভাবে “চৌধুরী সাহেব”, বাড়ির ভেতরে পরবেন ড্রেসিং গাউন, ধুমপানের পাইপ হাতে সিঁড়ি বেয়ে নামবেন। নায়ক গরীব কিন্তু শিক্ষিত হলে নির্ঘাত হবে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বাংলা নাট্যকারদের দোষ দেই কীভাবে, স্বয়ং শেক্সপিয়ারের নাটকে স্টেরিওটাইপের ছড়াছড়ি ... ইহুদি শাইলক হয় ভিলেন, চার্লস ডিকেন্সের অলিভার টুইস্টের ঘৃণ্য ভিলেন ফ্যাগিনকেও দেখানো হয়েছে ইহুদি। সেরকম হালের মারদাঙ্গা টাইপের হলিউডী ছবিতে ভিলেনটা হয় আরব মুসলমান।

নাটক-সিনেমা থেকে বাস্তবতার মধ্যেও একই দশা। হিন্দু হলেই ধরে নেয়া হবে, ব্যাটা একটু পরেই সব কিছু পাচার করে দেবে ভারতে, অথবা আওয়ামী লীগের সমর্থক হবে। কারো মাথায় টুপি থাকলে, বা মুঠোখানেক দাড়ি থাকলে সন্দেহ হবে, জামাত-শিবির কি না। চারুকলা কিংবা স্থাপত্যের ছাত্রদের হতে হবে লম্বা এলোমেলো চুলের সিগারেট ফোঁকা চেহারা, আর বুয়েটের প্রকৌশলবিদ্যার কারিগরেরা হবে চশমাপরা নিরীহ চেহারার বিশিষ্ট আঁতেল। বুদ্ধিজীবীরা হবে ফতুয়া বা পাঞ্জাবী পরা, কাঁধে শাল। সাফারি সুট কিংবা মুজিব কোটে বেরিয়ে আসবে রাজনৈতিক পরিচয়।

এহেন মানসিকতা অব্যাহত থাকবে দেশের বাইরে এলেও। কৃষ্ণাঙ্গ দেখলেই সন্দেহ হবে, ছিনতাই করবে নির্ঘাত এখনই। (আমার এক বাঙালি বন্ধু এই সমস্যাতে পড়ে প্রায়ই ... হুডতোলা জ্যাকেট পরে ক্যাম্পাসের রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যায় হেঁটে গেলে নাকি উলটো দিক থেকে আসা ছেলে মেয়েরা সবাই ভয় পেয়ে রাস্তা পেরিয়ে অন্য দিকে হাঁটে)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বা পাকিস্তানীদের স্টেরিওটাইপ কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিলো মুদী দোকানদার হিসাবে ... ইদানিং অবশ্য গাদায় গাদায় দক্ষিণ এশীয় প্রকৌশলীদের দেখে সেটা কমেছে। ভিলেনের স্টেরিওটাইপের ব্যাপারটা কালে কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালটে গেছে ... বর্ণবাদের আমলে ভিলেন হতো কৃষ্ণাঙ্গরা ... তাদের „পাশবিকতা“ দেখানো হতো, আর শ্বেতাঙ্গ নায়ক অসহায় নায়িকাকে উদ্ধার করতো এই কৃষ্ণাঙ্গ ভিলেনের কবল থেকে। বিংশ শতকের শুরুতে ইতালীয়দের অভিবাসন বেড়ে যায়, আর দরিদ্র ইতালীয় অভিবাসীরা অনেক শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীর কাজ আরো কম বেতনে করে হাতিয়ে নেয়। ফলে সে সময়কার গল্প নাটকে সিনেমাতে ভিলেনের স্টেরিওটাইপে এসে পড়ে ইতালীয়রা। ইহুদীবিদ্বেষ অব্যাহত থাকায় ধনী ভিলেন দেখানো হতো এই ধর্মাবলম্বী কাউকে। সত্তরের দশকের শেষ থেকে আশির দশক জুড়ে জাপানি ব্যবসায়ীরা নবলব্ধ বিত্তে কিনতে থাকে আমেরিকার সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এ সময়ের এশীয়-

বিরোধী স্টেরিওটাইপিংটাও লক্ষ্যনীয়। গল্প সিনেমাতে এশীয় পুরুষ হলেই হতো গ্যাংস্টার, ধুর্ত ব্যবসায়ী, কিংবা বেকুব গোছের বোকাসোকা দোকানদার - মূল নায়কের সাথে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বোল বলে হাসির পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই তার কাজ।

অবশ্য স্টেরিওটাইপ নিয়ে মস্করাও কম করা হয় না টিভি/সিনেমাতে। জনপ্রিয় মার্কিন কার্টুন দ্য সিম্পসন্সের সবগুলো চরিত্রই ইচ্ছাকৃতভাবে চরম স্টেরিওটাইপড। ভারতীয় মুদী-দোকানী অপু, কুটকৌশলী ব্যবসায়ী মিস্টার বার্ন্স, হোমার সিম্পসন নিজেই - সবই বিভিন্ন স্টেরিওটাইপ, আর ইচ্ছা করেই তাদের বিভিন্ন আচরণ দেখিয়ে স্টেরিওটাইপিংকেই মস্করা করা হয়। একই ব্যাপার দেখি আরেক জনপ্রিয় কার্টুন „ফ্যামিলি গাই“-তে, সবাই সেখানে স্টেরিওটাইপড, সবার কাজই স্টেরিওটাইপ অনুসারে।

স্টেরিওটাইপিং নিয়ে যতই আলোচনা করা হোক না কেনো, হয়তো এটা থেকে বেরুনো সম্ভব না আমাদের কারো পক্ষেই। অনেক চিন্তা করে যা মনে হয়, এটা মানুষের অবচেতনে প্রোথিত একটা ব্যাপার - সেই আদিম কালে মানুষ যখন প্রকৃতি আর অন্য প্রাণীদের সাথে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হতো এক মুহুর্তেই যে, সামনে যা এসেছে তা শত্রু না মিত্র। আর সেই ক্ষণিক-সিদ্ধান্ত নিতে হলে চেহারা দেখে আন্দাজ করাটাই একমাত্র কৌশল . . . আচরণ-বিচার করার সময় কোথায়।

পূর্বপুরুষদের সেই প্রবৃত্তি আজওহয়তো রয়েছে আমাদের মনের গহীনে, তাই দেখামাত্র কাউকে ফেলে দেই স্টেরিওটাইপে, লেবেল লাগিয়ে দেই ইচ্ছে মতো। হয়তো এই প্রবৃত্তির কবল থেকে মুক্তি নেই আমাদের, যতোই চেষ্টা কসরত করি না কেনো।

হয়তোবা এ আমাদের মানবিক সীমাবদ্ধতা।

http://www.somewhereinblog.net/blog/ragibhasanblog/28782505

বছরে এই দিনটিতে ফুল কিনতে কখনও ভুল হয় না

এস্কিমো
১৪ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ সকাল ১১:২৩

দীর্ঘ অর্ধযুগ ধরে প্রেম করে বিয়ে করেছিলাম। এই কথার দিয়ে আমি কোন ভাবেই প্রমান করতে চাচ্ছিনা যে আমি একজন দারুন রোমান্টিক মানুষ ছিলাম। বরঞ্চ অনেকটা কাঠখোট্টা টাইপের মানুষই ছিলাম - এখনও মনে হয় তাই আছি।

এই বিষয়ে কিছু ঘটনা মনে পড়ছে - একটু বলি তাহলে আমার রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর কিছুটা হয়তো আপনারা ধরতে পারবেন। যেমন - অনেক কষ্টে আমার উনি হয়তো বাসা থেকে লুকিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এলো - বসে আছি রমনা পার্কে। পাশ দিয়ে একটা মিছিল গেল বা কোন মন্ত্রীর গাড়ী গেল - সাথে সাথে আমার গল্পের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে হয়ে চল এযেত স্বৈরাচারের প্রসংগে। মোদ্দাকথা প্রেমের সংলাপের চেয়ে - স্বৈরাচার নিপাত যাক শ্লোগানটাই মনে হতো আমার বেশী প্রিয়। আজও সেই প্রসংগ তোলে খোঁচা দিতে ভোলে না আমার সহধর্মিনী। তবে চেষ্টা যে করিনি মাঝে মধ্যে কঠিন সংলাপ দিতে তা নয় কিন্তু। একবার টেলিফোনে রবি ঠাকুরের অমিতের মতো করে কি যে বলতে শুরু করেছিলাম। তখন ও অন্য পাশ থেকে বললো - ঘটনা কি, টিভির বাংলা সিনেমা মনে হয় এখন তোমার প্রিয় অনুষ্ঠান হয়ে গেছে? এই পকথা শুনে এমন চিপসে গিয়েছিলাম - পরে কোন দিনই রোমান্টিক ডায়লগ দেবার চেষ্টাও করিনি।

যাই হোক - যে গল্পটা বলার জন্যে শুরু করেছিলাম। একজন কাঠখোট্টা মানুষ আমি - কিন্তু বছরের একটা বিশেষ দিনে আমার গিন্নীকে ফুল উপহার দিতে ভুল হয়না - এইটা একটা অত্যাচর্য বিষয় হিসাবে আমাকেও অবাক করে দেয়। বিয়ের আগের রোমান্টিকতার বিষয়ে বলেছি। এখনও তার থেকে বদলাইনি। এই যেমন - গত বছর মেরেজ ডে'তে কাজ থেকে ফিরে দেখি গিন্নী বেশ সুন্দর শাড়ী পড়ে টেবিলে ফুল সাজিয়ে রেখেছে। আমি ফুল আর শাড়ীর বিষয়ে কোন কথা না বলেই - টেবিলে রাখা কাচ্চি বিরিয়ানীর সুগন্ধের প্রশংসা করতে শুরু করি। তারপরে কাহিনী না হয় নাই শুনলেন। নিজের জন্ম দিনের কথাতো কখনই মনে থাকে না - এমন কি গিন্নীর জন্ম দিনও ভুলে যাই। কিন্তু অবাক করা বিষয় ছেলের জন্মদিন কখনও ভুলিনা।

সেই আমি গত ৯ বছর যাবত একটা বিশেষ দিনে আমার সহধর্মিনীকে ফুল কিনে দিতে ভুল করিনি।

ঘটনাটা ১৯৯৭ সালের। তখন মাত্র নতুন এসেছি। কাজ পাওয়া খুবই কঠিন। একটা এজেন্সীর মাধ্যমে অস্থায়ী ভাবে কিছু কাজ করি। জানুয়ারী মাসে প্রচন্ড ঠান্ডা আর বরফের ঝড়ের কারনে বেশ কিছু দিন কাজ করতে পারিনি। তাউ বাড়ী ভাড়াও দিতে পারিনি। এই অবস্থায় বিকল্প ছিল - সরকারী সহায়তা (সোসাল) চাওয়া। কিন্তু আমরা ঠিক করেছিরাম কখনও সরকারী সাহায্য নেব না। তাই বাড়ী ভাড়ার জন্যে ১৫ দিনের সময় চেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু তখনও পুরো অর্থ যোগাড় করা যায়নি। আমার শরীরও ভাল হচ্ছে না। তাহরে হয়তো অতিরিক্ত খেটে একটা সমাধান করা যেত।

এর মধ্যে এলো ১৪ই ফেব্রুয়ারী - ভ্যালেন্টাইন ডে। তখনও কানাডার উত্তর - দক্ষিন বুঝে উঠতে পারিনি (পুরাতন ঢাকায় নতুন মানুষ সম্পর্কে এই বাক্যটা ব্যবহৃত হয়)। ভোরবেলা গিন্নী ডেকে উঠিয়ে বললো - সে একটা কাজে যাচ্ছে। ১০ ঘন্টার কাজ। সুতরাং ফিরতে রাত হবে। আমি যে ঠিক মতো খেয়েদেয়ে সারাদিন বিশ্রাম নিই। বোধ হয় গিন্নীর কথা শুনে হা হয়ে ছিলাম কিছুক্ষন। আমি নিজেই যেখানে ঠিকমতো সবকিছু বুঝে উঠতে পারিনি - ও কিভাবে কাজ যোগাড় করে ভোর ৬টায় বের হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক - দিনভর প্রচন্ড দুঃচিন্তায় কাটালাম। রাত নয়টায় প্রিয় গিন্নী এসে হাজির। মুখ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ঠান্ডায় নীল হয়ে গেছে ঠোঁট।

জিজ্ঞাসা করলাম - কি ঘটনা?

ও শুধু বললো - আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দাও। আমি ওয়াশ রুমে গেলাম।

চা শেষ করে একসাথে খেতে বসলাম - তখন শুনলাম আসল ঘটনা। চাকুরী জন্যে এম্প্লমেন্ট নিউজ দেখে ফোন করেছিলো এক কোম্পনীতে। আজ ছিলো ভ্যালেন্টাইন ডে - তাই ফুল বিক্রীর জন্যে ওরা একদিনের জন্যে লোক নিচ্ছে। ও সকালে যাওয়ার পর ওদের গাড়ী করে শহরের বাইরে একটা পার্কের কাছে নামিয়ে দেয় ফুলসহ। প্রচন্ড ঠান্ডায় দাড়িয়ে ওরা দুইজন সারাদিন ফুল বিক্রী করেছে। সমস্যা হয়েছে মুলত পায়ে - কারন বুট না থাকায় বরফ গলা পানিতে ভিজে ঠান্ডায় পা জমেই গিয়েছিলো।

একটা বালতিতে গরম পানি এনে দিলাম - বলরাম সেটাতে পা ঢুবিয়ে বসতে। কোন কথা না বলে তাকিয়ে থাকলাম ওর মুখ এদিকে কিছুক্ষন। তারপর বললাম - পাগলামী করতে গেলে কেন?

ও বললো - সংসারটা আমারও। তুমি কস্ট করবে - আর আমি বসে বসে দেখবো। তা কি হয়।

কথায় কথায় ও আমার দিকে একটা প্যাকেট আর খাম এগিয়ে দিলো। খামে কি আছে জানতাম। কৌতুহল দমন না করেই প্যাকেটটা খোললাম। দেখি একটা সুন্দর সার্ট।

ও বললো - শার্ট পছন্দ হয়েছে? এটা আমার পক্ষ থেকে ভ্যালেন্টাইন গিফট। প্রথম আয় থেকে প্রথম গিফট।

আমি কিছু বলতে চেস্টা হয়তো করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। গলায় কি যে আটকে গিয়েছিলো।

এরপর যখনই ১৪ ই ফেব্রুয়ারী আসে - শত ব্যস্ততার মধ্যেও কে যে বলে দেয় - আজ ভ্যালেন্টাইন ডে। একজনের জন্যে ফুল নিতে হবে। অবাক হবার মতো ঘটনা - গত ৯ বছরে ভুল হয়নি - এবারও হবে না।

http://www.somewhereinblog.net/blog/eskimoblog/28770455

লাল গাড়ি ও আমাদের লাল বালিকারা

মাদারি
০৩ রা ডিসেম্বর, ২০০৭ দুপুর ১:১৬

একঃ
উঠানে উঠানে খেলে বেড়ায় চান মিয়ার বাচ্চাটা, দেখে চান মিয়ার বুক ভরে উঠতে চায়। বাচ্চাটার বড়ই সখ একটা লাল জামার, চান মিয়া টাকাও জমিয়েছে- এবার হয়তো একটা জামা কিনে দিতে পারবে বাচ্চাটাকে- লাল টুকটুকে একটা জামা। বাচ্চার, বাচ্চার মার কোন আবদারে সে সাড়া দিতে পারেনা সচারচর, এবারে বাচ্চাটাকে একটা জামা হয়তো দিতে পারবে- মনের ভিতরে একটা পুলক বোধ করে। কিন্তু তার এই ভাব বেশিক্ষণ দীর্ঘস্থায়ি হয় না; তার বদলে বাসা বাঁধে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। বছর বছর জমি বেঁচতে বেঁচতে একটুকরা জমি এখন তার সম্বল, সেই জমি আর চুকানির একটা জমিতে ইরিধান লাগিয়েছে। সে দিন আর নেই, আগের তুলনায় ফলন বেড়েছে- তার তুলনায় বেড়েছে খরচ, ফসল হওয়ার পর সেটা বেঁচা আরেক ঝক্কি, দাম ওঠে না খরচের- একটাই ফল- ঋণের বোঝা মাথায় ওঠা আর বছর বছর জমি বেঁচা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে। উঠানের খেলায় রত গেদুটাকে দেখে বরং দীর্ঘশ্বাসটা আরো দীর্ঘায়িতই হয়, গেদুটার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শংকা বোধ করে।
চান মিয়ার মাথায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা- ফসলের কি গতি হবে, সময়মত মাটি যদি খাবার না পায়? পুরা সপ্তাহ ঘুরে সারের খোঁজ মেলে না কোথাও, সময় চলে যায়, এখনই যে সার দরকার। অবশেষে মিলেছে সার, কষ্টে-সৃষ্টে জোগাড় করতে পেরেছে টিএনওর কার্ড। তাই নিয়ে ছুটে চলে থানা সদরে, সাথে পাশের বাড়ির আজিজ মোল্লা। ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে দুপুরে গিয়ে মেলে এক বস্তা করে সার; মাথায় যেন বাজ পড়ে- জমি যে খুব ক্ষুধার্ত, এতটুকুন খাবারে কি তার পেট ভরে? আজিজ তার বয়সে মুরুব্বি চান মিয়াকে বড় ভাইয়ের মতই মান্যি করে ও বিশ্বাসও করে- আর বিশ্বাস করে দিয়ে দেয় নিজের সারের বস্তা চান মিয়াকে- বলে, বাড়িতে পৌঁছে দিতে- কেননা সে যাবে একটু হাটে, কিছু বাজার সদাই করবে। হায়রে চান মিয়া, রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে তাকে বিশ্বাসী থাকতে দেয়না, বাড়িতে পৌঁছে জমির দিকে তাকিয়ে, ঋণের বোঝার কথা ভেবে, বাচ্চাটার ভবিষ্যতের কথা ভেবে, ... আর পারে না, জমিকে দিয়ে দেয় দুবস্তা সার!
আজিজ এসে যখন সার চায়, চান মিয়ার চোখ তখন উদাস, বলে- জমির ক্ষুধারে ভাই, তারে খাওয়ায় দিছি তোরটা সহ, এই নে টাকা- বলে ট্রাংক থেকে টাকা নিয়ে আসে, নিয়ে আসে বাচ্চার লাল জামা কেনার জন্য রাখা টাকা সহ। আজিজ টাকার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, সহসা উত্তর দিতে পারে না, তারপর ডুকরে কেঁদে ওঠে বলে, টাকা দিয়ে কি করুম- আমারে সার দাও। আজিজের জমিও যে কম ক্ষুধার্ত না, তার ঘাড়েও যে কম ঋণের বোঝা নেই, সেও যে কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না! চান মিয়া জবাব দিতে পারে না, কেননা সে জানে না কোথায় পাওয়া যায় সার। আজিজ সালিশ ডাকে।
চান মিয়া বোঝে সে চুরি করেছে, বাপ-দাদারা ছিল এলাকায় মান্যিগণ্যি, গরীব হয়ে গেলেও চান মিয়ারেও লোকে ভালো লোক বলেই মানতো; সেই চান মিয়া চোর হয়ে সালিশে যেতে চাইলো না। ফসল ও সার নিয়ে একবুক দুশ্চিন্তা, একগাদা ঋণের বোঝা, আর গেদুটার জন্য অশেষ উতকন্ঠা ও শংকা নিয়ে চান মিয়া কীটনাশক গেলে।

গেদুটার জন্য লাল জামাটা তার আর কেনা হলো না।

দুইঃ
ময়নার মা চোখ ফেরাতে পারেনা যখন ওই লাল গাড়িটার দিকে চোখ যায়। রংটা টকটকে লাল, আলো পড়লে আলো ঠিকরে বেড়িয়ে আসে- এতই চকচকে। ইউনিফর্ম পরা ড্রইভার এক দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে, পেছনের সিটে বসে আছে এক সাহেব আর এক মেম। তার সাহেবের নাদুস-নুদুস বাবুটা যখন ব্যাটারি ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দেয়, তখন গাড়িটি দারুন একটা আওয়াজ করতে করতে চলা শুরু করে। ময়নার মা তখন অবাক হয়ে গাড়িটির দিকে তাকিয়েই থাকে। মনের গভীরে গাড়িটির জন্য লোভ অনুভব করে, সারাটা দিন একলা কাটে ময়নার সাততলা বস্তিতে। হাড়-জিরজিরে ময়নার মুখে খাবারটাও সবসময় ঠিকভাবে দিতে পারেনা- তারপরও ময়নার হাতে ওই লালগাড়িটা তুলে দেয়ার দুঃসাহসী স্বপ্ন দেখে।

অবশেষে, গাড়িটি একদিন তার হাতে আসে, দিতে পারে ময়নাকে- তার আপা মানুষ খুব ভালো, গাড়িটি তাকে দিয়ে দেয়। হোক না, গাড়িটি এখন চলে না, হোকনা তা থেকে শব্দ বের হয়না- তারপরও গাড়িটি পেয়ে ময়নার খুশি আর ধরে না- ময়নার খুশি দেখে ময়নার মার খুশিও আর ধরে না।
একরাতে ঘরে ফিরে বস্তির অনেকের মুখে শুনে যে পরদিন নাকি বস্তি ভেঙ্গে দেয়া হবে। কথাটা অনেকের মত সেও গুজব বলে উড়িয়ে দিতে চায়, আগেও এমন গুজব অনেক শুনেছে তারা, বস্তিতে থাকলে এমন গুজব মাঝে-মধ্যেই শুনতে হয়- গুজবে কান দিতে নাই- কারণ কান দিয়ে করণীয় কি তাও যে তারা জানেনা!
কিন্তু এবার যে গুজব সত্য হয়, সকাল থেকে বস্তি জুরে আহাজারি শুনা যায়, যদিও সে আহাজারি সে কোলাহল উতপত্তিস্থলেই হারিয়ে যায়, সামান্য পথও সে অতিক্রম করতে পারেনা, নিমেষে গুড়িয়ে যায় লাখো মানুষের মাথা গুজার ঠাঁই। গোছগাছের সময়টুকু পায়না, যতখানি যা পারা যায় শেষসম্বল হিসাবে টিকাতে পারে- তাই নিয়ে দাঁড়ায় খোলা আকাশের নীচে। ময়নার মাও ময়না সহ তার ঘরের যতসামান্য জিনিসপত্রের মধ্যে আরো সামান্য কিছু নিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ঘরটির মাটির সাথে মিশে যাওয়া। ময়নার হঠাত করে লাল গাড়িটির কথা মনে পাড়ায় সে আনতে চায় গাড়িটি, কিন্তু ততক্ষণে তার গাড়ি-বাড়ি সব গুড়াগুড়া হয়ে মিশে গেছে মাটির সাথে। গাড়ি হারানোর বেদনায় ময়না চিতকার করে কান্না শুরু করে দেয়। আর ঘর হারানোর বেদনায় নির্বাক ময়নার মা মেয়ের গাড়ি নিয়ে বিলাপ সহ্য করতে পারে না; সমস্ত আক্রোশ নিয়ে পাষাণ মা মেয়ের গালে মারে বিরাশি মণ ওজনের এক থাপড়। মা যেন ঘরহারা, অত্যাচারিত, প্রতিবাদী কোন মানুষ আর মেয়ে যেন রাজউকের কর্মকর্তা, র‍্যাব-পুলিশ-মিলিটারি।
মেয়ে যেন এই সরকার!

তিনঃ
ডকু তৈরির নেশা ও সমাজকে পাল্টে দেয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে একদল তরুন ফুটেজ সংগ্রহ করছিল বিভিন্ন বস্তিতে গিয়ে, রাস্তায়, ফুটপাতে। এক ছুটির সকালে গিয়ে হাজির হলাম তাদের সাথে। তাদের ক্যামেরায় ও সামনাসামনি দেখলাম বাস্তুহারা, কর্মহারা বস্তিবাসীকে-হকারকে। ঘুরতে ঘুরতেই যাই সংসদ ভবনের সামনে। দেখি একটি টকটকে লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে, গাড়ির অদূরে এক সৌম ভদ্রলোক, পাশে এক ভদ্রমহিলা আর কিছুদূরে ফুটফুটে একটি বালিকা- সেও লাল টুকটুকে একটা ফ্রক পরিহিত। এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে আর তার গর্বিত ও তৃপ্ত পিতামাতা লাল-বালিকাকে মাঝে-মধ্যে মৃদুমন্দ শাসন করছে। কি মনে করে যেন আমাদের টিমটি ওনার সাক্ষাতকার নিতে চাইলো। ওনাকে এহেন অসময়ে ডিস্টার্ব করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে অত্যন্ত পোলাইটলি রিকুয়েস্ট করায় ভদ্রলোক রাজি হলেন ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে। বলাই বাহুল্য, ওনাকে বস্তি উচ্ছেদ- হকার উচ্ছেদ নিয়ে বলতে বলা হয়েছিল। ভদ্রলোকও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

: এই ঢাকাকে দেখেন, এটাকে কি মনে হয় একটা রাজধানী শহর? চারদিকে নোংরা আবর্জনা, টোটালি পোলুটেড আ সিটি দিস ইজ!
: হু উইল কাম টু ইনভেস্ট ইন সাচ এ পলুটেড সিটি?
: রাস্তায় চলাচলের কোন উপায় আছে? কেন রাস্তা দখল করে, ফুটপাথ দখল করে হকাররা ব্যবসা করবে?
: একটা রাজধানী শহরে কখনো বস্তি থাকতে পারে? বস্তিগুলোতে কি না হয়? ঢাকা শহরের সকল অপরাধের মূল ঐ বস্তিগুলো, জানেন বোধ হয়?
: বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার অবশ্যই করেক্ট এবং সাহসী ডিসিশন নিয়েছে এবং সে অনুযায়ি কাজ করছে। উই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট দেম।
: কিন্তু মানবিক দিকটাও আমাদের দেখা উচিত, পুনর্বাসনের বিষয়টিও আমাদের মাথায় থাকা উচিত। দ্যা গভরমেন্ট উইল ডু দিস। একবারে হবে না, তাদেরকে সময় দিতে হবে।

আমরা পঞ্চমুখ হয়ে বলি, আপনি তো দেশকে নিয়ে অনেক ভাবেন!

: না আসলে বেশি ভাবতাম না। ব্যবসার কাজেই এত ব্যস্ত থাকতে হয়!

: তবে ঐ মেয়েটি হবার পর থেকে সব পাল্টে গেল। ইনফ্যাক্ট ভাবতে বাধ্য হয়েছি। আপনারাই বলুন, কোথায় আমরা ওদেরকে নিয়ে এসেছি? ওদের ভবিষ্যতটাই বা কি? এখানে শ্বাস নেয়ার মত জায়গাও কি আমরা ওদের দিতে পারছি?

লাল-বালিকার দিকে চোখ যায়। লাল গাড়ির দিকে চোখ যায়।

মিনিট ১৫ আগে কথা হয়েছিল সর্বসান্ত এক মেয়ের সাথে। ফার্মগেটের কাছে ফুটপাথে পান-বিড়ি বেচতো, থাকতো কাওরান বাজার বস্তিতে। মনে পড়ে যায় তার কথা।
: আমরায় কোন দোষডা করছি? আমরা চোরে না ডাকাত যে আমাগো প্যাডে এমন লাত্থিডা মারলো?
: আমরায় থাকুম কোনহানে? কাম করবার না দিলে আমরায় খামু কি?
: আওমিলিগ দ্যাকছি। বিএনপি দ্যাকছি। অহন দ্যকতাছি ফকিরুদ্দিনের সরকার। গরীবের কথা কোন হালায় ভাবেনা, হগ্গোলি বড়লোকগো লাইগ্যা।
: পুনরবাসন দিব হুনছিলাম। কোই আমাগো কেডাও তো পায় নাই? ওগুলান বুজি না, আমাগো থাকার লাইগ্যা জায়গা দ্যান আর খাওনের লাইগ্যা কাম দ্যান।

এই মেয়েটিও বোধ হয় লাল কামিজ পরাছিল, টুকটুকে লাল।

আমাদের লাল-বালিকারা আজ কোথায় কেমন আছে জানিনা।

http://www.somewhereinblog.net/blog/madariblog/28749126

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষদের কথা

মাথামোটা

১৫ ই অক্টোবর, ২০০৭ বিকাল ৫:১৫

আমার সোনার বাংলাদেশের ১৭ লক্ষ তরুন তরুনী গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে আজ সুখী জীবন যাপন করছেন। এই দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিকরা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক তো দুরের কথা সংক্ষেপিত পারিশ্রমিকই সঠিক সময়ে পান না।

দেশের নামকরা নারী মডেলরা আকর্ষনীয় ফিগার আর দৈহিক উচ্চতার অধিকারী হলেও বেশীরভাগ নারী শ্রমিকদের শারীরীক উচ্চতা ৪'৫'' ফিট এর কম। শুধু শ্রম আইনের ১০ ঘন্টা (৮+২=১০) না বেশীরভাগ গার্মেন্টসে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা কাজ করে এরা বাংলাদেশের অর্থনীতি চালু রাখেন। আপনি যদি ঢাকার অধিবাসী হন তবে রাস্তায় এদের দেখতে পাবেন। সকালে-রাতে এরা দল বেধে যাতায়াত করেন। এছাড়া অফিস টাইমেও মাঝে মাঝে গাড়ি ভাংচুর করতে দেখা যায় এদের।

খুপরী কোন ঘর অথবা বস্তিতে এক সাথে অনেক জনের একসাথে থাকা তো এদের জীবনানন্দর বহিঃপ্রকাশ। রাতে একবেলা ডিম রান্না করে খাওয়ার জন্যই এদের জন্ম। রাস্তায় দেখা টেলিভিশনে ফেয়ার এন্ড লাভলীর বিজ্ঞাপন দেখে এরাও স্বপ্ন দেখেন। ঈদ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে এরা ছুটে যান জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড, বোটানিকেল গার্ডেন, জিয়া উদ্যান, সংসদ ভবন বা রমনা পার্কের মত দর্শনী ফ্রী স্থান গুলোতে। কারন আর কিছু নয় ফ্যান্টাসি, বসুন্ধরা সিটি বা নন্দন পার্কে এই তরুন তরুনীগন স্বাচ্ছন্দবোধ করেন না।

কাজের বিরতিতে ফ্লোর ইনচার্জের অশ্লীল ইংগীত, কাজের মাঝে গালাগালি এদের স্বাভাবিক রুটিন (যেমন কাজের বিরতিতে আমরা সাঃ ইনঃ এ ব্লগিং করি)। স্বভাব ভালো বলে কারখানা থেকে বের হবার সময় এদের বডিচেকআপ করা হয়। এরা বাঘের মত হিংস্র বলে গেটে ঝোলে তালা। আবার, অনেক গার্মেন্টস মালিকেরা এই শ্রমিকদের পাখীর মত ভাবেন, যার কারনে কারখানায় কোন ইমার্জেন্সি এক্সিট রাখার প্রয়োজন মনে করেন না।

হয়তবা এদের ধর্ম-কর্ম প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন সবাই। তাই এই মানুষগুলোর ফরজ নামাজের বিরতি দেয়া হয় না। নিয়মিত দেয়া হয় না শবেকদর, শবেবরাত বা ঈদএ মিলাদুন্নবীর ছুটি। পত্রিকার কার্টুনের থেকেও এদের গুরুত্ব কম বলেই বোধহয় শ্রদ্ধেয় মরহুম মাওলানা খতিব ওবাইদুল হক এদের ব্যাপারে কখনও আন্দোলনে নামেন নি।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের টাকা-পয়সার তেমন প্রয়োজন নেই। তাই তাদের ওভারটাইমের মূল্য দেরী করে দেওয়া হয়। এরা আসলে আন্দোলন করেন না। ভারতীয় দালালরা 'র' এজেন্ট দিয়ে ভাংচুর করিয়ে আমাদের সোনার বাংলায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের দোষ দিয়ে থাকেন।

আর তাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষের দেশ বাংলাদেশের সবচেয়ে সুখী মানুষ হচ্ছেন এই গার্মেন্টস শ্রমিকরা, যারা বস্ত্রের সাথে সাথে স্বপ্নের জাল বোনেন।

http://www.somewhereinblog.net/blog/mathamotablog/28737624

অবশ্য পাঠ্য আগুন পোস্ট

রিয়াজ শাহেদ
২৪ শে মার্চ, ২০০৮ রাত ১২:৪২

আজকে সারাদিন জামাতিদের প্রচুর আলতুফালতু পোস্ট দেখে আর ভাল্লাগছিলোনা, আগে পড়া কিছু বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তৈরি করে ফেললাম এই অবশ্য পাঠ্য আগুন পোস্ট।

১. ইদানিং জামাতিরা সরকারের নারী নীতি নিয়ে ভীষণ ক্ষেপে আছে। কিন্তু তাদের গুরু মওলানা আবু আলা মওদুদীর নারী নীতি কী ছিলো তা কি তারা জানে? আবু আলা মওদুদী ১৯৬৪/৬৫ সাল পর্যন্ত নারী-শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আওরাত-জেনানাদের রাজনীতিতে টেনে আনা, পার্লামেন্টের সদস্য হতে দেয়াকে ইসলামবিরোধী বলেছিলেন তিনি। দস্তুরী তাযাবীয গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় মওদুদী বলছেন, "আইন পরিষদগুলোতে মহিলাদের সদস্য হওয়ার অধিকার দেয়া হলো পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অন্ধ অনুকরণ। ইসলামের নীতিমালা এ অনুমতি দেয়না। ইসলামে রাজনীতি ও দেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব কেবলমাত্র পুরুষদের ওপরই ন্যস্ত।" আবু আলা মওদুদী রচিত তাফহিমুল কোরান গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় বলা আছে, "পবিত্র কোরানের স্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও এ কথার কী অবকাশ আছে যে, মুসলিম মহিলারা কাউন্সিল ও পার্লামেন্টের সদস্য হবে? ঘরের বাইরে সামাজিক তৎপরতায় দৌড়াদৌড়ি করবে, সরকারী দফতরে পুরুষদের সাথে কাজ করবে, কলেজগুলোতে ছেলেদের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করবে, বিমান ও রেলকারে যাত্রীদের মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হবে এবং শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকা-ইংল্যান্ড যাবে?" ১৯৬১ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কন্যা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন কিনা এ নিয়ে মওদুদী সাহেব ফতোয়া দেন, "মহিলাসমাজের কর্মক্ষেত্রই আলাদা। সুতরাং ফাতেমা জিন্নাহর রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠেনা। এটা হলো পুরুষের কাজ।"

ভালো মন্দ যাই হোক এপর্যন্ত সবকিছুতো অন্তত একটা সুরেই ছিলো। কিন্তু ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যখন সম্মিলিত বিরোধীদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই সুর পালটে ফেললেন আমাদের মওদুদী ছাহেব, "মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপারে কোনই বাধ্যবাধকতা নেই। মহিলাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা বা হজ্ব করা অবৈধ বলাও অন্যায়। আমাদের ওপর ফরয হলো মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে বর্তমান সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক পথে ক্ষমতাচ্যুত করা। আল্লাহতায়ালা এরচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর দান করতে পারেননা।"

কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন এদের নারী নীতি আসলে কী?

২. 'মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মে' নামে আবু আলা মওদুদীর একটা বই আছে। তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি-

"যে এলাকায় ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবে, সেখানে (জন্মগত) মুসলমানদের নোটিশ দিতে হবে যে, যারা আকিদা ও আমলের দিক দিয়ে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়েছে এবং বিমুখ হয়ে থাকাই পছন্দ করে, ঘোষণার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে অমুসলমান হওয়ার রীতিনীতি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে ইজতিমায়ী নিযাম থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এ সময়ের পরে যারা মুসলমানের বংশে জন্ম নেবে তাদেরকে মুসলমান গণ্য করা হবে। তাদের ওপর সম্যক ইসলামী আইনকানুন প্রয়োগ করা হবে। ধর্মের সকল ফরয ও ওয়াজিবগুলো তাদেরকে বিনা ব্যতিক্রমে পালন করতে বাধ্য করা হবে। অতঃপর ইসলামের গন্ডির বাইরে যে-ই পদার্পণ করবে, তাকেই কতল করা হবে।

৩. সাম্রাজ্যবাদ মওদুদী স্টাইল-

"অমুসলমান দেশগুলোতে নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠাতে হবে। কিন্তু শক্তি লাভ মাত্র ওইসব দেশে (বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোতে) আক্রমণ চালাতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে কাফেরদের প্রচার নিষেধ করা হবে এবং কাফেরদের মধ্যেও কাফেরদের প্রচার নিষেধ করা হবে।" বই- *মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মে।*

৪. "কোরান হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু নাজাত বা মুক্তির জন্য নয়"- এই মারাত্মক কথা মওদুদী বলেছেন *তাফহিমাত* গ্রন্থের ৩১২ পৃষ্ঠায়।

৫. জামায়াত প্রেমিকরা একটা অভিযোগ সবসময়ই করে থাকে যে, তাদেরকে নাকি ব্লগে প্রচুর খারাপ অশ্লীল কথাবার্তা হজম করতে হয়। তাদের জন্য দিচ্ছি সাঈদীর এই ওয়াজের অংশবিশেষ, অশ্লীল কথা কারা বলে বোঝা যাবে এবার ভালোমত-

"হায় মুসলমান, সেই মুসলমান, সেই নবীর উম্মত, এক পাতা ইংরেজি বই পড়ে আর বলে, হোয়্যার ইজ গড? আল্লা কোথায়? বলেন নাউযুবিল্লাহ। মাস্টার সাহেব ক্লাসে বলে, মানুষ ছিলো বান্দর। তার পাছায় লেজ ছিলো। সেই লেজ ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। তবে এখনো মানুষের পাছার কাছে লেজের অংশবিশেষ রয়ে গেছে। বিশ্বাস না হয় নিজের পাছা দেখো। ছাত্রছাত্রীরা শোনে, আর কাপড়ের নিচে হাত ঢুকায়া দেয়, সত্যিই তো লেজের মতো কী দেখা যায়! বলেন নাউযুবিল্লাহ। এই জন্যেইতো আমি বলি, ওইটা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বেশ্যাবিদ্যালয়, ওইখানে আহাম্মক শরীফ আর উমরউদ্দিন বদরা বদমায়েশি শিক্ষা দিতেছে। ভাই সাহেবরা জোরে আওয়াজ দেন, ১২ কোটি মুসলমানের দেশে ডারউইন সিলেবাসে থাকবে?"

৬. জামাতি ব্লগারগণ, এতক্ষণ ধরে যা পড়লেন তা নিশ্চয়ই আপনাদের আগে থেকেই জানা ছিলো। তবু আপনারা জামায়াতে ইসলামী নামক বিষফোঁড়ার পাতা চমৎকার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে কেনো পারেননা সেই গোমরটা ফাঁস করছি (এটা আছে *মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মে* বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠায়) -

"জামায়াতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে আগেই জানানো হয় যে, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু।"

সবাইকে ধন্যবাদ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/rshahedblog/28781903

তুমি কি দেখেছো কভূ জীবনের পরাজয় ? দু:খের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়. . .

আইরিন সুলতানা
০৪ ঠা জানুয়ারি, ২০০৮ রাত ৮:২৪

|| ১ ||

আজকাল চারপাশে দৃষ্টি নন্দন কিছু দেখিনা; যা দেখি তাতেই ভ্রুকুটি হয়। কপালে ভাঁজ পড়লে তা মেয়েলী সৌন্দর্য্যের জন্য হানিকর হবে, তবুও বিরক্তিটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দিন দিন।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে নাকে-মুখে দুটো গুঁজেই এক ছুটে বাস স্টপেজ। টিকেট কাউন্টার থেকে ফেরত দেয়া খুচরো কয়েন কিনবা টাকা ব্যাগে ভরতে যাওয়ার সময় বাড়িয়ে দেয়া একটা জীর্ণ হাত দেখে ক্ষণিক মায়া জন্মে; দু' টাকা দিয়ে দায়মুক্ত হই দ্রুত। পরেরদিন আবার সেই হাত; আমার মায়ার পরিমাণ একদিনেই কমে গেছে; মুখ ফিরিয়ে বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি।

|| ২ ||

আদর কথাটা খুব তুলতুলে। অবশ্য সম্পর্কের ধরণ অনুযায়ী তাতে উম্মাদনা, শিহরণের ছোঁয়াও থাকে; তবে এই লেখার স্রোত সেদিকে ধাবিত হবেনা। মায়ের কোলে শিশু - স্বর্গীয় দৃশ্য; অসম্ভব কোমলতা আর মমতায় ভরা। ছোট্ট বাচ্চাদের মোলায়েম শরীর, আর ফোলা ফোলা গাল- দেখলেই পন্ডস এর এ্যাডের মত আলতো করে টিপে দিতে ইচ্ছে করবে; মায়েরা তাদের আদরের সোনামনিদের টেলিভীষনে দেখানো এ্যাডের মত করে বেবী লোশন মাখিয়ে দিবে; এরকম মোলায়েম দৃশ্যই কাম্য।

প্রতিদিন সকালে মিরপুর-১০ ভলভো বাস স্ট্যান্ডের সাথের ফুটপাতে এক রুগ্ন মাকে তার ছোট্ট, অপুষ্টিতে ভোগা কোলের শিশুটিকে আদর করতে দেখতাম- নাকে নাক ঘষে দিচ্ছে। ওরা ফুটপাতেই থাকত কিনা কে জানে! মাঝে মাঝে দেখতাম সেই মা তার বাচ্চাকে দু' পায়ের গোড়ালির মাঝে বসিয়ে সাথের ড্রেনে মল ত্যাগ করাচ্ছে। সকাল বেলাতেই ভাবনার তুলতুলে অংশের সাথে বাস্তবতার বিশাল ফাঁড়াক বিরক্তিই জাগায়- যত্তসব! ফুটপাত দখল, ড্রেনের দুর্গন্ধ!

|| ৩ ||

তুমুল আড্ডা চলে বন্ধুদের সাথে পিজ্জা হাটে। পিজ্জা আসার আগে মুখরোচক সালাদ; ওদিকে পিজ্জা আসতে আসতে আলোচনা নানা ওলি-গলি ছাড়িয়ে যায়; এরপর দু' টো দশ ইঞ্চি ব্যাসের পিজ্জা দেশ ও জাতির সকল সমস্যার দফারফা করে দেয়। সাথের সফট ড্রিংকস চটুল কথা-বার্তার মত কাজ করে। ডেজার্ট পর্বে বিশাল ব্ল্যাক ফরেস্ট কেকের একেকটা টুকরা গেলার সাথে সাথে আমরা দেশকে সমৃদ্ধির চূড়ান্তে নিয়ে যাই। নিজেকে জাহির করার জন্য কিনবা প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য কিনবা নিদেন পক্ষে ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য হলেও দেখা গেল বিল পরিশোধে সবার আগ্রহ। হাজার টাকার বিল দিয়ে পিজ্জা হাটের ঘন্টাটা জোরসে ঢং ঢং করে বাজিয়ে আমরা আজকের আধুনিক তরুণ-তরুনীরা গটগটিয়ে বের হয়ে আসি।

আমাদের উচ্চবাচ্য তখনও তুঙ্গে। পাশ দিয়ে এক কিশোর ছেলে হাত বাড়িয়ে দেয়। কারো মুড অফ হয়ে যায়, কেউ পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে এড়িয়ে যায় যেন কিছুই হচ্ছেনা; কেউ একটু ইত:স্তত করে ২ বা ৫ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে অযাচিত ঝামেলা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে।

|| ৪ ||

ইয়োলো ক্যাব সিগন্যালে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ। শখ করেই এসি বন্ধ রেখে জানালা আধা খোলা রেখেছি। গাড়ি ছুটতে থাকলে, এলোমেলো বাতাসে একটা আনমনা ভাব আসে; "এই পথ যদি না শেষ হয়...", গানটা আওড়িয়ে যাই। অন্ধ এক লোক, একটি ছোট্ট মেয়ের কাঁধে হাত রেখে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়ানো হাত গানে বাঁধা দেয়; কোন জবাব দেইনা। ছোট্ট মেয়ে বারকয়েক বলেও আমার অবজ্ঞা দেখে পাশের গাড়ির দিকে চলে যায়।

এরপর ১৪-১৫ বছরের এক বালক আসে পপকর্ণের প্যাকেট নিয়ে; না করে দেই। একজন যেতেই আরেকজন আসে। এই ছেলে বেশ চালাক; সে প্যাকেটটা আমার কোলের উপর ফেলে দেয়, ফেরত দিতে গেলে সরে যায়, অতএব ১০ টাকা দিতে হয়। সবে পপকর্ণের প্যাকেট ছিঁড়েছি , এক মেয়ে হাতে দুটো লাল গোলাপ নিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয়। বড় ঝামেলায় পরা গেল দেখি ! জালানার কাঁচ তুলে দেই, "ড্রাইভার সাহেব, এসিই ছাড়েন আর রেডিও ঠিক থাকলে ওটাও ছাড়েন" । আমি মোবাইলটা বার করি, প্রিয় গানের রিকোয়েস্ট করে এস.এম.এস পাঠাবো রেডিওতে; on-air -এ নিজের নাম শোনার একটা charm আছে। জানালার কাঁচে আরো দুটো মুখ জড় হয়েছে, কাঁচে টোকা দিচ্ছে। আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মোবাইলের বোতমগুলো চেপে যাচ্ছি। ঠিক এসময়ই ক্যাব আবার চলা শুরু করল; মুখগুলো একটু সরে যায়, গাড়ি হুশ করে ছুটতে থাকে - বাঁচা গেল!

|| ৫ ||

সিডর কেন জানি মাথা থেকে যায়নি এখনও। সুযোগ পেলে জ্ঞানীর মত ভাবি। এক কলিগের কাছ থেকে শোনা গেল গ্রামের দিকে এখনও বিশাল বিশাল গাছের দুমড়ানো-মোচড়ানো, অসহায় রূপ দেখলে সিডরের তান্ডব বোঝা যায়। ঝড়ে ওলট-পালট এলাকাগুলো কি এখন স্বাভাবিক ? ক্ষতিগ্রস্থরা ত্রাণ পাচ্ছে কিনা কে জানে! ত্রাণ দিয়েও বা কয়দিন; কাজ দরকার জীবিকার জন্য। সেরা সপ্তম আশ্চর্যে সুন্দরবনকে ভোট দেয়ার তোড়জোড় চলছে। কিন্তু সুন্দরবনের সবুজ-সতেজতা আবার কবে ফিরে আসবে? আরেকটা সিডর আঘাত হানলে কে এমন করে আমাদের আগলে রাখতে নিজেকে বিলীণ করে দেবে!

ভাবনায় ছেদ পরে। মুঠোফোনটা আর্তনাদ করছে; ধরতেই ওপাশে বান্ধবীর উত্তেজিত গলা;

-এ্যাই শোন, সিডর দু:স্থদের সাহায্যার্থে কনসার্ট হবে ; চল যাই ।

নাহ্! সাহায্য তো দিলাম কতই; এত টাকা টিকেট কেটে যাবো না।

আরে! ফুয়াদ, বালাম - এরা সব আসবে ।

বলিস কি ! (উত্তেজিত আমি); ফুয়াদ, বালাম এর কনসার্ট ! I am dying to see them ! যত টাকার টিকেটই হোক না কেন !

বান্ধবী হেসে ফোনটা রেখে দেয়।

সিডর ভাবনা এক পলকেই উড়ে যায়। winter night -এ এমন কনসার্ট কিছুতেই মিস করা যাবে না। আম্মা শুনেই স্বভাবসুলভ বকাবকি করল; আমি কানেই তুললাম না। অনেক ভিড় হবে নিশ্চয়ই; আগেই টিকেট কিনতে হবে । ঝটপট রেডি হয়ে বেড়িয়ে পরি ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/laboniblog/28756728

দুর্দিনের ছোটগল্প: ভালোবাসা ও নুন ঝালের দিনগুলো

তীরন্দাজ
০৯ ই এপ্রিল, ২০০৮ দুপুর ১:১৬

কাঠফাটা রোদে দর দর করে ঘামতে ঘামতে বাড়ী ফিরলেন মাজেজুল আলম রাস্তার ময়লা, মানুষ, ড্রেন, খানাখন্দ পেরিয়ে এতটা পথ হাঁটতে দম বেরিয়ে যায়। তারপরও আসা যাওয়ার ভাড়া মিলিয়ে বাসভাড়ার সাত টাকা বাঁচানো এই দুর্দিনে যে কতোটা জরুরী, সেটা কে বুঝবে? বাড়ীর কাছাকাছি এসে পা আর চলতে চাইছিল না। কোনক্রমে টেনে হিঁচড়ে বাকী পথটুকু পার করলেন। দরদর করে ঘাম ঝরছে মাথা আর শরীর বেয়ে। বউ সামিনা বেগম একটি পাখা আর এক গ্লাস পানি নিয়ে দৌড়ে এলেন। পাখার বাতাসে একটু ঠান্ডা হয়ে পানিটুকু মুখে দিয়ে যেন একটু দম ফিরে পেলেন মাজেজুল আলম

- বাসে ভীড় ছিল বেশী? জানতে চাইলেন সামিনা।
- হ্যা! সংক্ষেপে উত্তর দিলেন মাজেজ।
- সেজন্যে দেরী হলো?
- হ্যা, একটা বাসে উঠতে পারিনি। পরেরটায় উঠেছি।
- এত কষ্ট! একটা রিকশা করে চলে আসতে?

কোন উত্তর দিলেন না মাজেজ। বুক ফেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সেটাও চেপে রাখলেন। দশ বছরের ছেলে মৃদুল আর মেয়ে সাত বছরের মালা একটু দুরে দাঁড়িয়ে বাবার দিকে তাকিয়েছিল। বাবার এই অবস্থা দেখে কাছে আসতেও সাহস পাচ্ছিল না। একটু সুস্থির হয়ে এদের দিকে ইশারা করতেই এগিয়ে এলো তারা। এই গরমের মাঝেও ওদের শরীরের উত্তাপে আত্মার ভেতরে এক শীতল শান্তি অনুভব করলেন মাজেজুল আলম

খাবার ঘরে গিয়ে দেখেন, আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছেন সামিনা। শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি আর পেটে জলন্ত ক্ষিদে। দ্রুত মুখহাত ধুয়েই খেতে বসলেন।

খাবার মুখে তুলেই চেহারা বিকৃত করলেন মাজেজ। নুনে, ঝালে একাকার! সামিনা কিছুটা ঝাল ভালবাসলেও বাবা ও ছেলে মেয়ে কেউই ঝাল খেতে চায়না। তাই এবাড়ীতে কম ঝালেই রান্না হয় সচরাচর। আজও এমন করলো কেন? মেজাজ খারাপ করে মুখের দিকে তাকাতেই মুখ নামিয়ে ফেললেন সামিনা। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু দেখলেন, যে চুপ করে যেতে বাধ্য হলেন মাজেজ। রোজকারের চেয়ে প্রায় অর্ধেক ভাত খেয়ে হাত ধুয়ে উঠে গেলেন খাওয়া ছেড়ে।

রাতে ঘুমোতে গিয়ে মশারী তুলে বিছানায় ঢুকে দেখেন অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছেন সামিনা। ছেলে মেয়ে তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। খুব আস্তে, আদরে স্ত্রীর পিঠে হাত রাখলেন মাজেজ। শরীরটা কেঁপে উঠলো যেন। কাঁদছে কি সামিনা? স্ত্রীকে নিজের দিকে ঘোরাতে আকর্ষন করলেন। সামিনা কোন বাঁধা না দিয়ে ঘুরলেন স্বামীর দিকে। কিন্তু হাত দুটোয় চোখ ঢাকা। সামিনা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

- সামিনা সোনা, সামিনা সোনা, তোমার কি হয়েছে? তোমার চোখে জল কেন? নরম আদরে স্ত্রীকে জড়িয়ে বললেন মাজেজ।
উত্তরে আরো জোরে কেঁদে উঠলেন সামিনা। কান্নার দমকে কেঁপে উঠল তার বাড়ন্ত শরীর। আবারো আদরে সামিনা সোনা বলে ডেকে ডেকে তার মাথায়, চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন মাজেজ। এতে মনে হলো কিছুটা শান্ত হলেন সামিনা।
- তুমি আজকিছুই খেতে পারোনি। নুন, ঝাল এতো বেশী ছিল! বলেই আবার কেঁদে উঠলেন সামিনা।
- তাতে কি হয়েছে? এজন্যে কি কেউ কাঁদে নাকি সামিনা সোনা, লক্ষী বউ আমার। কাল ঠিক করে রাঁধলেই তো হলো। বলেই স্ত্রীকে ঘন করে কাছে টানলেন মাজেজ।

কিন্তু শরীর শক্ত করে দুরেই রইলেন সামিনা। আবারও টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়লো চোখের কোল বেয়ে। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন,
- কালও রান্না এমনই হবে। নুন, ঝাল বেশীই থাকবে।
- কেন? একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন মাজেজে।
- ঘরে বেশী চাল নেই। মাস খরচের টাকাও শেষ। বাকী এক সপ্তাহ চলবে কি করে জানিনা। নুন, ঝাল বেশী দিলে ছেলেমেয়ে সহ আমরা সবাই একটু কম খাই। তাতে যদি এ সপ্তাহটা চলে!

বলেই আরো জোরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন সামিনা। ছেলে মেয়েরাও সে কান্না শুনে জেগে উঠলো। জড়িয়ে ধরলো মা কে । শুধুমাত্র নির্বাক মাজেজুল হক মশারীর ফাঁক দিয়ে উপরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

http://www.somewhereinblog.net/blog/nantublog/28786335

নৈর্ব্যক্তিকতা বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত মতামত... (উৎসর্গ রাশেদ আর এস্কিমো, যাগো জীবনে কোনদিন চোখে দেখি নাই)

জামাল ভাস্কর
০৪ ঠা এপ্রিল, ২০০৮ বিকাল ৫:২৮

নৈর্ব্যক্তিকতা আসলে দুরূহ প্রাপ্য...আর এইকারনেই এই দেশে অনেক কিছু ঘটে...ইটের বদল ইট...ঢিলের জওয়াব পাটকেল...চিন্তার এই প্রক্রিয়াতেই গন্ডগোল হইয়া যায়। কোন ঘটনার অন্তর্নিহিত মর্তবা থাকতে পারে, চিন্তার ডিসকোর্স ভাঙনের প্যাটার্ন থাকতে পারে এইরম ভাবনার কোন অবকাশ দেখি না। সমস্যাটা আদৌ দেশের না সেইটা জানি, কিন্তু গড়পড়তা দেশরে গালি দিয়া দায়বোধ এড়াইবার কৌশলটা অনেক সাবলীল মনে হয় আজকাল।

নৈর্ব্যক্তিকতা নাই বইলাই চাইলের দাম বাড়লে সেইটা সোজাসাপ্টা ষড়যন্ত্রের আভাষ হয়...নৈর্বক্তিকতা নাই বইলা বিদ্যুতের ভোগান্তি সব আগের সরকারের দোষ হইয়াই চলে...নৈর্ব্যক্তিকতা নাই বইলা এই দেশে সন্ত্রাসীরা হিরো হয়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনার বিষয় না হইয়া হয় বেচাবিক্রির পণ্য। নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়া কথা কইতে গেলে যেই বিষয় চইলা আসে অবশ্যম্ভাবী সেইটা হইলো পুঁজির ব্যক্তিকেন্দ্রীকতার খেলা। পুঁজির এই ব্যক্তিকেন্দ্রীকতার সন্ত্রাসী মনোভাব থাকবোই...কিন্তু যেই দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মাত্র ৩৬ বছরের পুরানা, সেই দেশের সবাই আমেরিকান হইয়া একজন আরেকজনরে টপকানের কথা ভাবতে আছে...এইটা মাইনা নিতে কষ্ট লাগে...কলিজায় কর্কটের অবস্থান টের পাই।

ব্লগে আসতে পারি কম রুটি-রুজির কারনে। কিন্তু আসলে পর যখন নৈর্ব্যক্তিকতার একই অভাব দেখি তখন মনে হয় না আসাটাই ভালো ছিলো। রাশেদ আর এস্কিমো'র ব্যান কাহিনীটারে আমার আর কিচ্ছু মনে হয় না। মনে হয় কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিকেন্দ্রীক আক্রোশের একরম প্রকাশ। তাগো ইগো'তে আঘাত করছে রাশেদ আর এস্কিমো'র প্রতিবাদ...

আমি নিজে একসময় সংগঠন করছি সক্রিয়ভাবে...আর এই সাংগঠনিক পরিক্রমায় একটা বিষয় হাড়ে হাড়ে বুঝছি, তা হইলো নৈর্ব্যক্তিকতাই পারে কোন ক্ষেত্ররে মহত্তর কইরা তুলতে। এই ব্লগরে যেহেতু একভাবে ভালোবাসি...তারে ইগোর খেলাতে বিলীন হইয়া যাওয়া কোন ক্ষেত্র হিসাবে দেখতে চাই না। পুঁজির আগ্রাসনে আসা এই ইগো শেষতক মনে হয় ব্লগটারেও খাইলো...

http://www.somewhereinblog.net/blog/vashudearblog/28785223

মুক্তিযোদ্ধা ও আমার হতাশা

মাহবুব সুমন
০৩ রা মার্চ, ২০০৮ বিকাল ৫:১০

"প্রতিরোধের মার্চঃ আমি মুক্তিযোদ্ধা বলছি" প্রথম আলোর এই সিরিজটা প্রথম থেকেই মন দিয়ে পড়ছি এবং মন খারাপ হতে খারাপতর হচ্ছে। শুহুরে কলমসৈনিকের গোছানো বক্তিমা বা সুশিল শ্রেনী হতে উঠে আসে কোন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারন পড়ে এতদিন যে সত্যকে সত্য জানতাম সেটাই অনেকটুকুই ফিকে হয়ে আসে এসব স্মৃতিচারন পড়লে। গ্রাম- গন্জের প্রান্তিক মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারন মফস্বল সাংবাদিকদের লেখনিতে উঠে আসছে।

এক বছর আগের কথা। অকাল প্রয়াত "সিলেট প্রতিদিন" পত্রিকায় প্রকাশিত ব্লগার নজমুল আলবাবের কিছু প্রতিবেদন পড়েছিলাম। নজমুল বলতেন " মামু, লিংকটা দিলাম একটু পইড়েন ।" পড়তাম এবং কস্ট পেতাম। নজমুলকে বলতাম না, নজমুলের লেখনীতে যে কস্ট প্রকাশিত হতো সেটা বলে তার কস্ট বাড়াতে চাইতাম না। তার লেখায় যে লজ্জাকর সত্য প্রকাশ পেতো এখনকার প্রতিবেদেন গুলো পড়ে সেই একই সত্য প্রকাশে বিবেকের দংশনে ভুগি।

৭১ যে সাহসী কিশোর বা তরুন অস্ত্র হাতে জানের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলো সেই কিশোর বা তরুন বার্ধক্যে এসে এখনও যুদ্ধে লিপ্ত। যুদ্ধটা পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে না হয়ে সেটা এখন জীবন সংগ্রামের। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ৬০০ টাকা ভাতার জন্য তাদের বারান্দায় লাইনে দাঁড়াতে হয় , এই ৬০০ টাকায় কি একটা মানুষের জীবন চলে? এমনতো নয় যে তাদের অনেক অর্থসম্পদ, ৬০০ টাকা কিছুই নয়। এই ৬০০ টাকাই বেশীরভাগ মুক্তিযোদ্ধার একমাত্র সম্বল। অবশ্য অসংখ্য এবং বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার ভাগ্যে সেটাও জোটে না।

বছরের বেশীর ভাগ সময়ই পত্রিকার ভেতের পাতাগুলোতে এরকম অনেক সংবাদ প্রকাশিত হয়। যখন একজন ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা তার সন্তানকে ধর্ষনের হাত হতে বাঁচাতে ব্যার্থ হয়ে চিৎকার করে কাঁদেন তখন হয়তো আম্রা একটু দূঃখিত হই, পরমুহুর্তেই সেটা ভুলে যাই দেশের রাজনীতি নিয়ে প্রকাশিত পর্ন সংবাদগুলোতে মুগ্ধ হয়ে। একজন মুক্তিযোদ্ধা রিকশাচালক বা ভিক্ষের ঝুলিহাতে সংবাদগুলো আবেগময়ী হলেও সেই মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ভাবার সময় সবার নেই। এগুলো শুধুই দারুন নিউজ আইটেম।

মার্চ এসেছে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে ও হবে। ৭ই মার্চ আসছে, তখন মুক্তিযুদ্ধের জায়গা নেবে বংগবন্ধুর ভাষণ, ২৬ শে মার্চ আসলেই শুরু হবে স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক। পত্রিকাগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে। মুক্তিযুদ্ধের ব্যক্তিগত ও বাস্তব অভিগ্যতা বন্চিত বিখ্যাত সব লেখকরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখবেন, কেউবা কবিতা। আমরা মন দিয়ে সেগুলো পড়বো।
কিন্তু সেই সব সাহসী মানুষদের কথা ভাবার সময় হয় বছরে দুটো মাস, বিজয়ের ডিসেম্বর ও প্রতিরোধের মার্চ।
- - - - - - - - - -
লেখাটি আমার প্রিয় বিষন্ন মানব "নজমুল আলবাবকে" উৎসর্গ করে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/sumonmahbubsblog/28776067

যে রাতটি আমার নির্ঘুম কাটে

সামী মিয়াদাদ
২৪ শে মার্চ, ২০০৮ সকাল ১১:৪২

প্রতি রাতেই ঘুমোই। না ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। প্রকৃতির নিয়ম ভাঙতে ইচ্ছে হয়না। একরাত না ঘুমোলে পরবর্তী দুই দিন মাটি হয়ে যায়। তাই মরার মতো ঘুমোই। অনেকের আবার ঘুমের গভীরতায় নাসিকা প্রবর তর্জন-গর্জন শুরু করেন প্রবল অভিমানে। আমার নাসিকার এতো অভিমান নেই। তিনি বেশ শান্ত-শিষ্ট, নম্র-ভদ্র।

তবে আমার হাত-পা বেশ অশান্ত। ঘুমের সময় উনারা বেশ অভদ্রের মতো আচরন করেন। পাশে কেউ থাকলে মাঝে মাঝে তাদের উপর চড়াও হতেও দ্বিধাবোধ করেন না। ছোটবেলা একবার এক কাজিনের সাথে ঘুমিয়েছিলাম। সকাল বেলা ঘুম ভাংতেই দেখি আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি তার মুখের ভেতর। সে বেশ তৃপ্তিতে লজেন্সের মতো আমার আঙ্গুলটিকে ঘুমের মাঝেই চুষছে। ঘুমের ঘোরেই কখন আমার দেহের দিক পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে পারিনি। এরকম দিক পরিবর্তন আগে অনেকবারই হতো। এখন আর হয়না।

স্কুলে পড়াকালীন, ক্লাশ ৭/৮ এর দিকে শখ করে লুঙ্গি পরতাম। এক রাতে হঠাত ঘুম ভাংলো। দেখি লুঙ্গি সাহেব লাই পেয়ে মাথায় উঠে গিয়েছেন। আমাকে অর্ধনগ্ন করে তিনি বেশ মাথায় উঠে নাচছেন। ভাগ্যিস কেউ দেখেনি। বেশ লজ্জার ব্যাপার হতো। সেদিন থেকে আর কোনদিন লুঙ্গি পরিনি। নিদ্রাকালীন সময়ের জন্য বেশ জন্মাবিক্ষুব্ধ পোষাক। নিম্নাঙ্গ থেকে উর্দ্ধাঙ্গের প্রতিই তার মমতার বহিপ্রকাশ বেশী দেখা যায়। যা বেশ বিব্রতকর। লুঙ্গি প্রবর মনে হয় কবির কথাটি জানেন না. . . .

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে. . . . .

রাতজাগার অভ্যাস কখনোই হয়নি। তবু মাঝে মাঝে জাগি। জাগতে হয় নিতান্তই অনোন্যপায় হয়ে। হয়তো কোন ছবি দেখছি, কোন দুর্দান্ত বই পড়ছি, ক্লাশের এসাইনমেন্ট তৈরী করছি, অথবা কোন লেখা তৈরী করছি, সেই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে একটু গভীর রাত পর্যন্ত জাগা হয়। গভীর রাত ছাড়া লিখতে পারিনা। লেখা আসেনা, চিন্তা আসেনা। সেজন্য কিছু লিখতে গেলেই গভীর রাত পর্যন্ত জাগতে হয়। তা না হলে মধ্যরাতের আগেই বিছানায় চলে যাই। ঘুম খুব জরুরী।

ঘুম খুব জরুরী। তবু ঘুমোতে পারিনা। বছরের বিশেষ একরাতে ঘুম আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালায় সুদূরে। ঘুম ফাঁকি দেয়? না আমিই ঘুমকে কাছে ঘেষতে দিইনা? বুঝতে পারিনা। কোন এক বিশেষ রাতে আমি ঘুমোতে পারিনা। মনে আছে, বেশ ক'বছর আগে সেই রাতে ঘুমের ঘোরে প্রবল দু:স্বপ্নে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠেছিলাম। তখন থেকেই সেই রাতে আর ঘুমোতে পারিনা। ঘুমোলেই দু:স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ্গেনা কখনোই, দু:সপ্নের হুন্কার শুনলে মূহুর্তেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। এখন আর ঘুমই পায়না দু:স্বপ্নের ভয়ে।

সেই রাতে ঘুমোলেই ঘড়ঘড় ট্যাংকের আওয়াজ শুনতে পাই আমি। মনে হয় ট্যাংকগুলি হয়তো আমার বুকের জমিনকে লাল করে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। নিজের বুকটিকে আমার বাংলার পতাকা মনে হয়। বুকের রক্ত দিয়েই তো পতাকা এসেছে, এসেছে স্বাধীনতা? তাই ট্যাংকের ভয়াল চিতকারের ভয়ে আমি ঘুমোতে পারিনা। চোখ বুঝলেই চোখের সামনে ট্যাংক ভেসে উঠে, ভেসে উঠে রিকয়েলেস রাইফেল, মর্টার, শেল, গোলাবারুদের স্তুপ। ভেসে উঠে লাশের ছবি, ধ্বংসজজ্ঞের দৃশ্য। আমি ঘুমোতে পারি না। এইসব আমাকে ঘুমোতে দেয় না।

বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই শুনি বাতাসের ইথারে কাপন তুলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে খুনী শকুনদের অশ্লীল কন্ঠধ্বনি। শুনি ভুট্টো বলছেন, "খোদা মেহেরবান, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে"। বিগবার্ডকে খাচায়

পুরে মেজর জাফরের উল্লোসিত কন্ঠও আমি শুনতে পাই। আরও শুনি বেলুচিস্তানের কসাই টিক্কা খানের টেলিফোন ধ্বনি, "খাদিম আজ রাতেই"। ওটা এতো পরে শুনি কেন? কত সহজেই না উচ্চারিত হলো কথাটি! ! যেন আজ রাতে কোন ডিনারের দাওয়াত দেয়া হলো। এত সহজ-সরল কথায় আমার ঘুম আসেনা। আমি কবিতাপ্রেমী, আমার চাই কবিতার রহস্যময়তা, ছন্দের দন্ধ, চিত্রকল্পের মাধুর্যতা। এমন সরল, নির্দোষ বাক্য আমার জন্য নয়। তাই আমি ঘুমোতে পারিনা।

চোখ বুজলেই জলপাই রঙের অন্ধকার গ্রাস করে আমাকে। শুনি লেফটরাইট-লেফটরাইট পদধ্বনি। অশ্লীল মার্চপাষ্টের ভয়ন্কর শব্দ আমার কানকে পীড়া দেয়। শুনি হুডখোলা জীপের প্রলয়োল্লাস, ট্যাংকের আর্ত চিতকার। সবকিছুতে আমি অসুস্হ বোধ করি। মর্টারের আওয়াজ শুনতে পাই। ইকবাল, জগন্নাথ হল সহ অনেক জায়গায় শুনতে পাই বর্বরের মতো গুলির শব্দ। গুলির শব্দ বড়ো অশ্লীল মনে হয়। পিলখানা, রাজারবাগে রক্তের বন্যা দেখি। থকথকে রক্ত পড়ে থাকতে দেখি রাস্তায় রাস্তায়। ভাবি, বুড়ীগঙ্গা কি তবে ঢাকা শহর গ্রাস করেছে? জলের বদলে কি তবে বুড়ীগঙ্গা জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে বাঙ্গালীর বুকের রক্ত? রক্তস্নানে ঘুম আসে কি করে, লাশের ভীড়ে ঘুম আসে কি করে?

ঘুমের চেষ্টায় গেলেই শুনতে পাই দু টি শব্দ - অপারেশন সার্চলাইট। কেউ যেন আমার কানে কানে এসে কথা ক টি বলে যায়। নামটি শুনলেই হাজার ওয়াটের সার্চলাইটের আলো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঘুম ছুটে পালায়। মন জুড়ে বসে অমোঘ ভাবনা। ঘুমোতে পারিনা। ভাবি নামটা যে কেন অপারেশন সার্চলাইট হলো? সার্চলাইট দিয়ে কাউকে কি খুজেছিল ওরা সে রাতে? কাকে খুজেছিল? নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞের নাম অপারেশন সার্চলাইট। "অপারেশন ম্যাস মার্ডার" হলেই যেন বেশী মানাতো। ওরা কি খুজে খুজে মানুষ হত্যা করেছে? ওরা কি নাম জিজ্ঞেস করেছিল? তুম ডক্টর জি. সি. দেব, তুম ডক্টর জ্যোতি গুহ, তুম প্রফেসর মনিরুজ্জামান, তুম ডক্টর সা'দত, তুম শরাফত আলী? ভাবনার সাথে ঘুমের ঝগড়া শুরু হয়। মাঝে আমি কাতরাতে থাকি অসহ্য যন্ত্রনায়।

পাশ ফিরে চোখ বুজতেই কর্নকুহরে আঘাত হানে জ্যোতিগুহর "পানি পানি" বলে কাতরানি। তাঁকে পানি দিতে ইচ্ছে করে আমার। না দিতে পারার অসহ্য যন্ত্রনায় আমি ঘুমোতে পারিনা। সমগ্র ঢাকা জুড়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর পদধ্বনি আমাকে সেই রাতে অনেক বছর থেকে ঘুমোতে দেয়না। ঢাকা শহরের যে অংশে বাস করছি, হয়তো সেখানেই পড়েছিলো অসংখ্য লাশ? আমার পায়ের নীচে হয়তো পড়েছিলো অযুত-নিযুত-লক্ষ মৃতদেহ। যে পথ দিয়ে আজঅফিসে যাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাই, শত্রুর মুখে ছাই দিতে যাই, প্রেমিকার অধরে চুমু দিতে যাই, বেশ্যার সাথে প্রেমহীন সঙ্গম করতে যাই, পেটমোটা ঐ আমলাকে যে পথে ঘুষ দিতে যাই, যে দিকে রহিমা-ফাতেমা-হুসনাকে ধর্ষন করতে যাই, এসিড মারতে যাই যে পথে, ছিনতাই করে হিরোইন নিই যে পথে বসে, সে পথেই তো পড়ে রয়েছিলো ওদের লাশ? আমার মা-বোন-বাবা-ভাইয়ের লাশ? তাই আমার নিজেকে ঘিন ঘিন করে। অশুচি মনে হয় নিজেকে। চরম বমি পায় নিজের প্রতি। আমি নির্ঘুম রাত কাটাই একাকী, নিস্তব্ধ।

আমি ঘুমোতে পারিনা। তোমরা ঘুমোও। হে ঢাকাবাসী, হে দেশবাসী, হে পৃথিবীবাসী, তোমরা ঘুমোও। আমি নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দেব এই রাতে। আমার পিতার মুখের স্মৃতি নিয়ে, মায়ের অমলিন হাসি মেখে, বোনের অভিমান মাখা খুনসুটীতে, ভাইয়ের রক্তাক্ত পান্জাবী গায়ে জড়িয়ে, স্ত্রীর ধর্ষিত দেহখানাকে আলিঙ্গনে বেধে আমি নির্ঘুম রাত্রিতে একাকী পুন্জীভূত ঘৃনার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবো। ঘৃনার দ্বারা আমি ধর্ষিত হবো। তোমরা চরম শান্তিতে ঘুমোবে, স্ত্রীর সাথে, কেউ কেউ চরম পুলকে বেশ্যার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে। ফুটপাতে পুলিশের চাদার আঘাতে শত শত গৃহহারা লান্চিত হবে, কতশত মদ্যপ মাতাল এই রাতে স্ত্রীকে একা ফেলে বাইরে রাত কাটাবে; কতশত চোর-ডাকাত এই রাতে সিদ কাটবে, পিস্তলের মুখে লুট করবে অন্যের ধন; এই রাতেই কতশতলক্ষকোটি শিশু গায়ে মাখবে পৃথিবীর করুন আলো; ঝরে পড়বে আরো লক্ষকোটি তাজা প্রান; বাসর হবে কতশত যুবক-যুবতীর, লাঙ্গল আর জমির সন্ঘর্ষে লুটিয়ে পড়বে তারা; কতশত মা-বোন এই রাতেই পুনরায় ইজ্জত দেবে; কতশত ভন্ড ধার্মিক সেই রাতে মসজিদে রাত কাটিয়ে প্রর্থনার স্হানকে করবে অপবিত্র; আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকারা সেই রাতেই হয়তো ফোনালাপে তাদের প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম দেবে, অশ্লীল কথাবার্তায় তারা পুলকিত হবে, শিহরিত হবে; সেই রাতেও চাদ উঠবে এক ঝকঝকে মসৃন, অপার্থিব আলোয় ভেঙ্গে পড়বে আকাশবাতাসপাহাড়সমুদ্র, সবুজ

বনানীঘেরা কোমল প্রান্তর; ছায়াঘেরা ঝাউবনে লুকোচুরী খেলবে উন্মাদ জোনাকী, এই রাতেই কতশত কবি জন্ম দেবে তাদের অমর কবিতার; সৃষ্টিশীলতার বেদনায় চিতকার করবে কতশত পংক্তি; স্তবকের পর স্তবক; লেখকের অবিনাশী লেখনী তরতর করে এগিয়ে চলবে এই রাতেও; তীব্র জীবনবোধে আকৃষ্ট হবে কতশতকোটি মানুষ।

আমি শুধু শুনতে পাই মৃত্যুর অমোঘ ঘন্টাধ্বনি, ভাইয়ের চিতকার শুনতে পাই, বোনের আর্তনাদ শুনতে পাই, পিতার নির্মোহ দৃষ্টির কাছে হার মেনে যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকি, শোকার্ত মায়ের আচলে দেখি সমগ্র বাংলাদেশের ধর্ষিত চিত্র। চোখ বুজলেই আমি বিশ্বাসঘাতকদের মুখ দেখতে পাই, দাড়ি-টুপিতে ঢাকা শয়তানের মুখচ্ছবি ভেসে উঠে আমার দৃশ্যপটে। শয়তান-ঘাতকের মুখের স্মৃতি নিয়ে আমি আমি ঘুমোতে পারিনা, এমন ঘাতক রাতে আমি ঘুমোতে পারিনা। আমি কোন রাতেই ঘুমোতে পারিনা। শুধু ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি।

http://www.somewhereinblog.net/blog/dadaemimasblog/28781994

আমি যেদিন নিজের হাতে খুন হয়েছিলাম

আকাশচুরি
০৮ ই মার্চ, ২০০৮ বিকাল ৪:১৯

উচু নিচু বিল্ডিং গুলোর ফাঁকে চাঁদটাকে ধরতেই পারছিনা, আবার দেখ শালা শিকারী মেঘগুলো চাঁদটাকে কেমন ফাঁদে ফেলে বোকা বানাচ্ছে আমাকে। কিন্তু আমি চন্দ্রগ্রস্ত হবোই; সোনালী গরলে পুড়ছে কন্ঠা, অমোঘ টানের সাথে আতাঁত করে চোখের পাতা দুটো খুলতেই চাইছে না, আমি ছুটতে থাকি পতংগের মতো। জোছনায় পোড়া রাস্তাটার উজানে গনিকাদের অপেক্ষমান কাফেলা পেরুচ্ছি এমন সময় দূরাগত ঘন্টার ধ্বনি একটা গির্যার ঠান্ডা মেঝেতে আছড়ে ফেলে আমাকে। ধুস শালা, কোথায় গির্যা, একটা কুশাময় রিকশা ঘন্টি বাজাতে বাজাতে একটা অপার্থিব গলির হা করা মুখের ভেতর সেঁধিয়ে পড়লো। গির্যার ঘন্টা নাকি রিকশার ঘন্টি নাকি গনিকাদের হীরন্ময় হাসি, এই সব বিহ্বলের মধ্যে বেজন্মা মোবাইলটা তারস্বরে হৃৎপিন্ডটাকে খামচে ধরে।

"হ্যালো"
"জী ভাই" আমার চাপ আসে, ইতি উতি তাকাই...হু ঐ তো, একটা সাদা দেয়াল কেমন ক্ষুধার্থের মতো তাকাচ্ছে।
"তুই কামটা ঝুলাই রাখলি ক্যান? সবতে ক্রসফায়ারে পড়লে তহন করবি?
আমি তো আগেই কইসি, কইসি না ক? তোর সমস্যা হইবো..হাজার হউক তুইলা আইনা শিখাইয়া পড়াইয়া তুই তো বড় করলি, এমন বড়ো করলি যে আমাগো হোগা মারতাছে তলে" আমি চাপ মুক্ত হতে থাকি। শুভ্র দেয়ালটায় ছেলেবেলার মতো আঁকাআঁকি করি, প্রস্বাবের আঁচড়ে মতিনের খানাখন্দে ভরা মুখটা কেমন হ্যাংলার মতো ঝুলে থাকে দেয়ালে এবং খানিক বাদে সেটা গোত্তা খাওয়া ষাঁড় কিংবা শুকুরের মতো আকার নিয়ে ঝরে পড়তে থাকে।
"ভাই, আমি তো কইসি দুইটা দিন সময় দেন, হইয়া যাইবো।" নিজের বিমুর্ত শিল্পের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি.......বাহ!!
"তোর খারাপ লাগলে থো, পাগলারে দিয়া দেই....."
দেয়ালের মেঘ আর হাতি-ঘোড়া গুলো পাক খেতে খেতে পাগলা সেলিম আর ৩২ টুকরা লাশের লাগেজের আকার নিলে আমি ক্ষান্ত দিই।
"ভাই, দুইটা দিন...এর মইধ্যে পাগলারে আইনেন না।"
মুঠো ফোনের ওপাশে মুহুর্তটা অনন্ত নিরবতায় ডুব দেয় টুপ করে। রাতের হ্যাংওভার, চন্দ্রাহত আমি, হত্যা নকশা আর গির্যা কিংবা রিকশার ঘন্টি, খানাখন্দে ভরা মতিন, পাগলা সেলিম আর ৩২ টুকরা লাশের লাগেজ এবং এই সব অনিবার্যতা আমাকে ছিড়ে খুড়ে ছুঁড়ে দেয়।

আমি আর রাজু চা খাই।
"উস্তাদ, এই সানুর দুকানের কথা তুমার মনে আসে? এই খান থিকা তুমি আমারে নিয়া গেসিলা"
"উম", আমি দুধের ভেতর ডুবন্ত সর দেখি, তর্জনি-মধ্যমার ফাঁকে নিকোটিনের বসত দেখি; শুধু রাজুকে দেখিনা।
"৫টা বসর!" রাজুর কন্ঠে ঘোর। "হালাই সময় কেমুন কইরা কুন চিপার মইধ্যে দিয়া দৌড়াই বুঝবার পারিনা! "
"কাইলকা বড় একটা কাম আসে রাজু।" সিগ্রেটে কড়া টান দিয়ে বলি," বশির চুতিয়ার কাছ থিকা প্যাকেট ডেলিভারি নিতে অইবো।" আংগুলের ফাঁকে সিগ্রেটটা কাঁপে, ধোঁয়ার মেঘ হামলে পড়ে চোখে। বহতা গাড়ি গুলো লাল বাতি দেখে বেমাক্কা রাশ টেনে ধরলে, রাজু ফেরে আমার দিকে, "হুমম, রাইতে না উস্তাদ? তুমি আমারে জানাইয়া দিও, চইলা আসুমনে।"

"তোর পোলাটা কতো বড়ো অইসে রে, রাজু?"
উত্তরাধিকারের কথা শুনে রাজুর চোখ দুটো চকচক করে। "আগামি মাসে ২ বসরে পড়বো, এমুন পাখনা হইসে, উস্তাদ! আমি যহন বাড়ি থিকা বারাই, ছাড়বারই চাইনা, গলার লগে চ্যাতকাইয়া থাকে, অর মা টানলে এমুন চিক্কুর মারে যে হালায় মহল্লার লোক গুলার কানে ধাপ্পি মাইরা যায়!"
রাজুর চোখে অলৌকীক চকমকি দেখে ধন্দে পড়ে যাই। আমি আর রাজু সেই বৈরী সময় যা আজীবন আমাদের পিছু ধাওয়া করে নাকি আমরাই তার সওয়ার হই, তা নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়ি। মগবাজার হোটেলে পুলিশ খুন, মিরপুরে টোটনদের দুই ভাইয়ের লাশ, উত্তরার হাইড আউটে পেটে গুলিবিদ্ধ আমাদের সহযোগি নাকি সহদর নাসিরের রক্তখরন। "তুমি চিন্তা করো উস্তাদ, সেই দিন আমরা নাসিরের জন্যে একটা ডাক্তার আনতে পারি নাই, আমার কোলের মধ্যে তরতাজা পোলাটা সাদা হইয়া গেল! একফোঁটা রক্ত আসিল না!" ঝাঁ চকচকে সূর্যের নিচে সহযোগি নাকি সহদর নাসিরের রক্ত রঞ্জিত আমরা হটাৎ বিব্রত হয়ে পড়ি, রাজু আপ্রান চেস্টা করে নাসিরের রক্ত মুছে ফেলতে কিন্তু বেয়াড়া লালের আক্রমনে পেরে ওঠে না সে। "উস্তাদ, পোলাটা বড়ো অইতাসে, ডর লাগে এখন।" রাজুর ভয় আর নাসিরের শ্বেত-সন্ত্রাস আমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইলে মতিনের খানাখন্দে ভরা মুখ আর পাগলা সেলিম গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

"রাজু, তুই বাড়ি জা গিয়া। আমি এই দিকটা সামাল দিমুনে। কাইলকা সময় মতো চইলা আসিস।"

রাজু নির্জলা রোদের নিচে এইসব বিপন্নতার মাঝে আমাকে একা ছেড়ে গেলে কাঁপা হাতে মোবাইলটা বের করি;
"ভাই আপনারে কইসিলাম দুইটা দিন সময় দেন।"
"আমি কি না করসি?"
"তাইলে সেলিম আর জহিররে সারাদিন আমার পিসে লাগাই রাখলেন ক্যান?" হটাৎ চাপ আসে আমার। ক্ষ্যাপা চোখে তৃষ্ণার্ত দেয়াল খুঁজি, কিন্তু শালা দেয়াল গুলো ফাঁকতালে কেমন উধাও হয়ে গেল।
"আরে না, কি যে কস না তুই। অরা তোরে ফলো করবো ক্যালাই? তুই তো জানোস, পাগলার এই সবে আগ্রহ একটু বেশি" মতিন ভাই গা দুলিয়ে হাসে। শালা ঢাকা শহর কি দেয়াল শুন্য হয়ে গেল? দেয়াল ছাড়া ন্যাংটো বাড়ি গুলো আব্রু ঢাকবে কি দিয়ে? হঠাৎ হাতের বা'য়ে ভোজবাজির মতো সাদা দেয়াল গজিয়ে ওঠে ক্যানভাস হয়ে , আমি হাপ ছেড়ে বাঁচি!
"ভাই, আমি আপনারে কইসি দুইটা দিন। এর পরেও যদি আপনি...." অবাক এবং ঘেন্না ঝরে পড়া অনেক চোখের সামনে আমি ক্যানভাসে তুলি চালাই। ".....পাগলারে লেলান তাইলে খরচের খাতা বাড়বো।" ক্যানভাসে খানাখন্দে ভরা মতিন আর পাগলা সেলিম পরস্পরের উপর উপগত হয়ে বিমুর্ত শিল্পের সৃস্টি হলে আমি মুগ্ধ হই। "ভাই, আপনি যা কইসেন সব শুইনা আসচি। আমারে আপনার অবাধ্য কইরেন না।" জিপার টানার ফাঁকে বলি আমি। মুঠো ফোনের ওপাশে মুহুর্তটা অনন্ত নিরবতায় ডুব দেয় টুপ করে।

সেদিনও ছিল মাতাল চাঁদ। কালো গাড়িটাতে ৪ জন সওয়ারি। "উস্তাদ, দেখসো, হালায় চান দেখি আমাগো লগে পাল্লা দিতাসে! ঐ জহিররা্যা, জুরে চালা চান মাতারির পোলা য্যান আমাগো টেক্কা দিবার না পারে!" রাজুর চোখে অলৌকিক চকমোকি। ওর ছেলের জন্য কেনা লাল গাড়িটা দেখায় আমাকে। "পুলার আমার গাড়ি খুব চয়েজ বুঝলা উস্তাদ! বড়ো হইয়া ডেরাইবার হইবো কিনা আল্লাই জানে!" রাজুর হাতের চেটোই লাল একটা গাড়ি, হঠাৎ দেখি মগবাজারের হোটেলে খুন হওয়া পুলিশ, মিরপুরে টোটনদের দুই ভাই আর আমাদের সহযোগি নাকি সহদর নাসির, ওরাও চাঁদ ফাকি দেওয়ার অভিযানে শরিক হয়। চোখ লাল করে এমনকি মাথা ঝাঁকিয়েও তাড়াতে পারিনা ওদের, হতচ্ছাড়া লালে এমন চেটকে থাকে ওরা যে আলাদা করতে না পারার হতাশায় চাপ আসে আমার। হাইওয়ের ধারে ধান ক্ষেতের পাশে গাড়ি থামাই। "জহির তুই গাড়িতে থাক" আমরা তিন জন বেরিয়ে আসি। রাজু চোখ সরু করে প্রায় আঁধারে বশিরকে খোঁজে।

"বশির চুতিয়া দেহি এহনো আসে নায়, উস্তাদ।"
"একটু আগাইয়া দেখ রাজু।" আমার কন্ঠ একটুও কাঁপে না কেন?
রাজু আমার সামনে কুয়াশার চাদরে জড়ালে পিস্তলটা বের করি আমি। মাত্র একটা বুলেট, সবুজ ধান ক্ষেতটা জড়িয়ে ধরে রাজুকে। আমি হামা দিয়ে রাজুর প্রায় দু বছর বয়সি ছেলেটার সেই লাল গাড়িটা খুঁজি। জহির আর বাবলু টানতে চায় আমাকে, "উস্তাদ, জলদি আহো!" "সর কইলাম খানকির পুতেরা!" আমি হ্যাচকা টানে ছাড়িয়ে নিই নিজেকে, আঁতিপাঁতি করে খুঁজি গাড়িটা। হ্যা ঐতো... লাল গাড়িটা মগবাজারের হোটেলে খুন হওয়া পুলিশ, মিরপুরে টোটনদের দুই ভাই আর আমাদের সহযোগি নাকি সহদর নাসির আর রাজুকে নিয়ে চাঁদটার সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে!!

http://www.somewhereinblog.net/blog/Akashchuriblog/28777461

একজন অতিমানবের গল্প

মোস্তাফিজ রিপন
১০ ই এপ্রিল, ২০০৮ রাত ৩:১৮

আতাহার মিয়া আমাদের অফিসের পিওন। ছোটখাট মানুষ, থুতনির নীচে সামান্য একগোছা দাঁড়ি আর তেল চপচপে কাঁচা-পাকা চুল ছাড়া তার আর কোন বৈশিষ্ঠ্য আমার চোখে পড়েনি কখনো। রোজ সাড়ে নয়টায় আমার টেবিলে এক কাপ চা দিয়ে উচ্চস্বরে আমাকে সালাম দেয়। আমি খবরের কাগজের পাতা থেকে চোখ না তুলেই বলি, খবর ভালো আতাহার মিয়া? আতাহার মিয়াও প্রতিদিন একই উত্তর দেয়, আল্লাহ রাখছে। তারপর সে পাশের টেবিলের আলী সাহেবকে চা দিতে এগিয়ে যায়; এরপর বেনু ম্যাডামের টেবিলে এবং এক সময় হারিয়ে যায় টেবিল-চেয়ারের জঙ্গলে।

আমি চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দেই, ইচ্ছে করে দীর্ঘায়ু দেই এক কাপ চায়ের। আলী সাহেব, যিনি সারাক্ষণ জগতের নানান দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত এবং বা কানের লতির পেছন দিকটা চুলকাতে ব্যস্ত- তিনি প্রতিদিনের মতো জিজ্ঞেস করেন, প্রত্রিকায় বিশেষ কোন খবর আছে কিনা! আমি যথারীতি রসিকতা করে বলি, রুমকি বৃত্তি পেয়েছে; খোকন সোনার জন্মদিনে তার দাদা-দাদী দোয়া চেয়েছে- এ দু'টোই বিশেষ খবর বলে মনে হলো; বাকি সংবাদগুলো গতকাল কিংবা পরশু'র মতোই। এরপর আমি পত্রিকাটা আলী সাহেবের টেবিলের দিকে ঠেলে দিয়ে বলি, পড়ুন। আলী সাহেব পত্রিকাটা হাতে নিতে নিতে বলেন, আর ভালো লাগেনা ভাই। ওপাশের টেবিল থেকে বেনু ম্যাডাম বলে ওঠেন, আলী সাহেব, সবই বয়সের দোষ। আমরা তিনজনে অফিসে প্রাতঃকালীন গল্পে মনযোগী হই; আলী সাহেবের ভালো মানুষির সুযোগ নিয়ে ঠাট্টা করি- বলতে গেলে অফিসে এটি আমাদের প্রতিদিনের রুটিন।

আজ সকালে আমাদের রোজকার রুটিন গল্পে ছেদ পড়ল।

সকালে আতাহার মিয়া যথারীতি আমাকে উচ্চকণ্ঠে সালাম দিয়ে টেবিলে চা রেখে গেল। আমিও অভ্যাসবশত তার কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। আতাহার মিয়াও একই উত্তর দিল; তারপর আলী সাহেবের টেবিলে চা রাখতে রাখতে বলল, এমডি স্যার দেখা করতে বলেছেন। পাশের টেবিল থেকে বেনু ম্যাডাম ঠাট্টা করে বললেন, আলী সাহেব, এইবার আপনার প্রমোশন ঠেকায় কে! যতই ঠাট্টা হোক, আমি নিজের ভেতর ঈর্ষার কাঁটা টের পাই। প্রায় বছর দশেক আগে আমি আর আলী সাহেব এই অফিসে কাজে ঢুকেছি । দু'জন একই সাথে জুনিয়র অফিসার পদ থেকে অফিসার হয়েছি। যে আমার পাশের টেবিলে বসে চা খায়, যার সাথে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে আমি অফিস থেকে বাসায় ফিরি- তার প্রমোশন, হোক না আমরা আলাদা ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি, হোক না সে বেনু ম্যাডামের নিরিহ ঠাট্টা- আমাকে ঈর্ষান্বিত করে। আমি কিছু না বলে আলী সাহেবের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাই, তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি- বেনু ম্যাডাম ঠিকই বলেছেন। আলী সাহেব চা শেষ না করেই উঠে পড়েন।

আমি আলী সাহেবের ফিরে আসার অপেক্ষায় এক কাপ চায়ের আয়ু সুদীর্ঘতর করি। চা ঠাণ্ডা সরবত হয়ে তলানিতে ঠেকলে আলী সাহেব এমডি স্যারের রুম থেকে বের হয়ে আসেন। আমি আর বেনু ম্যাডাম আলী সাহেবের দিকে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকি। আমি ঠাট্টার সুরে বলি, আলী সাহেব, আতাহার মিয়ারে মিষ্টি আনতে পাঠাই? বেনু ম্যাডাম কি বুঝলেন জানিনা, বললেন, আলী সাহেব, সবকিছু ঠিক আছে তো! বেনু ম্যাডামের কথায় আমি হঠাৎ করেই বুঝে উঠি কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, এটা তামাশা করার সময় নয়। আমি চেয়ারটা আলী সাহেবের টেবিলের দিকে টেনে আনি। তারপর নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করি, কোন সমস্যা হয়েছে? আলী সাহেব আজকের পত্রিকার পাতায় কলম দিয়ে দাগ কাটেন, আঁকিবুকি করেন, উত্তর দেন না। এক সময় আতাহার মিয়া এসে জানিয়ে যায়, এমডি স্যার দেখা করতে বলেছেন আমাকে। আমি বেনু ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে, কিছু বুঝতে পারছিনা জাতীয় চেহারা করে এমডি স্যারের রুমের দিকে এগিয়ে যাই।

- স্লামিকুম স্যার; ডেকেছেন?
এমডি স্যার কী একটা ফাইল মনযোগ দিয়ে দেখছেন; সেটি থেকে চোখ না সরিয়ে আমি আতাহার মিয়াকে যেভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করি, সে ভাবে আমাকে বললেন, খবর ভালো?
- জ্বী স্যার।
- পার্চেজটা কয়েকটা দিন দেখতে পারবেন, নতুন লোক না নেয়া পর্যন্ত?
- আলী সাহেব তো পার্চেজ দেখেন।
- কতদিন চেনেন তাকে?
- এই বছর দশেক; আমরা একই সাথে জয়েন করেছি স্যার।
- এ লোক তো মহা ধুরন্ধর!
- কি হয়েছে স্যার? আমাকে বলা যাবে?
- আমাদের অফিস সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে। গতমাসে টেণ্ডার হয়নি জানেনতো? আলী সাহেব সাপ্লাইয়ারকে বলেছেন, আগের রেটে মাল নেয়া নাকি সম্ভব না; সাপ্লাইয়ের কাজে টিকে থাকতে হলে টাকা-পয়সা ঢালতে হবে, এইসব আরকি!
- আলী সাহেব ঘুষ নিয়েছেন!
- তাও আবার মাত্র দেড় হাজার টাকা। এর আগে আর কি কি করেছে কে জানে! যাহোক, আমি এইসব চোর রাখব না অফিসে। আমি তাকে রিজাইন করতে বলেছি; আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে সরাসরি বরখাস্ত করত।

গতমাসে আলী সাহেব আমার কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলেন; খুব নাকি টানাটানি যাচ্ছে তার। আমি ধার দিতে পারিনি; আমার নিজেরই টানাটানি! অফিস থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ী ফেরার প্রস্তাবটা মাস দু য়েক আগে আলী সাহেবই আমাকে দিয়েছিলেন; আমি সানন্দে রাজি হয়েছিলাম এই বলে, যাক, ব্যায়ামটা হয়ে যাবে। আলী সাহেব খুশি হয়ে বলেছিলেন, তা ঠিক। পথটা একটু বেশী, ঘণ্টা দেড়েক লাগে; তাতে কী! যত হাঁটা তত ব্যায়াম, কি বলেন? আমরা কেউই বলিনি- এভাবে এত অনটন নিয়ে চলা যায়না; অফিসে আসা যাওয়ার খরচ বাঁচলে ছেলেমেয়ের মুখে কিছু জুটবে। কয়েকদিন হলো বেনু ম্যাডামও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। আমাদের দেড় ঘণ্টার পথ দুই ঘণ্টায় ফুরোয় না এখন। তারপরও আমরা হাঁটি, জগৎ-সংসার, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গল্প করি; ভুলে থাকার চেষ্টা করি- এই শহরের এত বিশাল আয়োজনের মধ্যে আমরা কত তুচ্ছ; অথবা কত বিশাল আমাদের এই স্বাস্থ্য সচেতনতা!

- স্যার একটা কথা বলব? মানবিক দিক বিবেচনা করে কি আলী সাহেবের চাকুরিটা রাখা যায়? এই অসময়ের বাজারে আরেকটা কাজ খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব তার জন্য!

এমডি স্যার আমাকে ছোট একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, আপনি হলে কি করতেন? আমি চুপ করে থাকি, এক সময় নিজের টেবিলে ফিরে আসি। পথে একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের হাবিব সাহেব দেঁতেল হাসি দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কথা সত্য নাকি?' আমি ঘাড় নাড়ি। হাবিব সাহেবের উৎসাহ বাড়ে, 'কথায় বলে না- চোরের দশদিন আর গেরস্তের- হা হা হা'। পরে কথা হবে বলে আমি নিজের ডেস্কে ফিরে আসি। বেনু ম্যাডাম আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন; আলী সাহেব শব্দ করে কেঁদে উঠেন, আমাকে বাঁচান ভাই।

অফিস শেষে সেদিন আমি আর বেনু ম্যাডাম হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরি। পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে। বেনু ম্যাডাম চাপা গলায় বার কয়েক বললেন, আলী সাহেবের মতো মানুষ! আমার বিশ্বাস হয় না! আমি চুপ করে থাকি। হঠাৎ সিগারেটের তেষ্টা পায়। মাস খানেক হলো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি; আলী সাহেবের পরামর্শেই। ব্যায়াম আর ধূমপান নাকি এক সাথে চলেনা। আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে বলেছি, বাড়তি খরচ। আলী সাহেব ধূমপান বিরোধী বক্তব্য শেষ করে বলেছিলেন, ভাবছি টেলেভিশনটা বেঁচে দেব, ছেলেমেয়ের পড়ালেখা নষ্ট করে।
- বুঝলেন, ছাত্রজীবন অধ্যাবসায়ের, টেলিভিশন দেখার না। ওরা বাচ্চা মানুষ এসবের কি বুঝবে বলুন!
- তা ঠিক।

- কথাটা শুনে বড় মেয়েটা একটু কান্নাকাঁটি করেছে, তা করুক। যদিও ইংরেজী খবরটা শুনলে বাচ্চাদের ইংরেজীটা ভালো হত! পাশের বাসায় মাঝে মধ্যে খবরটা দেখলেই হবে, কি বলেন?

মাস তিনেক হলো আমার টেলিভিশন সেটটি বিক্রি করে দিয়েছি। বাচ্চারা কান্নাকাটি করেছে কয়েকদিন। মোবাইল ফোনটিও অচল হয়ে আছে বেশ কিছুদিন। আমার স্ত্রী মুখভার করে বসে থাকে সারাক্ষণ, ছেলে মেয়েদের সাথে সামান্য বিষয় নিয়েও তুমুল বকাঝকা করে; আমি না দেখার ভান করে অফিস থেকে নিয়ে আসা পত্রিকাটা আবার পড়তে শুরু করি। সুদিনের আশায় এভাবেই চলছে আমাদের।

পথে আতাহার মিয়ার সাথে দেখা হয়। দু হাত ভর্তি বাজার সদাই তার। আমরা না দেখার ভান করে এগিয়ে যাই। কিন্তু আতাহার মিয়া ঠিকই আমাদের উচ্চস্বরে সালাম দেন; ভারি ব্যাগ টানতে টানতে কাছে আসেন; তারপর সমবেদনার সুরে বলতে থাকেন, আলী স্যারের মতো ভালো মানুষ হয়না, সে কেন এমন কাজ করল! বেনু ম্যাডাম প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করেন।
- এত বাজার! কতদিনে খাবেন আতাহার মিয়া?
- আপা, একটা দোকান চালাই। এগুলি দোকানের মালপত্র।
- আপনার দোকানও আছে নাকি?
- এই সন্ধ্যার পর অফিস শেষে বাড়ীর সামনে চা-বিড়ি বেচি। না হলে তো বাঁচতে পারব না।
একটু বলে আতাহার মিয়া চুপ করে থাকেন; তারপর আবার শুরু করেন, বলতে লজ্জা নাই, কয়েকদিন রিক্সা চালানোরও চেষ্টা করছি; শরীরে কুলায় না, বয়স বাড়ছে তো!
- আপনিতো অতিমানব আতাহার মিয়া!

অতিমানব কথাটির মানে আতাহার মিয়া জানে কিনা জানিনা। উত্তরে বলে ওঠে, আজকের ব্যাগটা বেশী ভারী।

প্রতিদিন জ্যামে আটকে থাকা বাসের দিকে তাকিয়ে- আমরা হেঁটে হেঁটে বাড়ীতে ফেরার কষ্টে খানিকটা হলেও সান্ত্বনা পাই। আমাদের অস্বস্তিটাকে বাড়িয়ে দিতে আজ পথে জ্যামও নেই। বেনু ম্যাডাম বলেন, এখন না হয় কোনভাবে দিন কেটে যাচ্ছে, এভাবে আর কিছুদিন চললে কী হবে বলুনতো!
- খুব তাড়াতাড়ি সব ঠিক হয়ে যাবে।
- আপনার তো একটা গতি হল! পার্চেজের এক্সট্রা দায়িত্ব নিলে বেতনও তো বাড়বে, তাইনা?

আমি আশার আলো দেখি; আমার কিশোর-কিশোরী সন্তানের মুখ দেখি। দেখতে পাই ওরা আমাকে ঘিরে টিভি দেখতে বসেছে, হাসছে গল্প করছে। আমি আলী সাহেবের কথা ভুলে যাই, যার অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। আমি নিজেকে মার্কেটিং আর পার্চেজের দায়িত্ব নেয়া বিশাল কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে দেখি, যে অভাব কি জানেনা, স্ত্রীর দিশেহারা শুকনো মুখ কোনদিন দেখনি, টাকার অভাবে যাকে ব্যায়ামের নামে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়না।

কিন্তু আলী সাহেব আবার ফিরে আসেন মাথার মধ্যে। অভাব আমার চেতনাটাই কি নষ্ট করে দিচ্ছে! আমিতো আতাহার মিয়ার মতো অতি-মানব নই। বাড়ী ফেরার পথটিকে বড় দীর্ঘ মনে হয়।

http://www.somewhereinblog.net/blog/mostafizriponblog/28786499

ব্লগালয়ে জামাতের কর্মসূচী' র মূল লক্ষ্য

আরিফুর রহমান
০২ রা ডিসেম্বর, ২০০৭ ভোর ৬: ৫২

বাংলা ব্লগের ইতিহাস বেশিদিনের নয়। বাঙ্গালী প্রগতিশীল সংস্কৃতির কিছু উপাদান বরাবরই এদেশের মোল্লা সমাজের গাত্রদাহের কারন, ব্লগিং তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলা লেখালেখির এই নতুন চর্চায় গতি আসে, বেশকিছু ভালো ব্লগিং সাইট প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীলতার চর্চা সাধারনত কায়েমী স্বার্থের লেজে পা দিয়ে থাকে। ব্লগও তার ব্যাতিক্রম নয়। সত্যি বলতে ব্লগিংই আম জনাবের বক্তব্য সম্পাদকীয় কাটাকুটি ছাড়াই এই প্রথম প্রকাশ করছে, পাঠকও তাঁর মত ব্যক্ত করছে মুহূর্তের মাঝেই। পাঠক লেখকের এই অসাধারন মিথস্ক্রিয়ায় বাংলা সাহিত্যে এক চমতকার ধারার সুচনা হয়েছিলো।

অপেক্ষাকৃত নতুন এই মাধ্যমটির জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব ধর্মীয় ব্যাবসায়ীদের চোখ এড়ায়নি। বাঙ্গালী সমাজের সহনশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রগতিশীলতা হত্যার দায়ে কলঙ্কিত ধর্মবাজদের দল ইদানিং শকুনের নজর দিয়েছে ব্লগিঙের দিকে।

আধুনিক সভ্যতার উপাদানগুলির কট্টর বিরোধী ধর্মসন্ত্রাসীরা তাদের কুটচালে জড়িয়ে ফেলছে সৃষ্টিশীল লেখকদের। অনাবশ্যক ঝগড়া সৃষ্টি করে ব্যাস্ত রাখছে সকলকে। অর্বাচীন প্রলাপ, কুটতর্ক এবং ধর্মীয় বিধান কে অস্ত্র হিসেবে ব্যাবহার করে সকলকে নামিয়ে নিয়ে আসছে এমন এক নিচু স্তরে যেখান থেকে বেড়িয়ে আসা মুশকিল, নতুন সৃষ্টিতো দুরের কথা।

এখানেই তারা সফল। ছোট ছোট যুদ্ধে যদিও সৃষ্টিশীলরা টিকে যাচ্ছে, বড় আকারে আমরা হারাচ্ছি আমাদের মননশীলতা। এটাই কুপমন্ডুকদের মূল লক্ষ্য।

সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় নতুন লেখায়। কিন্তু যখন থেকে জামাত প্রেরিত বরাহনন্দনদের পদচিহ্ন পড়েছে এই ব্লগালয়ে আমরা কি আর এগোতে পেরেছি?

http://www.somewhereinblog.net/blog/arifukblog/28748868

হাওয়া হাওয়া ....

ৃৃমম
১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ সকাল ৯:৩২

'Gone With the Wind' ম্যুভিটা দেখেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে। উনিশ শতকের মার্কিন গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে লেখিকা মার্গারেট মিশেল-এর এই শিরোনামের বইটা যে সিনেমা বানিয়ে ছাড়লে পাঠকেরাই দর্শক হয়ে বক্স অফিস মাত করবে সেটা বুঝতে হলিউডের প্রযোজকদের দেরী হয় নি। চুটিয়ে ব্যবসা করার পর এখন ক্লার্ক গ্যাবল আর ভিভিয়ান লি অভিনীত এই ম্যুভিটি হয়ে গ্যাছে একটা সময়ের আয়না। বিনোদনের লেবেল ছাড়িয়ে এটা হয়ে উঠেছে একাডেমিক আলোচনার উপলক্ষ্য।

আমেরিকার গৃ হযুদ্ধের সময় টা বুঝতে, বিশেষ ক'রে দেশটির কৃষিপ্রধান দক্ষিনের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উপরে এই যুদ্ধের প্রভাব বুঝতে চান? হাওয়ায়.. দেখুন। আমেরিকার দক্ষিনের রাজ্যগুলোতে একদা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতোই ঘরকন্না করা গৃ হিনীর সংখাধিক্য ছিলো। তারা সব কখন, কি ভাবে, জীবনের কোন টানে ঘরে-বাইরে সবখানেই কাজ করতে আরম্ভ করলো জানতে চান? হাওয়ায়..দেখুন। আমেরিকার দাস প্রথা কিভাবে দক্ষিনের রাজ্যগুলোর (confederate states) কৃষিখাতের জন্য সস্তা শ্রম যুগিয়ে যেতো জানতে চান? গন উইথ..দেখুন। কিছুই 'ঝানতে' চান না, স্রেফ বিনোদন খুঁজছেন? নো প্রবলেম, এই ম্যুভিতে সেই মশলারও অভাব নেই খুব একটা।

উত্তরের শিল্পোন্নত রাজ্যগুলোর জন্য চাই অনেক শ্রমিক, কিন্তু শ্রমিকেরা সব দক্ষিনের কৃষি জমিতে বাঁধা। উত্তুরে রাজ্যগুলো (union states) চাইলো শ্রমিকের চলাচলের স্বাধীনতা-যার যেখানে ভালো লাগবে সেখানে নিজ শ্রম বিক্রি করতে পারবে। দক্ষিন তাতে রাজি না। জমিতে বিনা পয়সায় (শুধু থাকা খাওয়ার বিনিময়ে) লাংগল চালাবে কে? এনিয়েই গৃহযুদ্ধ।

আমি রাত জেগে দেখি। ইতিহাসের পটভূমিতে বিশাল কাহিনি (প্রায় চার ঘন্টা)। জর্জিয়ার টারা (Tara) নামের সেই ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা গ্রামে গল্পের শুরু। সম্পন্ন সামন্ত মার্কা গেরস্ত ঘরে বেড়ে ওঠা মেয়ে স্কারলেট ও' হারা। প্রেমিক ছেলেটা গৃ হযুদ্ধে চলে গেলে মেয়েটা খুব কস্ট নিয়ে অপেক্ষা করে 'সব কিছু' ঠিক হয়ে যাবার। কিছুই ঠিক হয়না। এই যুদ্ধ বরং আমেরিকার দক্ষিনের শতাব্দী প্রাচীন ভিত্তিকেই চিরতরে নাড়িয়ে দ্যায়। ঘরের মেয়েরা জীবনের টানে জীবিকা খুঁজতে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। স্রেফ জীবন বাঁচাতে অনেক মেয়ে বিয়ে করে। অনেকে নাম লেখায় অন্যান্য ব্যবসায়।

দেখি আব্রাহাম লিংকন নির্বাচনে জয়লাভ। দাস প্রথা উচ্ছেদ তথা শ্রমের অবাধ চলাচলের অধিকারের পক্ষে তার অবস্থান। দক্ষিনের জেনারেল লী হারলো গ্যাটিসবার্গের যুদ্ধে। অশ্রুসিক্ত চোখে স্কারলেট ও' হারা যুদ্ধের নিহতদের তালিকা থেকে খুঁজে ফিরছে প্রেমিকের নাম। উত্তরের বাহিনি ঘিরে ফেলেছে আটলান্টা-দক্ষিনীরা পিছু হটার আগে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় গোটা শহর-পোড়া মাটি নীতির ফর্মুলায়। আমি ঘটনার সাথে একাত্ন হয়ে যাই। কাল আমি দক্ষিনের একটা ইউনিতে যাবো একটা কনফারেন্সে। টারা গ্রামটা একবার না হয় দেখেই আসবো।

দেখি স্কারলেট (ভিভিয়ান) আর রেট বাটলারের (ক্লার্ক গ্যাবল) এর ভালোবাসা। ওদের ফুটফুটে মেয়েটা ঘোড়ায় চড়া শিখতে গিয়ে বাড়ির আংগিনাতেই মারা যায়। লিংকন মারা যান আততায়ীর হাতে। সেই কস্ট আমাকেও ছুঁয়ে যায়। আমি উত্তেজনায় অধীর হয়ে আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করি। কাল আমি জর্জিয়া যাবো।

আটলান্টা এয়ার পোর্টে নেমে ক্যাবচালককে জিগ্যেস করি টারা যাবার উপায়। আমাকে হতাশ করে দিয়ে সে বলে টারা একটা কাল্পনিক জায়গা। তবে বইটির লেখিকা মার্গারেট মিশেলের বাসা, যেটা কিনা এখন যাদুঘর, সেটা এই শহরেই অল্প কিছুটা পথ।

আমি ভেবে পাই না, যে কাহিনীর অনেকগুলো চরিত্র জীবন থেকে নেয়া-(যেমন লিংকন, জেনারেল গ্রান্ট, লী, শেরম্যান), সেখানে একটা গ্রামের নাম জীবন থেকে নিলে কি এমন ক্ষতি হতো? আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমি যে নিজের অজান্তেই সত্যি টারা নামের একটি গ্রামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছিলাম!

পুনশ্চ:
১. শুনেছি জর্জিয়ার পর্যটন দপ্তর সম্প্রতি এদের একটা গ্রামের নাম দিয়েছে টারা।

২. শুনেছি লেখিকা মার্গারেট মিশেলের বাড়িটা, যেটা এখন যাদুঘর, তিন তিনবার রহস্যজনক অগ্নিকান্ডে পুড়ে যায় এবং পুনর্নির্মিত হয়।

http://www.somewhereinblog.net/blog/amikhanblog/28771086

আমার সাথে এক ভিখারীর কিছুক্ষণ

চির সবুজ
০৯ ই এপ্রিল, ২০০৮ বিকাল ৫:১৩

জুম্মার নাজাম পড়ে বের হয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি মসজিদের বাহিরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি মানুষ একে একে বেরিয়ে যায় মসজিদ থেকে। দেখলাম গেটে ৪ জন ভিখারী দাঁড়িয়ে আছে। তিন জন মহিলা আর একজন পুরুষ। যে যে পারছে তাদের কিছু পয়সা বা টাকা দিচ্ছে। পুরুষ ভিখারীটাকে তেমন কেউ কিছু দিচ্ছে না আর সেও কিছু চাইছে কারো কাছে। একটা দুমরানো মোচরানো এলুমনিয়ামের ছোট ময়লা গামলা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথা বলছে না বরং কাঁপছে। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

একপায়ে দুপায়ে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। বললাম চাচা কোথায় থাকেন? আমার দিকে আধাবোজা চোখে তাকিয়ে কি বলল কিছু বুঝলাম না। তার ইশারায় যতটুকু বুঝলাম সে দুই দিন যাবত কিছু খায়নি। একটা মানুষ দুই দিন ধরে কিছু না খেয়ে কিভাবে থাকে। খুব খারাপ লাগলো। আমি বললাম চাচা, চলেন আমার সাথে, আজকে আপনি আমার মেহমান। আমার সাথে দুপুরে খাবেন।

সে খুব কষ্ট করে আমার পিছনে পিছনে হেটে আসলো। বাসায় নিয়ে এসে তাকে ফ্যানের নিচে বসিয়ে আগে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি খেতে দিলাম। সে আরো এক গ্লাস আমার কাছ থেকে চেয়ে নিল। বললাম, কিছুক্ষণ বসেন, ঠান্ডা হোন, তারপর খাওয়া যাবে।

আমার স্ত্রী তাকে কাছে বসিয়ে খেতে দিলেন। সত্যিকথা বলতে কি আমি কোনদিন এভাবে কখনও কোন মানুষকে খেতে দেখিনি। কতদিন না খেলে মানুষ এভাবে খেতে পারে। আমাদের অবাক করে দিয়ে সে গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে।

চাচামিঞার খাওয়া শেষ হলে বললাম, আপনি কিছুকণ রেষ্ট নেন। তারপর আপনি যেখানে যাবেন চলে যান। সে বললো, তার সাথে তার স্ত্রী থাকে। ছেলেপুলে বড় হয়ে গেছে কোন খোঁজ খবর নেই। ভাবলাম, যে বাবা মা তার সন্তানকে নিজের মুখের খাবার না খেয়ে মানুষ করে সেই ছেলে মেয়ে বড় হয়ে বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। খুব খারাপ লাগলো। আরো জানলাম, একসময় তারও ঘরবাড়ী, চাষের জমি, চাষের বলদ সবই ছিল। আজসে নিঃস্ব। পথের ফকির। নদী ভাঙ্গনে সব হারিয়ে গেছে। তার সাথে কথা বলে বুঝলাম সে কিছুটা হলেও শিক্ষিত।

সে বলল, সারাদিন ভিক্ষা করে যা পায় তা দিয়ে আধাকেজি চালও কিনতে পারে না। খাবে কি? আর এখন সবকিছুর দাম বাড়াতে কেউ আগের মত ভিক্ষা দিতে চায় না। খুব কষ্ট পেলাম, বেচারার অবস্থা দেখে। আমার স্ত্রী চাচামিঞার স্ত্রীর জন্য কিছু ভাত তরকারী দিয়ে দিলো। আমি তাকে হাতে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললাম, যখন খুব সমস্যায় পড়বেন তখন আমার বাসায় চলে আসবেন। কোন সমস্যা নেই।

লোকটা কাঁদলো কিছুক্ষন। আমি বললাম, কাঁদবেন না। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আমাদের সকলের এই কষ্ট যেন তিনি দুর করে দেন। সে বলল, বাবা অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সবার দুঃখ একসময় দুর করে দিবেন। আবার সুদিন আসবে। আমরা আবার সুখে থাকবো।

লোকটি আমার আর আমার স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেল। আমরা তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার চোখটা ভিজে গেল পানিতে। এত কষ্ট সহ্য করতে পারিনা।

রাস্তাঘাটে অনেক মানুষ দেখি বলে ৪ দিন খাইনি, ৫ দিন খাইনি। আহা মানুষের কত কষ্ট। এই অভাবী মানুষদের একবেলা খাইয়ে আমি কিইবা করতে পারবো। তাও তো মনে সান্তনা যে, একটা মানুষ অন্ততঃ একবার পেট ভরে খেল।

http://www.somewhereinblog.net/blog/milton3dblog/28786383

বরুণাদের জন্য অভিশাপ.................।।

ভাঙা চাঁদ
১১ ই আগস্ট, ২০০৭ রাত ১১:৪৬

আজকে আমার খুব ভাল লাগতাছে। কারণ আজ শেষ হবে জীবনের সব লেনদেন। না বনলতা সেনের সাথে না, শেষ হবে বরুণার সাথে। প্রশ্ন আসতে পারে বনলতা সেনের সাথে নয় কেন? কারণ বরুণারা আসে বনলতা সেনের মত কিন্তু তাদের শেষ হয় বরুণাদের মত।
আবার অনেকেই সুরঞ্জনার পরিনতি গ্রহণ করে। বিষয়টা হয়ত আপনাদের বোধগম্য হলনা।

"মৃত্তিকার মত তুমি আজ
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।
সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস-"

আমি আপনাদের কি বোঝাবো, আমি নিজেই এখনো বুঝে উঠতে পারি নাই বরুণারা আবার সুরঞ্জনা হয় কেন? তারা তো বরুণা হয়েই ভাল ছিল, আবার সুরঞ্জনা কেন???
জানি না। এই প্রশ্নের উত্তর দিবে যে কোন এক নারী যারা কাউকে পরিনত করে সুনীলে, জীবনানন্দে অথবা কোন কবিতার ব্লগারে।
আজকে আমার এই লেখার শেষ হবে বরুণা, সুরঞ্জনা দেরকে অভিশাপ দিয়ে।।
সকল পাঠক সাক্ষী, বরুণা, সুরঞ্জনা দেরকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি।
তারা কখনো নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতকে উপভোগ করতে পারবে না, তারা কখনো তারা জ্বলা সৈকতে হাঁটতে পারবে না, পারবে না কখনো ঝাউএর ছায়ায় বিশ্রাম নিতে, তাদের দেখে কখনো জোড়া শালিক বসবে না ধানের খেতে, তাদের পায়ে ঘুঙুর কখনো আওয়াজ তুলবে না। তাদের সামনে কখনো ডানা মেলবে না সোনালী ডানার চিল, তাদের হৃদয়ে কখনো সুরের ঝংকার উঠবে না, তাদের চোখ কখনো দেখবেনা কৃষ্ণচূড়ার আগুন, বসন্তের হলুদ কখনো ছুঁয়ে যাবে না তাদের। বৃষ্টির পানিতে তারা পা ভিজাতে পারবে না, পারবে না নিতে শাপলা শালুকের ঘ্রাণ।।

পাঠক বিশ্বাস করুন, তাদেরকে অভিশাপ দিতে গিয়ে আমার চোখের কোণ টলমল করছে, কারণ এক সময় তো তারা বনলতা সেন ছিল, দু দন্ড শান্তি দিয়েছিল। আমি নিরুপায়, তাদেরকে অভিশাপ দিতেই হল কারন আমাকে তো কষ্ট পেতে হবে, আমাকে তো জীবনের সব লেনদেন শেষ করতে হবে।
তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার জীবন টা শেষ হোক এখানেই, এভাবেই।
বিদায়, পৃথিবী বিদায়.................।।

http://www.somewhereinblog.net/blog/brokenmoonblog/28725204

হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধঃ ৫ই মার্চ ৭১, কয়েদিরা জেল ভেঙ্গে যান শহীদ মিনারে ।

আবুল বাহার
০৫ ই মার্চ, ২০০৮ বিকাল ৩: ৩০

৪ মার্চ , ৩ মার্চ, ২ মার্চ, ১মার্চ

৫ই মার্চ ৭১ । সারা দেশ থেকে মুক্তিকামি জনতার উপর পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনির গুলিবর্ষনের খবর আসতে থাকে ।কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছিল মুক্তিকামি জনতার উত্তাল আন্দোলন তত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিল । ৭১' র এই দিনে চট্রগ্রামে পাকনাদার বাহিনির গুলিতে শহীদ হন ২২২জন মুক্তিকামি জনতা ।টঙ্গিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের গুলিতে ৬ জন , যশোহরে ১ জন শহীদ হন ।

মুক্তিকামি জনতা এই দিন অপ্রতিরোঢ্য আন্দোলনের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্হাপন করেন ।ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে ৩২৫ কয়েদি বের হয়ে চলে যান শহীদ মিনারে । তবে কারাগারের ফটক ভাঙ্গার সময় কারারক্ষীদের নির্বিচার গুলিতে ৭ জন শহীদ ও ৩০জন আহত হন । কয়েদিদের এ আন্দোলন সারা দেশের মুক্তিকামি জনতার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দাবী অনুযায়ী এই দিনেই পাক সামরিকজান্তা রাজপথ ছেড়ে ব্যারাকে ফিরে যায় ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/bahar007blog/28776611

দূর্নীতি বনাম স্বজনপ্রীতি ও জাতি হিসেবে আরব জনগন

নাজিরুল হক
২৬ শে জুন, ২০০৭ দুপুর ১২: ২১

সদ্ধ প্রকাশিত টিআইবির রিপোর্ট বাংলাদেশ দূর্নীতিতে তৃতীয় হয়েছিল। আগের বছর গুলোতে প্রথম হয়েছিল। তাহলে এবার কি দেশের দূর্নীতি একটু কমেছিল? না কমেনি, রয়ে গেছে আগের মতই অথবা আগে চেয়েও বেশী। হয়তো অন্যান্য দেশ বাংলাদেশের চেয়েও বেশী দূর্নীতি পরায়ন হয়েছে।
আমাদের দেশে দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি উভয়টাই বিদ্যমান। আমার দৃষ্টিতে স্বজনপ্রীতিও এক টাইপের দূর্নীতি। মামু বা আংকেল এর জোরে চাকরি পাওয়া বা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেওয়া। এটাও কি দূর্নীতি হয়না। স্বজনপ্রীতি টাইপের দূর্নীতি কারনে আমার মনে হয় বাংলাদেশ দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয় নাই। টাকার বিনিময়ে কাজ সেরে দেওয়া টাইপের দূর্নীতিটা একটু বেশি ভয়ংকর। মানুষ পরোক্ষ লাভের দিকে তেমন আকর্ষিত না, তবে প্রত্যেক্য লাভের দিকে অবশ্যই মোহটা বেশি।
অর্থের বিনিময়ে দূর্নীতি করাটাই বাংলাদেশের এই কলংকিত অধ্যায় তৈরি করেছে। যাই হোক দেশ এখন অবশ্য এই কলংক মুছার পথে। দেশের দূর্নীতি চীরতরে মুছে যাক এটাই আমাদের কামনা।
দেশ হিসেবে সউদি আরব দূর্নীতি মুক্ত একটি দেশ। ইসলামী দেশ হওয়ায় ইসলামের বিধি অনুযায়ী দূর্নীতিকে এরা সামাজিক ভাবে এখনো অনেক দূরে রেখেছে। কিন্তু একটু আগে যা বললাম এরা স্বজনপ্রীতি টাইপের দূর্নীতি এরা করে থাকে। এটাকে দেখলাম অনেকে দূর্নীতি মনে করে না। আপনার সাথে যদি কোন অফিসের কারো সাথে পরিচয় থাকে আপনার কাজটা আগে হয়ে যাবে। সব ক্ষেত্রেই চলে এটা। চাকরি থেকে নিয়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার সময় পর্যন্ত।
আরবরা জাতি হিসেবে এক কথায় বর্ণবাদী। যদিও ইসলাম ধর্মে বর্ণবাদের স্থান নেই, যদি তাই হতো, তাহলে হযরত বেলাল এতটা সম্মানীত হতে পারতেন না। তিনি ই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। তার পরেও এরা বর্নবাদী। এশিয়ান বা সাউথ এশিয়ান লোকদেরকে এরা মানুষ মনে করে না। পশু বা তারও নিচের কিছু মনে করে। মুখে মুখে ভাল ব্যাবহার দেখা গেলেও এদের কার্যকলাপে বর্ণবাদের প্রকাশ পায়।
সামাজিক প্রানী হিসেবে মানুষ শ্রেষ্ট হলেও এদেরকে সামাজিক বলা যায় না। এদের সমাজ বড়ই বিচিত্র। পাশের বাড়ির মালিকের নাম কি বা বড় ছেলের নাম কি তাও এরা জানে না। পাশের বাড়ির কেউ মারা গেলেও দেখতে আসেনা। বলতেও পারেনা যে এ বাড়িতে কেউ মারা গেছে। বাড়িতে কেউ মারা গেলে কান্না কাটি দূরে থাক এক সপ্তাহ যাবত সে বাড়িতে পার্টি চলে। হয়তো এটা চল্লিশা হিসেবে খাওয়ানো হয়। কেউ কারো খবর রাখেনা। পড়শির মেয়ে অনৈতিক কাজ করে চলেছে এতে কারো কোন মাথা ব্যাথা নেই। প্রশ্ন করলে বলে এটা ওর কর্ম , যে যার কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। তোমার কোন দায়িত্ব নেই তা প্রতিরোধ করার? না এটা আমার দায়ীত্ব না, পুলিশের দায়িত্ব।
চুপে চুপে অনেক খারাপ কাজ চলছে এদেশে। এমন কিছু অপরাধ আছে আমাদের যা দেশে করা সম্ভবনা কিন্তু এরা খুব সহজেই তা করে যাচ্ছে।
সউদিতে মহিলাদের জন্য বিবাহ জনিত কিছু অতিরিক্ত আইন প্রয়োগ করা আছে। যেমন কোন সউদি মহিলা অন্য কোন দেশের পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু পুরুষরা বাইরের দেশের মেয়েদের বিয়ে করতে পারবে। মেয়েরাও এ আইন ফলাও করছে। যদিও আমি কয়েকটা মহিলা দেখেছি যারা বাইরের পুরুষকে বিয়ে করেছে। তবে ওরাও আরব দেশের নাগরিক। বাইরাইন, আমিরাত, কুয়েত, মিশর, মরক্কো ইত্যাদী। এশিয়ান বা এমেরিকান কাউকে বিয়ে করতে দেখিনি।
ইসলামের জন্মভূমিতে জন্মেও এরা ইসলামের অনেকটা বাইরে। কিছু কিছু দিক ছারা এরা অনেকটাই পশ্চিমাদের অনুষরণ কারী। দাদার দেশের লোকদেরকে এরা খুবই শ্রদ্ধা করে।
একটা ঘটনা লিখে শেষ করবো: সউদি এয়ার লাইন্স এর প্রথম শ্রেনীর এক যাত্রী। তার নিজের সিটে গিয়ে বসলো। একটু পরে এয়ার হোষ্টেস এসে বললো, আপনাকে অন্য সিটে যেতে হবে। লোকটি এয়ার হোষ্টেসকে তার ট্রিকেট দেখালো। তার পরেও এয়ার হোষ্টেস বললো আপনাকে উঠতে হবে। লোকটি বললো কেন?

- এখানে আমিরের দুই মেয়ে বসবে।

- তাতে আমার কি?
- এরা দোজন এখানে বসবে।
- না আমি এখান থেকে উঠবো না।

সরাতে না পেরে সরাসরি ঐ আমিরের মেয়ে দুটি এল। বললো সিট থেকে উঠতে।

- না আমি উঠবো না।
- তোমাকে উঠতেই হবে।
- না উঠলে কি করবে?
- আমি তোমাকে দেখে নেব। জান আমি কে? অমুক আমিরের মেয়ে। আমরা দেশ চালাই। আমরা তোমাদের রিজিক দেই। আমরা তোমাদের দেখা শুনা করি। আমাদের কথা কেন শুনবে না। শেষ পর্যন্ত সে লোকটা উঠছে না দেখে মেয়েরা পাইলটের শরনাপন্ন হল। পাইলট এসে পাসপোর্ট ও টিকেট চাইলো। পাসপোর্ট দেখে পাইলট চলে গেল। কিছুই বললো না। সে লোকটি ছিল সউদি এমেরিকান।

http://www.somewhereinblog.net/blog/Nazirblog/28717801

একটি চন্দ্র বালিকার গল্প

নাদান
১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ বিকাল ৫: ৪০

নিজের ভিতর কেমন যেন এক অস্থিরতা অনুভব করছে হৃদিতা। মনে হচ্ছে ছুটে পালিয়ে যায় অনেক দূরে কোথাও যেখানে কেউ তাকে চেনেনা অথবা এমন কোথাও যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরেনা। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। শরীরটা কেমন যেন অবশ আসে। জানলাটা খুলে দিয়ে বিছানার উপড় শরীরটা এলিয়ে দেয়। কোন কিছু চিন্তা করার শক্তিও যেন আবশিষ্ট নেই। জানালা দিয়ে শীতল বাতাস এসে শরীর কে ঠান্ডা করে দিচ্ছে। যেন এক হীম মৃত্যু আস্তে আস্তে গ্রাস করছে তাকে। শুধু জীবনের সব স্বপ্ন গুলো দুচোখ বেয়ে নোনাজল হয়ে গড়িয়ে পড়ছে অঝোর ধারায়।

অথচ তার জীবনটা এমন হবার কথা ছিলো না। কত বিন্দু বিন্দু ভালবাসা দিয়ে সে সাজিয়েছিল তার স্বপ্ন গুলো। কত দীর্ঘ অপেক্ষার রাত কাটিয়েছে সে এই স্বপ্ন গুলো বুকে নিয়ে। একজন মানুষ কেমন করে পারে তার ক্রুদ্ধ হাত দিয়ে কারো হৃদপিন্ডটিকে ছিন্নভিন্ন করে তার স্বপ্ন গুলোকে কেড়ে নিয়ে যেতে!

মৃদুল তার জীবনে যখন এসেছিল হৃদিতা তখন বেণী দোলানো এক উচ্ছল কিশোরী। সারাদিন প্রজাপতি হয়ে প্রজাপতির পিছনে ছুটতো। সেই সময় মৃদুল তার জীবনে এসে হাত ধরে এক স্বপ্নের দেশে নিয়ে যায়। বর্ষার বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মত হৃদিতার পৃথিবীটা ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক অবাক করা সুখে। মনে হয় এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে তার ছোট্ট বুকে ধারন করতে পারবে সে। কিন্তু সেদিন সে, বোঝেনি, ভালবাসা যা দিয়ে যায়, নিয়ে যায় তার থেকে নিয়ে যায় অনেক বেশী। মৃদুল একদিন তার জীবনের স্বপ্নের কথাগুলো হৃদিতাকে খুলে বলে, সে জীবনে অনেক দূর যেতে চায়। জীবনে কিছু একটা হতে চায় সে। তাই উচ্চ শিক্ষার জন্য সে বিদেশে পড়ালেখা করতে যাবে। সেদিন হৃদিতা মৃদুলের হাত ধরে বলেছিল তোমার স্বপ্ন আজ আমারো স্বপ্ন। আমি বলেতো এখন কিছু নেই আমার। আমার সব কিছুই তুমি। যেখানেই যাও আমি সব সময় তোমার পাশেই থাকবো। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি যাবার সময় আসলো আসলো নিজের মনকে কিছুতেই মানাইতে পারেনা হৃদিতা। মনে হয় তার হৃদপিন্ডটা কে যেন ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবুও হৃদয়ে পাথড় চাপা দিয়ে তাকে বিদায় জানিয়ে আসার পড় মাসের পর মাস লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে পাগলি মেয়েটি।

কথা ছিল প্রতি দুই সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখে জানাবে। তখনতো এখনকারমত ই মেইল ছিল না। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এত ফোন করারো সামর্থ ছিল না। তবুও তার জন্মদিনে মায়ের দেয়া নিজের কানের দুলটুকু বিক্রি করে তার জন্য উপহার পাঠিয়েছিল সে। তার মনে হত আমার অলংকার দিয়ে কি হবে, সেইতো আমার অলংকার। তারপর আস্তে আস্তে তার চিঠির সংখ্যা কমতে থাকে। ফোন করলে বিরক্ত হয়। একদিন কেঁদেকেটে বললাম প্লিজ কি হয়েছে আমাকে বলো। আমাকে কিচ্ছু বললো না। আমি উপায় না দেখে তার বন্ধুর কাছে ফোন করে জানলাম সে টাকার জন্য ইউনিভর্সিটি ছেড়ে দিয়েছে এবং রেফিউজি হিসেবে থাকার জন্য আবেদন করেছে। এটা শুনে কত যে কেঁদেছি আমি সে শুধু আমার সৃষ্টিকর্তা জানেন। দিন যায় তার রেফিউজি মামলা চলতে থাকে। কবে ফিরতে পারবে সেটাও অনিশ্চিৎত। মনে মনে বলি আমি কিচ্ছু চাইনা শুধু তুমি ফিরে আসো তবুও তাকে বললাম আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো সারা জীবন। এমন করে কেটে যায় দশটি বছর। বাসা থেকে চাপদেয় বিয়ে দেবার জন্য। শেষে কথা বলা বন্ধ করে দেয় বাবা আমার সাথে। আমি বসে থাকি আমার মৃদুলের জন্য। একা একা তাকিয়ে থাকি চাদের দিকে।

একদিন আমাকে ডেকে ছিল চাঁদ
বলেছিল কি চাও আমার কাছে?
বলেছিলাম তাকে, যদি দেখা হয় তার সাথে

তোমার একটু আলো দিয়ে পথ দেখিও তাকে।

বলে ছিলো সে মৃদু হেসে,
সূর্যের মত ভালবাসা ঘিরে রেখেছে যারে,
আমার আলোর কি সাধ্য আছে
তার কাছে পৌছুতে পারে।

অবশেষে সে একদিন জানালো সে ফিরে আসছে। আমার অন্ধকার আকাশ ভরে উঠলো রুপালী আলোয়। আমার জান, আমার মৃদুল আমার কাছে ফিরে আসছে। আমি কি করবো ভেবে পাইনা। মনে হয় এক স্বপ্নের মধ্য আছি আমি। এতদিন পর নিজের দিকে নজর দিলাম একটু। কেমন যেন বুড়িয়ে গেছি আমি। চোখের নিচে কালি জমেছে তার জন্য রাত জেগে জেগে। সারাদিল কেটে যায় সে আসলে কি করবো না করবো এইসব ভেবে। তার আসার দিন যত কাছে আসতে থাকলো প্রতিটি মিনিট কে মনে হয় এক একটি বছর। আবশেষে যেদিন তার সাথে দেখা হলো তাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে অনেক ক্ষন কাঁদলাম আমি। মনে হলো আমার পৃথিবীকে আমার বুকের মধ্যে পেয়েছি আমি। তারপরেও মনে হলো আমার আগের মৃদুলকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি। সে শুধু বললো "এমন বুড়িয়ে গেছো কেন? নিজের দিকে খেয়াল রাখোনা?" তারপর কাজ আছে বলে তারাহুরো করে চলে গেলো। এর পর প্রয় পনেরো দিন তার কোন খোজ পাইনি। ফোন করলেও ধরে না। একদিন তার বন্ধুকে ফোন করে বললাম তুমি আমার ভাইয়ের মত, তুমি সত্যি করে বলো সে এখন কোথায়। সে বলে মৃদুল কম বয়সি এক সুন্দরি মেয়ে কে বিয়ে করে গতকাল বিদেশ চলে গেছে। আমি নাকি বুড়িয়ে গেছি। তার সোসাইটিতে আমাকে মানাবে না।
আজ তবুও দোয়া করি অনেক সুখি হোক সে। আমরা একি আকাশের নিচে আছি। একই চাঁদ আমাদের আলো দেয়। এই সান্তনা টুকু নিয়ে আমি আমার বাকি জীবনটা পার করে দিতে পারবো।

"আমরা তো জানি কত সুন্দর জিনিস আছে,
সুমেরু শিখর আছে , তুষার মৌলি হিমালয় আছে,
আমরা কি যেতে পারি?
জানি তারা আমারই আছে, তবু কি পেতে পারি?
তাই বলে সেটা ভোলা নয়,
সে আমার গোপনতম সত্তায় লগ্ন সুন্দরতম স্বপ্ন। " ---মহামতি জেবীন

http://www.somewhereinblog.net/blog/nadanblog/28771733

ভালবাসার রোদ বৃষ্টি......

পুসকি
১৩ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ দুপুর ১২:৫৭

ভালবাসার রোদ্দুর দেখেছ?
শীতের সকালের মিঠে রোদের মত....
এক অদ্ভুত উষ্ণতায় ভরে রাখে যেন
দুজনার অনুভূতি যত। ।

ভালবাসার বৃষ্টি দেখেছ?
মেঘলা বিকেলের যত শীতলতা,
সব ছাপিয়ে শ্রাবনের সন্ধ্যা এসে
ধুয়ে নিয়ে যায়
যত মান অভিমান,
তোমার আমার সব মলিনতা। ।

ভালবাসার কালবোশেখী দেখনি?
বাস্তবতার ভয়াল থাবায়,
তোমার আমার যত স্বপ্ন যত সুখ
সব দুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষ করে দিতে চায়,
আমাদের নিয়ে ফেলতে চায়
নরকের কোন অন্ধকার গুহায়। ।

ভালবাসার বসন্ত তো দেখেছ?
কোকিলার গান আর আমের মুকুলের ঘ্রাণে
নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখায়
নতুন করে ভালবাসতে শেখায়। ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/puskiblog/28769987

মাতাল রাতের মত আমি বিস্মিত হই-----

রুবেল শাহ
২০ শে মার্চ, ২০০৮ রাত ১০:৫৫

আবেগ দিয়ে লেখার জন্য আমি নই
আমার লেখা কারো ভাল লাগে জেনে
আমি অবাক হই--------
বির্বণ কিছু বর্নকে টেনে এনে
শব্দ বানাই এইতো
এতে ভাল লাগার হিসেব খুঁজে পাই
কই-------

শরৎ এর আকাশ জুড়ে ছোপ ছোপ
সাদা মেঘের আনা ঘোনা --- আমি ছুঁতে
পারি কই

হেমন্তের শেষে ঝরা পাতার শব্দের
কোন সুর আমি বাঁধতে পারিনা---
আঁকতে পারিনা প্রিয় কোন

মুখবয়------

তবুও কেন তোমাদের ভাল লাগে
এই সাতকাহণ -----

মাতাল রাতের মত আমি
বিস্মিত হই
রাত কত মাতাল হলে এতই নিথর হতে পারে
তার বুকে সহস্র নক্ষত্র উল্লাসে মেতে উঠতে পারে---
চাঁদ তার জ্যোতি বিলাতে মোটেও কৃপণতা করতে পারে না-----

আমি হতবাক---- তোমাদের ভাল লাগা দেখে

(আমার এই লেখাটা তাদের সাবর জন্য যারা আমাকে বরাবরই উৎসাহ দিচ্ছেন আমার বাজে কিছু লেখা পড়ে)
http://www.somewhereinblog.net/blog/robellblog/28780973

ভালোবাসার সংজ্ঞা খুঁজি!

দেবদারু
০৯ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ২: ০৩

সপ্তপদী স্বপ্নেরা ভিড় করে
মন- জানালা জুড়ে,
দু'চোখে জাগে তাই
রঙধনু আলোড়ন;
প্রিয় হয়ে ওঠে
মুক্ত বিহঙ্গেরা,
কি যে ভালো লাগে
পুষ্পের হোলি খেলা!
অরণ্য বাড়ায় হাত,
আকাশেরও হাতছানি-
সমুদ্র ভাসিয়ে দেয়
অনুভবে জলরাশি।
যতই আবেগী হই,
উচ্ছ্বাসে যত হাসি,
স্বেচ্ছায় ভুলে থাকি-
সবকিছু বানোয়াট,
সাজানো, সর্বনাশী!

রমণীর কমনীয় অবয়ব নাড়া দেয়-
প্রেমের প্লাবন ডাকে-
প্রতিক্ষণে শিহরণ,
ব্যাকুলতা অকারণ,
অবাক বিস্ময়ে
খুঁজে পাই আমাতে
নতুন এক আমাকে!

প্রেমিক মন বোঝে না কিছুতেই!
প্রণয়- আকর্ষণ. .
সে তো মোহের- ই দর্পন,
মগজের কোষে কোষে
হরমনে সয়লাব;
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
ঈশ্বর সেঁটে দেন
প্রেমের মোড়কে ঢাকা
জৈবিক প্রহসন!

দু'দিন গড়ালে 'পরে,
ভালোলাগা উবে যায়-
সবই একঘেঁয়ে লাগে,
নেশার জগতে বুঝি
ঘোর অমানিশা!
তবু তাকে তবে কেন বলি ভালোবাসা?

http://www.somewhereinblog.net/blog/debdarublog/28768426

চল স্বপ্ন উড়াই

নিবেদীতা
১৪ ই ডিসেম্বর, ২০০৭ রাত ১: ১৫

জোছনার জানালা খুলে,
এ হাত তোমার হাতে বন্দী করে,
ঢেউয়ের পথে চল যাই একান্তে।
বাতাসে উড়িয়ে দাও তারাদের ঘুড়ি,
নিঃশাসে জড়িয়ে নাও ভালবাসা যত,
জীবনের এ প্রান্ত হতে শেষ প্রান্তে।
গেল প্রহর সন্চয়ে রেখে,
জাগতিক সুখ গুলো দেখ
চার হাতে রেখেছি ধরে
নতুন এই প্রত্যুষে. .
http://www.somewhereinblog.net/blog/parthibblog/28751431

এসো

আশ্রাফ
০৯ ই নভেম্বর, ২০০৭ সকাল ১০: ৫৭

সূচনা, এসো আজ আলাপন হোক তোমার- আমার
আকাশের এ নীল শামিয়ানার নিচে, দুর্বার কোলে
আমাদের শরীর রেখে।
আমরা আজ ঘাসফুলের সাথে চড়ুঁইভাতি খেলব
সোঁদা মাটির গন্ধ নিয়ে;
ফড়িং আমাদের সঙ্গী হবে।

হাওয়ায় উঁড়ুক তোমার সবুজ শাড়ী, কৃষ্ণ কুন্তল;
আমি তোমার গ্রীবার তিলে স্পর্শি করতল. .
জানি পৃথিবীতে ঢের সুখের জিনিস আছে তোমার ঐ
কোল থেকে।
তবুও আমি মাথা রেখে মুদব নয়ন; কতদিন রাখিনি।
তোমার ও কি স্বাদ জাগে না?

http://www.somewhereinblog.net/blog/ashrafoviblog/28743922

অচিন- তনু ও দেবতা বিষয়ক জটিলতা/ গল্প

মাজুল হাসান
১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ১১: ৩৯

বলা হচ্ছে না, কিন্তু ঠিকই ভাবছি মনে মনে—যদি তনু আত্মহত্যা করতো আর ছেড়ে যেতো চিরকুট—'অচিনের কারণেই. . . দেখলাম, পারলাম না বোঝাতে; তাই চলে গেলাম'; তবে অচিন, মানে এই আমি যে কষ্ট পেতাম না তা কিন্তু নয়। তবু মনে হচ্ছে তেমনটা হলে ভালোই হতো।
জটিলতা! জটিলতা তৈরী করেছে দেবতারা, মানে দেবরা অথবা তনু নিজেই। মাঝে মাঝে তনুকে মনে হয় শৈল্য চিকিৎষক।

দোষ নিও না, নিও না । ক্ষম, ক্ষম অপরাধ. . . দয়াল, ক্ষম অপরাধ। অ- প- রা- ধ অদ্ভুত তার রোগী দেখার ধরণ। দুদিন পূজো না দিলেই মন খারাপ করে। আর তৃতীয় দিন তার বেদিতে চলে আসে ভিন্ন পূজারী। নতুন কাটাছেড়ায় মন দেয় তনু। ঠিক করি আর নয়, ঢের হয়েছে। তবু একটা কাগজের প্লেন পাঠাই। তারপরই ডাক আসে, অথবা আসে তার আগেই. . . ঠিক মনে করতে পারি না। এই যে বলছি আমার নাম অচিন, এটাও জেনেছি তনুর কাছ থেকেই। অনেক কিছুই মনে করতে পারি না, ঠিক কি তাও জানি না। তবু, বেঙ্গমা- বেঙ্গমী মনে আছে। মনে হয়, 'শিপু দেয়া গরু' দিয়ে আমার জমির ধান খাইয়ে যায় কেউ। চালাক কিষাণ সেই ধানেই পিঠা গড়ে খায়. . . মনে হয়। পিঠার গন্ধ পাই বাতাসে; প্রতারণা!

তবু তনু আমার হাত- পা, চোখ- নাক, লিঙ্গ আলাদা করে পাট- বাই- পাট খুলে দেখায়—এই যে দেখো 'ওমুক জিনিসটা' মিসিং! তখন আমার মনে হয়— আরে, তাই তো। কিন্তু ওমুক জিনিসটা কি একটু পরে তা মনে করতে পারি না। তখনই আমি ওপোজ করি
—এই যে হাত- পা। টি- টি টিয়ে পাখির ঠোঁট. . . আকডুম- বাকডুম। এই যে চোখহীন লিঙ্গ, অন্ধ হলেও চিনবে তোমাকে ঠিক ঠিক।
তনু তবু বলে
—না না, সামথিং ইজ মিসিং। সামথিং ইজ রং। তুমি নরমাল না। ট্রাই টু বি নরমাল।
বলেই সুই- সুতো দিয়ে কাটাফাঁড়া শেলাইয়ে মন দেয় তনু। আমি আহ্ আহ্ করে উঠি। ব্যাথায় নয়, মনে হয়, ও খুব বেশি প্রফেশনাল।

মাঝে মাঝে আমি বিভ্রমে পড়ি। জল ছুয়ে পাই আগুনের আঁচ। বিভ্রম বাড়ে যখন তনু বলে,
—পৃথিবী দেখলাম, কিন্তু তোর মতো কেউ বলে নি, আমি তোর সাথে বুড়াকাল পর্যন্ত থাকতে চাই।
তখন মনে হয় এইতো খুকিটিকে খুঁজছিলাম, মনে করতে পারছিলাম না। ভুলে গেছিলাম বেমালুম।
বিভ্রমের মাত্রা আরো বাড়ে একটু পরেই। তনু বলে
—ওতো উড়িশ কোনো? পৃথিবীটা বড়ো শক্ত।
আমি ধপাশ করে মাটিতে ক্র্যাশল্যান্ড করি। আর দেবতারা হাসে আট্টহাসি। হাসির অপমানে আমি ব্যথা ভুলে যাই।
বান্ধবী আশার কথা তুলে তনু বলে
—আশার সাথে দেখা, বললো, ওর হাজবেন্ড ভার্সিটির টিচার, মানে এটাও বলার মতো একটা জিনিশ হলো আর কি!
আমি দাঁতের প্লাগ তুলতে তুলতে বলি
—তোর কি ইন্টেলেকচুয়াল বয়ফ্রেন্ড লাগবে নাকি?
—সে তো জানা কথা, আগেই বলেছি। তুই তেমন না বলে প্রথম দিকে আমার. . . ঠিক মানতে পারতাম না।
—তুই যা। তনু তুমি যাও। আমি ফাঁকা কাশরুমে ব্লাকবোর্ডে আঁকি- বুকি খেলবো। বাহ্! চকের গুড়ো কেমন কেঁদে কেঁদে ঝরে! যে নারী জলপোকাদের দেখে আলগা করে বুকের কাচুলী, দাড়কিনি মাছ হয়ে

উঠে যায় মাছরাঙাদের ঠোটে. . . যাও না. . . জলপোকা, মাছরাঙা, নীলে- হলদে কচুরী ফুলে. . . আমি বিছিয়ে রেখেছি জলের রাস্তা। ওই যে রাখাল, যে আদতে জমিদারপুত্র। সবার তেষ্টা মেটাতে শুকনো দীঘিতে যে দিয়েছিলো আত্মাহুতি. . . সেই আমি। আচ্ছা আমি কি তনুর মন গলানোর চেষ্টা করছি, ওর ওপর হেজিমনী ক্রিয়েট করার চেষ্টা চালাচ্ছি? —ভাবি।

বিষয়গুলো এতো জটিল হতো না (আসলেই কি তা?)

বিষয়গুলো এতো জটিল হতো না (আসলেই কি তা?) যদি না তনুর একাধিক প্রেমিক থাকতো। ছিল আমারও। তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। এক ঋনী আর তৃণার সময়টা ছাড়া। ওসব আজ কেমন যেন ভেক মনে হয়। যদিও আজকের পৃথিবী দেখবার তাগিদটা এসেছিল ঋনীর কাছ থেকেই।

তনু অবলীলায় তার সব প্রেমিকের কথা বলে। বলে—ওসব থেকে সরে এসেছে। দূরে গিয়ে সে চিনেছে আমাকে, অচিনকে। তারপরেই সে দেবের কথা বলে। বলে, দেবকে সে ভীষণ ভয় পায়। আমার অসহায়ত্ব বাড়ে। এই যে ছুরি হাতে সাক্ষাত দেবী আমার, ছুরি- কাচি চালিয়ে নিমিষেই কেটে- - জোড়া দিতে পারে আমায়, সে কি করে ভয় পায় অন্যকে? তবে আমার কি হবে? কাউকে দেবীর আসনে বসানো আদতে তার বিরুদ্ধে এক সুদূর ষড়যন্ত্র। কবে শিখলাম এমন বাকবন্দী খেলা? না না ওই আসন তনুরই। ওখান থেকে নামালে তার যে অবশিষ্ঠ থাকে না আর কিছুই!

<u>বিকলাঙ্গ জীবন ভেট নেবার উদারতা দেখাতে পারে কে? কে- হে?!</u>

আজকাল আমি ভীষণ সন্দেহ করতে শুরু করেছি। ভাবি, দেব আবির্ভাবে তনু তাকে কি ভেট দেয়? ওই যে তনুর কথাতে ধুলো পড়া সেল্ফে ফেলে রেখেছি দেব- বাক্যের স্তুপ, ওতে যে দেবতার লুচ্চোমির ভরপুর কাহিনী। তবু তাদের জন্যই গোপিনী সমেত কাঁদেন রাঁধা। উমফোটা লাগে। হাত ছুঁই, গুনে দেখি পায়ের আঙুল, শিশ্নর তাকত পরীক্ষা করি। নিজেকে বিকলাঙ্গ মনে হয়, আর মনে হয় আমার নাম অচিন নয়। দেখা পেলেও, আসলে তনুকেই আমি চিনি না। আমার সন্দেহের মাত্রা এতোটাই বেড়েছে যে, আমার ধারণা, এই বিকলাঙ্গ জীবন ভেট হিসেবে নেবার উদারতাটুকুও দেখাবে না সে। আর যদি তেমনটি ঘটেও, তবে আমার আর তনুর মাঝে দেবতারা অসংখ্য কোলবালিশ হয়ে ঢুকে পড়বে। ওদের বাজার থেকে ধরে আনবে স্বয়ং তনু। মেঝেতে কোলবালিশ, বিছানায় কোলবালিশ, ওয়ারড্রোপে কোলবালিশ, কিচেনে কোলবালিশ। কোলবালিশের জ্বালায় আমাদের একমাত্র মেয়ে মৃত্তিকার জন্মতীথি থেকে যাবে অলিখিত।

মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে। কে বলে বিকলাঙ্গ? বাজারে দুকেজি মাংস বেচে এলে কম পড়বে নাকি? কখনো লিঙ্গ হাতে ডাইনীদের কাছে যেতে থাকি। ফিরি মাঝপথে। পথে তখন সারি সারি কান্ত ট্রাম। উঁচু দালানগুলো এক চিলতে ফাঁক দেয় আকাশ দেখার। সেখান থেকেই আসে অদ্ভুত এক আলো। সত্যি বলছি, ওই আলোটাই আমার বড় শত্রু। কেমন ভুলা ধরা লাগে। ওই আলোর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, মাটির মূর্তিতে পূজো দিলে একদিন তাতেও সঞ্চারিত হবে প্রাণ। তখন নিজেকে দেখি দেবতাদের উপরে এক কুমার হিসেবে। কাদামাটির মিহি পরশে ভরে ওঠে আমার হাত। মাছরাঙা হতে আমার বড় বাঁধে। কিন্তু কি করে আমার ঠোঁটে এলো আঁশটে গন্ধ? ক্ষরণে- ক্ষরণে বাড়ে উচ্চতা, রক্ত- পুঁচ গিলি, অভিনবত্বের স্বাদ কোথায়? জল ছুঁয়ে দেখি চলে গেছে হিম- যুগে। তাতে জীবন চলে ঠিকই, তেষ্টা মেটে না। রাতকে বলি, আফিম চাষে মনোযোগী হও। মহুয়ায় নেশা ধরে না, যেনো ষড়যন্ত্র এক্স মেঘের সাথে দৃষ্টির সেক্স হয়, সঙ্গম হয় না।

অপমান ধুতে নেমে আসে বৃষ্টি। তাতে আমি আর তনু হাত ধরাধরি ভিজি, কাকভেজা। আমাকে অবাক করে কোকিলের মতো মাঝে মাঝে সত্যিই মন খারাপের সুর ভোর- রাতটাকে বিভ্রমে ফেলে দেয়। বলে
—অচিন, তুমি থাকবে না। হয়তো পারবে না। রাগ করে পালিয়ে যাবে দুদিন পরে পরেই। আর আমি তোমায় ধরে- বেঁধে আনবো।
তখন ফ্রক পরা একটা কাঠবিড়ালীকে সকালটাকে নিয়ে উঠোনে খেলা করতে দেখি। সোজাসুজি তনুর চোখের দিকে তাকানোর অধিকার বা সাহস দুটোই ফিরে পাই। কিন্তু তখনই দেবের কথা মনে পড়ে

আমার। প্রসঙ্গ তুলি। “বেলা করা ঘুমে কেমন ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে তার চোখ। হিংসেরা জ্বলে উনুন ছাড়াই। হিংসেটাকে, এখন আমি দাবি করি, নিয়ে গেছি এবাদতের পর্যায়ে। তাতে একটা জ্যোতিষ্ক গড়ে দেয়া যায়। যখন-তখন একটা ধুতরা ফুলের মালা। একটা জ্বলুনী-নদী কুলকুল ধ্বনি ছাড়াই অনেক দূর গড়াতে পারে। নদীতে বয়ে যাচ্ছে, কে সে? পাথর।

ক্ষমা করো। আমার ইচ্ছে নয়; তবে তাই হোক—তোমার ইচ্ছে!

নীরা ও নীরার পাশে তিনটি ছায়া/ আমি ধনুকে তীর জুড়েছি, ছায়া তবু এতো বেহায়া/ পাশ ছাড়ে না/ এবার ছিলা সমুদ্যত, হানবো তীর ঝড়ের মতো/ নীরা দু হাত তুলে বললো, মা নিষাদ! / ওরা আমার বিষম চেনা. . .

মুহূর্তে অচেনা বনে যাই আমি। আমি এখন সুনীল পড়ছি। না-না গান শুনছি। ঠিক গান নয় একটা হিক্কার পর আরেকটা হিক্কা জন্মাতে দেখছি। তবু স্বান্তনা হানে না লালনের বৈরাগ্য কুটির; আমি জ্বলি, আর কয়লা হাসে কমলা সুন্দরী হয়ে। তনু আরো সুন্দরী হয়ে ওঠে। লালের মাত্রা বাড়ে-কমে; ধিকিধিকি। আমি অনিশ্চয়তায় দুলি হাপড়ের মতো। বলি-
—আমায় মিথ্যে বলার দরকার নেই, চালাকিও না।
—হ্যা, আজ দেবের সাথে দেখা; কাকতালিয়। বললো-বাড়ি পৌছে দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলো
—একথা আমায় বলা কেনো?
আমার চোখে তখন উদাম দুপুর। একটা চকচকে রিকশায়- আমি আর তনু। তনু আদুরে ভঙ্গিতে গাল বাড়িয়ে দেয়। নিশ্চিত চুমু আঁকার আহ্বাণ। এতো লোক! আমার বিড়ম্বিত লাগে। দুঃখ পেলেও মজা পায় তনু। রিকশা দুলে গাতা’য় হোচট খেয়ে কেঁপে উঠি।
—মা-রা গিয়ে, আমায় বলা কেনো?
—তোর মন খারাপ হয়ে গেলো না? তনুর কণ্ঠে নির্লিপ্ত আন্তরিকতা দেখে বলি-
—যা করিস্ কর্, ঠকাস্ না নিজেকে।
—তোর কি মনে হয়, দেবকে আমি খুব মিস করি? পরক্ষণে উতলা, ফেন-ছলকানো কণ্ঠে তনু শুধায়। কণ্ঠে ভুলকি দেয় ব্যাকুল-শুশুক। বলে -
—আমার সাথে থাকবি তো?
কি বলি? আমার তখন “কি যেন মিসিং, কি যেন মিসিং“ অবস্থা। বলতে পারি না। তবু কে যেন কথা বলে; সে আমি নই। নই কি?
—নিয়তি লেখা হয়ে গেছে। বড় ঘটনা নয়, জীবনকে নাচার করে যায় ছোট-ছোট ঘটনা।
—দেখিস্ আমি তোকে অনেক ভালো রাখবো, অনেক ভালো। তোকে বাচ্চার মতো মনে হয়। দেখিস্ আগলে-আগলে রাখবো।
মেঘ ঘন হয়। বলে চলে তনু; একনাগারে।
—আমি খুব খারাপ না?
আমার বিভ্রম বাড়ে।
প্রভু! প্রভু, মা করো, আমার ইচ্ছে নয়। তবে তাই হোক তোমার ইচ্ছে । এই কি চেয়েছিলাম? প্রভু! প্রভু, ক্ষমা করো, আমার ইচ্ছে নয়। তবে তাই হোক তোমার ইচ্ছে।
কতগুলো সুবিবেচক সিদ্ধান্ত চাই নি। চেয়েছি তোলপাড় নিয়ে, তোলপাড় হতে হতে আসবে তনু, মানচিত্রের হাজারো পথ ফেলে কেবল আমার এঁদো-গলিতেই। মনে হয় তনু এসেছে এবার। তোলপাড় পাই কণ্ঠে
—আদর করে দাও!

আদর করি। ঠিক তা না, চুলে বিলি কাটি। ওরা লকলক করে বাড়ে। পরণেই মন খারাপ করে আমার। কি যেন খুঁজে তনু! কি খোঁজে? তার হাবভাব দেখে মনে হয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি নই। আমার আদর যেন আদর নয়; ছোওয়াগুলো যেন যন্ত্রণা। তাই দিয়ে জ্বলে-পুড়ে দুধে-ঘোলে কি যেন খুঁজছে তনু। কার ওপর শোধ নাও তনু? কার তরে নাও? শোনো ত-নু. . . নু, আমি কোনো দেবতা

নই। কারো ওপর প্রতিশোধ নেবার ধনুকও নই আমি। তোমার শরীর থেকে আমার হাতে উঠে আসছে চাপ-চাপ অপমান। কোথায় সোঁদা গন্ধ, মাটির আঁশ? পুতুল গড়ার কুমোর কৈ তুমি? আমি দানব বনে যাচ্ছি। কে নেবে এ জীবন? কেড়ে নেবার রাত নেমেছে ধরা’য়! প্রতিশোধ নাকি অতৃপ্তি, নাকি ভিন্নতর কোনো বোধ. . . তনু! তনু! তাড়িয়ে বেড়ায় তনুকে? তবু কেমন কাঙাল মনে হয়।

কাঙালের মতো তনুকে দেখে মায়া করে খুব। তবু আমার ঈর্ষা করে। নিজেকে শাসাই- কেনো বাবা, নিজে কেনো উঠতে পারো না গণিত থেকে? এতো খাই-খাই কেনো তোমার? তখন আমার মনে হয়, আসলেই আমার নাম অচিন। কেউ একজন সুবিধাজনক একটা সম্পর্ক চাইতেই পারে। ভালোবাসো তো তাকে? তবে হাঁটো নির্দ্বিধায়, সঙ্গী হও।
কিন্তু বিপত্তি ঘটলো কাল। তনু বললো”তোর মধ্যে একটা অভিমানী কিশোর আছে। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখবো মরা শালিকের মতো নিথর হয়ে পড়ে আছিস। আত্মহত্যাকেও হত্যা করছিস্ তুই! ”
আমি আঁতকে উঠি। আমার মতো সেও কি চায় কোনো একজন আত্মঘাতী হোক তার নাম ধরে? চিরকুট ছেড়ে গিয়ে, রেখে যাক চরম প্রমাণ। তাহলে তনুরও তো আমার মতো অবস্থা। সেও তো নেই সুবিধাজনক অবস্থায়। সুবিধাগুলো তাহলে ভোগ করছে কে? কারা?

সেই থেকে বিভ্রম বাড়ছে। উঠছে কম্পণ। একটা পয়জনের শিশি কেঁপে কেঁপে গড়াতে লেগেছে টিটকারীর মতো। ঘুরতে লেগেছে ঘরময়- ঘ-ড়-ৎ. . . ঘ-ড়-ৎ! বিভ্রমই পড়ে যাচ্ছে বিভ্রমে। এখন ভাববার দায়িত্ব আপাতত আপনাদের। হ্যা, আপনি, বলছি আপনাকেই;
দশটা-পাঁচটা অফিস যাচ্ছেন তো?

http://www.somewhereinblog.net/blog/majulhassanblog/28771804

কার চোখেতে?

সাতিয়া মুনতাহা নিশা
০৪ ঠা নভেম্বর, ২০০৭ দুপুর ২: ০৫

মন জানে না এখন আমি
কার চোখেতে আকাশ দেখি?
কার চোখেতে মন হারিয়ে
রংধনু রং ছবি আঁকি?
কার চোখেতে লুকাই আমার
গোপন প্রেমের জল?
কার চোখেতে নদী হয়ে
বইছি ছলোছল. . . . . ?

মন জানে না এখন আমি
কার চোখেতে ভালোবাসি?
কার চোখেরই মন- আবেগে
তার চোখেতেই ফিরে আসি?

কার চোখেতে যায় শুকিয়ে
অভিমানী জল?
কার চোখেতে নদী হয়ে
বইছি ছলোছল. . . . . ?

কার চোখেতে বৃষ্টি হয়ে
ঝরছি টাপুর- টুপুর,
কার চোখেতে রাত্রি আমি
সূর্য- মাখা দুপুর?
কার চোখেতে গান গেয়ে যায়
মেঘবালিকার দল?
কার চোখেতে নদী হয়ে
বইছি ছলোছল. . . . . ?

http://www.somewhereinblog.net/blog/nisha1313blog/28742565

সিগারেট তুমি গ্রেইট

রুদ্র আনোয়ার
২৬ শে জানুয়ারি, ২০০৮ দুপুর ২: ২৪

প্রতি নিঃশ্বাস বিষাক্ত বান
তোমার তরেই আকুল এ প্রান
বুকের জমা কষ্ট সকল
তোমাকেই পায় ঠাঁই

ধোয়ায় ধোয়ায় কষ্ট পোড়াই
ধোয়ায় ধোয়ায় কষ্ট ওড়াই

আমার সঙ্গী প্রতিদিন
তোমার দেহের নিকোটিন
আমার মনের প্রফুল্লতায়
তোমার দেহ ছাই

ধোয়ায় ধোয়ায় কষ্ট পোড়াই
ধোয়ায় ধোয়ায় কষ্ট ওড়াই

তোমার দেহের সাদা বরণ
গ্রহন করে আমার মরণ
এই জীবনের আয়ু রেখা
তোমায় সপেছি তাই

ধোয়ায় ধোয়ায় কষ্ট পোড়াই
ধোয়ায় ধোয়ায় কষ্ট ওড়াই

সংবিধিবদ্ধ সর্তকীকরণঃ ধুমপান স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর

আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট

সু- শান্ত
২৩ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ রাত ১: ১৩

অনেক দিন ধরে চিন্তা করছি আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট সমূহগুলো সাদাকাগজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করবো। আজকাল এতো বেশি আবজাব কাজে ব্যস্ত থাকি যে আসল কাজগুলোই করা হয়ে উঠে না। আজকে চেষ্টা করে দেখি সবগুলো টার্নিং পয়েন্ট একাধারে টানতে পারি কিনা।

আমার জন্মদিন- আমি মনে করি এটা আমার জীবনের প্রথম টার্নিং পয়েন্ট। আমি তো এই দুনিয়াতে নাও আসতে পারতাম। কাজেই এইদিন থেকেই আমার টার্নিং পয়েন্ট এর শুরু।

আমার বয়স যখন দুই- খুব ছোটবেলায় আমার নাভীর ঠিক উপরে কি জানি একটা বিষফোঁড়ার মতো হয়েছিল। আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম। বাবা থাকতেন হবিগঞ্জে চাকুরির কাজে, মা আমাদেরকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। গ্রামের বাড়িতে গ্রাম্য ডাক্তারী একমাত্র ভরসা, সেই গ্রাম্য ডাক্তার ওস্তাদী ফলাইতে গিয়ে আমারে মেরেই ফেলেছিল। বাবা খবর পেয়ে চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে মৃতপ্রায় আমাকে হবিগঞ্জে নিয়ে আসেন । সেই যাত্রায় বেঁচে যাই। মা'এর কাছে আমার সেইসময়টার যে করুন অবস্থা শুনেছি, তাতে ঐ সময়টা কে ও একটা টার্নিং পয়েন্ট মনে করি আমি।

এরপর ইনিংস ভালোই চলেছে, একেবারে এস, এস, সি এর আগে কোন টার্নিং পয়েন্ট নাই। এস, এস, সি আমি মাত্র ৫ মার্কের জন্য বোর্ড স্ট্যান্ড করতে পারি নাই। আমাকে বাসা থেকে বলা হয়েছিল আমি যদি বোর্ড স্ট্যান্ড করতে পারি তবে আমাকে ঢাকা কলেজ অথবা নটরড্যাম কলেজে পাঠানো হবে। যেহেতু বোর্ড স্ট্যান্ড করতে পারি নাই আমাকে হবিগঞ্জে লোকাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। আমি মনে করি **এস, এস, সি টা আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট।** যদি আমি বোর্ড স্ট্যান্ড করতে পারতাম আমি হয়তো ঢাকা কলেজ অথবা নটরড্যাম কলেজে পড়তাম। আমি হয়তো ঢাকার বাতাসে নষ্ট হয়ে যেতাম নয়তো খুব ভালো রেসাল্ট করতাম। জানি না কি হতো আসলে। কাজেই আমার জীবনের এটা একটা অনেক বড়ো টার্নিং পয়েন্ট।

আবার এইস, এস, সি। আরেক টার্নিং পয়েন্ট। ছোট বেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। ভর্তি পরীক্ষা দিলাম বুয়েটে, চান্স পেলাম মেটালার্জি তে। বুয়েটের তখনকার সময়ে পঁচা সাজেক্ট। কাজেই কেউ রাজী হলো না বাসার, বলে যে মেটালার্জি থেকে পাশ করে কোন জব নাই। কাজেই আমার বুয়েটে পড়া হলো না। পড়ে ভর্তি হলাম শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। আমি মনে করে আমি যদি **বুয়েটে ভালো সাজেক্টে চান্স** পেতাম হয়তো সেখানেই পড়তাম। কাজেই আমার জীবনের আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট।

শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে টানা তিন সেমিস্টারে খুব ভালো রেসাল্ট করলাম, নিজেকে মনে হচ্ছিল শাহজালাল ইউনিভার্সিটি র ভবিষ্যতের টিচার। কিন্তু আমি যখন চতুর্থ সেমিস্টারে তখন **ইউসুফ স্যার** নামে একজন আমাদের বিভাগের হেড টিচার হয়ে আসলেন। এই স্যার ছিলেন চরম সাম্প্রদায়িক, হিন্দু দেখতে পারতো না। কাজেই আমার ভালো রেসাল্টে হেঁচকা টান পড়লো। চতুর্থ সেমিস্টারে ফলাফল আসে জিপিএ ৩. ১৬। মন মেজাজ কেমন জানি নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের বিভাগে যদি এই ইউসুফ স্যার না আসতো আমি হয়তো ভালো রেসাল্ট করে ভার্সিটিতে টিচার হিসেবেই থাকতাম। আমি এখনো এই ইউসুফ স্যারকে আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসেবেই মনে করি।

পঞ্চম সেমিস্টারের কোন এক দিন আমি হলে ভাত খেয়ে বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পানি খাচ্ছিলাম। এমন সময় এক শিবির ক্যাডার আমাকে এসে বলে, এই তুই দাঁড়িয়ে পানি খাচ্ছিস কেন? জানিস না ইসলামে দাঁড়িয়ে পানি খাওয়া নিষেদ?

ভাই, আমি তো হিন্দু - একথা বলা মাত্রই ঐ ক্যাডার আমাকে এক থাপ্পড় মারে। আমি নিশ্চুপ চলে আসি মেসে। ব্যাপারটা তেমন কেউ দেখেনি, কাজেই নিরবে হজম করে নিলাম। পরে আমার মধ্যে একটা জেদ চলে আসে। দেখলাম ক্যাম্পাসে পলিটিক্স না করলে এই চড়ের জবাব দেওয়া যাবে না। পরে শাহজালাল ইউনিভার্সিটি র সবচেয়ে মেধাবী প্লাস ভয়ংকর ক্যাডারের শিষ্য হলাম। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই চড়ের চরম প্রতিশোধ ও নিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই আমি নিজেও হয়তো ক্যাডার হয়ে গেছি। আমার **জীবনে এই চড় ও একটা টার্নিং পয়েন্ট**। আমি ঐ চড় না খেলে হয়তো পলিটিক্সে জড়াতাম না, হয়তো অন্য রকম হতে পারতো আমার জীবন।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমার সংগঠনের টপ লেভেলে চলে গিয়েছিলাম। নিজেকে ভি, পি ইলেক্সনের জন্য প্রস্তুত করছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে সিলেট বিভাগে সব রাজনৈতিক দল মিলে শিক্ষা প্রতিষ্টানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিল। আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ও শেষ হয়ে গেল। যদি ঐ সময় **শিক্ষা প্রতিষ্টানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ** না করতো আমি নিশ্চিত ভাবেই ইলেক্সন করতাম । হয়তো পাশ ও করতাম। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্টানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়াটা আমার জীবনের আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট ।

সেই অবস্থা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোটামোটি ভালো রেসাল্ট নিয়েই বের হলাম। পাশ করা মাত্রই আধা-সরকারী চাকুরি পেলাম। তারপর আবার এক টার্নিং পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে **আমার বিয়ে**। আমার প্রেমিকাই আমার বঁধুও বটে। এক সময় মনে হচ্ছিল ও কে মনে হয় বিয়ে করতে পারবো না। পরে সফল হলাম। আমি যদি ও কে বিয়ে না করতাম হয়তো আমার জীবন অন্যরকম হয়ে যেতে পারতো। এটা ও আমার জীবনের অন্যতম প্রধান টার্নিং পয়েন্ট।

জীবন চলতে থাকে টার্নিং পয়েন্ট ছাড়া। এর মধ্যে **তিনবার বিসিএস** এর ভাইভা দিলাম। জানি না কেন বাদ পড়েছি। হয়তো ইউসুফ স্যারের মতো কেউ আমার ভাইভা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিল। তিন বার ভাইভা দিয়েও বিসিএস এ এলাউড না হওয়াও আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।

চাকুরী রিলেটেড আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট আছে আমার জীবনের। তিনবার বিসিএস এর ভাইভা দিয়েও চাকুরী না হওয়ার পর **এল, জি, ই, ডে** ভাইভা দিলাম। এবার খুব খালি হাতে না। বাড়ি হতে জমি বিক্রয় করে পুরো চার লাখ টাকা ঘুষ ভাইভার আগের দিন দিলাম একজন কে। কিন্তু তারপর ও সেই একই কারনে টাকা দেওয়া সত্বেও ফাইনাল লিস্ট থেকে আমার নাম কেঁটে দেওয়া হলো। সেই চাকুরি টা মিসিং ও আমার জীবনের আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট। এর মধ্যে বলে রাখি এই চার লাখ টাকার মধ্যে এক লাখ সত্তর হাজার টাকা ফেরত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এরপর মনে হলো , ধুর শালা দেশেই থাকবো না। অফিস থেকে শিক্ষা ছুটি নিলাম। ভিসা পেলাম , চলে এলাম ইউকে তে। আমার লাস্ট টার্নিং পয়েন্ট হলো **ইউকে এর ভিসা পাওয়া**। ভিসা না পেলে কি হতো কে জানে!

একটা টার্নিং পয়েন্ট মিস করেছিলাম। রাগিব সেটা ধরিয়ে দিল। আমার প্রথম বাবা হওয়া ও একটা টার্নিং পয়েন্ট । সাত মাস হয়েছে আমার মেয়ের বয়স। ও' কে খুব বড়ো সাংবাদিক বানানোর ইচ্ছে।

পরবর্তী টার্নিং পয়েন্ট কি আসবে কে জানে!

http://www.somewhereinblog.net/blog/sushantablog/28773171

গি দ্য মোপাসাঁ' র গল্প - ' বেচাকেনা'

মোসতাকিম রাহী
২৩ শে জুলাই, ২০০৭ রাত ২: ০০

(মোপাসাঁ' র A Sale গল্পের বাংলা রূপান্তর এটি। প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক ' সমকাল' এর সাহিত্যসাময়িকী ' কালের খেয়া' তে)

মিসেস ক্রমেঁকে পানিতে চুবিয়ে মারতে চাওয়ার অপরাধে গ্রেফতারকৃত দুই আসামি - সিসেয়ার ইজাডোর ক্রমেঁ এবং প্রসপার নেপোলিয়ন কর্নুকে ফৌজদারি আদালতে হাজির করা হয়েছে বিচারের উদ্দেশে। মিসেস ক্রমেঁ অভিযুক্ত সিসেয়ার ক্রমেঁর স্ত্রী।

ক্রমেঁ এবং কর্নু - দরিদ্র দুই গ্রাম্য কৃষক - পাশাপাশি বসে অপেক্ষা করছে আদালতের পুরনো বেঞ্চে। প্রথমজন বেটেঁখাটো, মোটা, হাত- পাগুলো ছোটো- ছোটো আর ফুটবল সদৃশ গোল মাথাটি মনে হয় কেউ চেপে বসিয়ে দিয়েছে তার চর্বিবহুল ধড়ের ওপর, ঘাড় বলতে কিছু নজরে আসে না। টকটকে লালমুখে অসংখ্য ব্রণ। ছোটো একটা শুয়োরের খামার ছিলো তার একমাত্র আয়ের উতস । বাস করতো ক্রিকেতো জেলার ক্যাশিভিল- লা- গোপিল গ্রামে । কর্নু হালকা- পাতলা মাঝারি উচ্চতার মানুষ, হাতজোড়া লিকলিকে লম্বা। মাথা সামান্য ঝুঁকে থাকে, বাঁকা চোয়াল, ট্যারা চোখ। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, নীল রঙের একটা জামা পরে আছে সে। মাথার হলুদ রঙের কয়েকগাছি চুল খুলির সাথে লেপ্টে আছে, যা তার চেহারায় ভীতিকর বুড়োটে ভাব এনে দিয়েছে। লোকজনের কাছে সে 'হরবোলা' হিসেবে পরিচিত, কারণ গির্জার উপাসনা সংগীত থেকে শুরু করে সাপের আওয়াজ পর্যন্ত হুবহু নকল করতে পারতো সে। আর এ কারণে লোকজন চার্চের ধর্মীয়সভায় যোগ দেওয়ার চেয়ে কর্নুর মদের দোকানে হাজিরা দিতে বেশি পছন্দ করতো।

মিসেস ক্রমেঁ সাক্ষীর জন্যে রাখা বেঞ্চে বসে ছিলো। হালকা- পাতলা শরীর, সাধারণ চেহারা, একজন কৃষকের বউয়ের যেরকম হওয়ার কথা। তাকে দেখে মনে হয় সারাক্ষণ ঝিমুচ্ছে । হাঁটুর ওপর হাত রেখে, নির্বাকদৃষ্টিতে শূন্যে তাকিয়ে ছিলো সে। জজ তার জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'তারপর, মিসেস ক্রমেঁ, তারা আপনার বাড়িতে এলো এবং আপনাকে পানিভর্তি একটা পিপের মধ্যে ফেলে দিলো· · · , এরপর কী ঘটলো, দাঁড়িয়ে বলুন। '

মহিলা উঠে দাঁড়ালো। বাঁশের মতো লম্বা সে , শাদা একটা গোল টুপি পরে আছে মাথায়, যা দেখে পতাকা টাঙানো বাঁশের কথা মনে পড়ে। কম্পিত স্বরে, মনে করার চেষ্টা করতে করতে বলতে শুরু করলো সেঃ 'আমি শিম কুটছিলাম, এমন সময় তারা বাড়িতে ঢোকে। তাদের দেখে আমার সন্দেহ হলো, কারণ তাদের মোটেও স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো না। মনেমনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো শয়তানি বুদ্ধি পাকিয়েছে দুটোতে মিলে। 'তারা আমাকে আপাদমস্তক দেখছিলো, বিশেষ করে কর্নু, ট্যারা চোখে হাঁ করে দেখছিলো আমাকে। এই দুই কুঁড়ের বাদশার একসাথে চলাফেরা পছন্দ করতাম না আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাও এখানে?'

তারা কোনো উত্তর দিলো না। আমার সন্দেহ ঘনীভূত হলো। '
এমন সময় বউয়ের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ক্রমেঁ বললো, 'আমি তখন মাতাল ছিলাম ! 'তখন কর্নু ক্রমেঁর দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললো, 'বলো না, দোস্ত, আমরা তখন পুরোপুরি টাল ছিলাম, আমাদের হুঁশ ছিলো না তখন। আর এ কথা মিথ্যেও নয় ! '
তখন জজ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা তখন মাতাল ছিলে ?'
ক্রমেঁ ঃ জি, ধর্মাবতার, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।
কর্নুঃ মদ খেলে কে না মাতাল হয়!

জজ মিসেস ব্রমেঁর দিকে দিকে ফিরে বললেন, ' আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন, মিসেস ক্রমেঁ।

মিসেস ক্রমে আবার বলতে শুরু করলো, 'ক্রমেঁ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি একশো সৌস কামাতে চাও?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, চাই। ' কেননা একশো সৌস উপার্জন করা চাট্টিখানি কথা নয়। তখন সে আবার বললো, 'তাহলে ভালো করে দেখো, আমি কী করি ! আর আমি যা বলি ঠিক তাই তোমাকে করতে হবে। ' তখন সে বৃষ্টির পানি ধরার জন্যে ঘরের এককোণে রাখা একটা পিপে টেনে এনে রান্নাঘরের গালিচার ওপর রাখলো। আমাকে বললো, 'পানি এনে এটা ভর্তি করো! ' আমি দুটো বালতি নিয়ে কুয়ো থেকে পানি এনে পিপেটা ভরতে শুরু করলাম। প্রায় একঘন্টা লাগলো পিপেটা ভরতি করতে, কারণ পিপেটা একটা চৌবাচ্চার মতোই বড়ো ছিলো। এই একঘন্টা ওরা লাগাতার মদ গিলে যাচ্ছিলো। যখন আমি বললাম, 'তোমরা দেখি গলা পর্যন্ত গিলে বসে আছো। ' তখন ক্রমেঁ বললো, 'চিন্তা কোরো না, আমরা ভালো আছি, তুমি নিজের কাজ শেষ করো। তোমাকেও সুযোগ দেওয়া হবে। ' 'যখন পিপেটা কানায়-কানায় ভরতি হয়ে গেল, তখন ওদের বললাম, 'কাজ শেষ। ' কর্নু আমাকে একশো সৌস বের করে দিলো। ক্রমেঁ বললো, 'তুমি কি আরো একশো সৌস কামাতে চাও ?'আমি বিস্ময় চেপে বললাম, 'হ্যাঁ, চাই। ' আমার জবাব শুনে ক্রমেঁ বললো, 'তাহলে তোমার কাপড় খুলে ফেলো ! '

- কী ! কাপড় খুলে ফেলবো ?'
- হ্যাঁ।
- সব?'
- বেশি লজ্জা লাগলে ভেতরের শেমিজটা রাখতে পারো। আমরা রাগকরবো না।

একশো সৌস কম টাকা নয় যে পথেঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া যাবে! তাছাড়া এই দুই অপদার্থের সামনে নগ্ন হতে আমার মোটেও লজ্জা করছিলো না। আমি একেএকে আমার টুপি, জ্যাকেট, স্কার্ট এবং জুতা খুলে ফেললাম। মোজা খুলতে চাইলে ক্রমেঁ বললো, 'মোজা খোলার দরকার নেই, তুমি ওটা রাখতে পারো, আমরা ভদ্রলোক। সায় দিয়ে কর্নুও বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ভদ্রলোক। ' আর এভাবে প্রায় নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা চেয়ার থেকে ওঠে দাঁড়ালো, কিন্তু নেশার প্রভাবে ঠিকমতো খাড়া হতে পারছিলো না। আমি মনেমনে ভাবলাম, 'ব্যাপারটা কী?'

তখন ক্রমেঁ কর্নুকে বলল 'তুমি তৈরি?' কর্নু বলল 'হ্যাঁ। ' তারপর তারা দু'জন আচমকা আমাকে ধরে উঠিয়ে নিলো। ক্রমেঁ আমার মাথা ধরলো, আর কর্নু ধরলো পা। আমি চিতকার করতে শুরু করলাম। তখন ধমক দিয়ে ক্রমেঁ বলল, 'চুপ থাক, বেয়াদ্দপ মেয়েছেলে! ' তাপরপর তারা আমাকে পিপের ভেতর ফেলে দিলো। রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো।

ক্রমেঁ বললো, 'খেল খতম?'

কর্নু বললো, 'হ্যাঁ। '

ক্রমেঁ বললো, 'মাথা তো এখনো বাইরে রয়ে গেছে, মাপতে সমস্যা হবে। '

- 'পানিতে চেপে ধরলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, ' সমাধান বাতলে দিলো কর্নু।

ক্রমে আমার মাথাটা চেপে ধরলো, যেন সে আমাকে চুবিয়ে মারতে চায়। নাকেমুখে পানি ঢুকে বিষম খেলাম আমি, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মনে হলো মারা যাচ্ছি। মাথা তুলতে চাইলাম, কিন্তু সে আবার চেপে ধরলো আমার মাথা। প্রাণভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করলাম ছাড়া পাওয়ার জন্যে। এবার বোধহয় সে ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আমাকে বাইরে বের করে আনলো, বললো, 'যা, হারামজাদি, কাপড় পরে আয় '

ভয়ে-আতঙ্কে তখন আমি দিশেহারা। সুযোগ পেয়ে পড়িমরি করে দৌড় দিলাম। একছুটে একেবারে গাঁয়ের ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার আমাকে তাড়াতাড়ি তাদের চাকরানির একটা স্কার্ট এনে দিলেন; কারণ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আমি কাপড়চোপড় ছাড়াই পালিয়ে এসেছিলাম। এরপর ডাক্তার গাঁয়ের চৌকিদার মাইত্রে শিকোকে খবর দিতে গেলেন। তারপর শিকো পুলিশ নিয়ে আসলো ক্রিকেতো গিয়ে । বাড়ি ফিরে আমরা দেখলাম, দুজনে তখন ঝগড়া করছে।

ক্রমেঁ চিতকার করছিলোঃএটা ঠিক নয়! এতে কম করেও আরো এক ঘনমিটার পানি ধরবে, আমার কথা শোন, তোর হিসেবে ভুল আছে। উল্টো কর্নু চেচিয়ে বললো, 'চার বালতি পানিতে আধা ঘনমিটারের বেশি হবে না, তুই চোপা বন্ধ কর, মাথামোটা, আমার হিসেবই ঠিক! '

'এরপর পুলিশের দারোগা তাদের দুজনকে গ্রেফতার করলো। ব্যস, এটুকুই আমার বলার ছিলো। '

এই বলে সে বসে পড়লো। আদালতে উপস্থিত লোকজন হাসছিলো ওর বক্তব্য শুনে। জুরিরা হতাশ দৃষ্টিতে একে-অপরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। জজ বললেন, 'বিবাদী কর্নু, মনে হচ্ছে এসব তোমারই শয়তানি! তোমার কিছু বলার আছে এ ব্যাপারে?'

কর্নু উঠে দাঁড়ালো। বললোঃ 'ধর্মাবতার, আমি তখন নেশায় বুঁদ ছিলাম! '

গম্ভীর হয়ে জজ বললেন, 'তাতো দেখতেই পাচ্ছি, তারপর কী হলো বলো। '

'জি, বলছি। প্রায় ন'টার দিকে ক্রমেঁ আমার কাছে আসে। দুই পেগ মদের অর্ডার দিয়ে বলে, 'একটা তোমার জন্যে। ' আমি অবাক হলাম না - কারণ মদ্যপানের ব্যাপারে লোকজন সাধারণত দিলদরিয়া হয় - ওর সাথে বসে টানতে শুরু করলাম। এরপর আমিও তাকে এক পেগ খাওয়ালাম আমার পক্ষ থেকে। সে আবার আমাকে খাওয়ালো। এভাবে চললো প্রায় দুপুর পর্যন্ত, আকন্ঠ মদ গিলে আমরা তখন পুরোপুরি মাতাল।

এরপর ক্রমেঁ হঠাত্ কাঁদতে শুরু করলো। ওর কান্না দেখে আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কী হয়েছে জানতে চাইলে সে বললোঃ 'বৃহস্পতিবারের মধ্যে যেভাবেই হোক আমাকে এক হাজার ফ্রাঁ জোগাড় করতে হবে। ওর কথা শুনে আমি কিছুটা ঠান্ডা মেরে গেলাম। বুঝতে পারছেন তো, ধর্মাবতার ? এরপর ও হড়বড় করে বললো, 'আমি আমার বউকে বেচে দেবো, কিনবে তুমি?'

আমি তখন নেশার ঘোরে, আর আমার বউ মারা গেছে বহুদিন আগে। বুঝতেই পারছেন, ধর্মাবতার, কথাটা শুনে আমি কিছুটা অস্থির হয়ে পড়লাম। আমি তার বউকে কখনো দেখিনি, কিন্তু এটাতো ঠিক যে তার বউ একজন মহিলা, ঠিক কিনা? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কতো হলে তুমি তোমার বউকে বেচবে?' একথা শুনে সে চমকে উঠলো, অথবা চমকে ওঠার ভান করলো। উত্তরে সে যা বললো তা একজন মাতালই শুধু বলতে পারেঃ আমি তাকে ঘনমিটারের হিসেবে বেচবো! ' একথা শুনে আমি মোটেও অবাক হলাম না, কারণ আমি নিজেও তখন বদ্ধ মাতাল, আর একজন মাতালের কাছে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। ঘনমিটারের হিসেব আমি ভালোই বুঝতাম, আমার ব্যবসায় একহাজার লিটার মানে এক ঘনমিটার। তখনো দরদাম হয়নি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এক ঘনমিটারের জন্যে কতো চাও তুমি?' সে বললো, ' দুই হাজার ফ্রাঁ। খরগোশের মতো খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম আমি। ভাবলাম এই মহিলা কিছুতেই তিনশো লিটারের বেশি হবে না। কিন্তু মুখে বললাম, 'দামটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' ক্রমে বললো, 'এর কমে দিতে পারবো না, ভাই, লোকসান হয়ে যাবে! '

বুঝতেই পারছেন, ধর্মাবতার, নিজের স্বার্থ একটা মাতালও বুঝতে পারে। কিন্তু সে যদি শুয়োরের মাংস বিক্রিতে সিদ্ধহস্ত হয়, আমি তাকে সুদ্ধু বিক্রি করে দেওয়ার বুদ্ধি রাখি। হা হা হা! তো, আমি তাকে বললাম, 'যদি তোমার বউ নতুন হতো, তাহলে আমার আপত্তি ছিলো না। কিন্তু সে অনেকদিন তোমার বউ ছিলো, অর্থাত্ সে এখন আর আগের মতো খুব একটা তাজা নয়। আমি তোমাকে প্রতি ঘনমিটার পনেরো শ ফ্রাঁ করে দেবো, এরবেশি একটাকাও না। রাজি থাকলে বলো। '

সে বললো, 'ঠিক আছে, তা-ই সই! ' এরপর দু'জনে হাত ধরাধরি করে আমরা দোকান থেকে খুশিমনে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু একটা শঙ্কা জাগলো আমার মনে, তাই ক্রমেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তরল কিছুতে না ঢেলে কিভাবে তাকে তুমি মাপবে?' 'সে তার পরিকল্পনা জানালো। বললোঃ প্রথমে একটা পিপে নেবো, তারপর পানি দিয়ে সেটাকে কানায়কানায় ভরতি করবো। এরপর তাকে ওটার ভেতর ফেলে দেবো। যেটুকু পানি বাইরে পড়বে, সেটা মেপে নেবো। ব্যস, এভাবে আমরা নিঁখুত মাপ পেয়ে যাবো। '

আমি বললাম, 'বুঝেছি! কিন্তু যে-পানি বাইরে পড়ে যাবে সেটা তুমি মাপবে কিভাবে?'

তখন সে আমাকে বোঝাতে শুরু করলোঃ ওর বউকে পিপেতে ফেলার পর যে-পানিটুকু বাইরে পড়বে, পুনরায় সেটা ভরতি করা হবে। যেটুকু পানি ভরা হবে সেটাকে মেপে নেওয়া হবে। অর্থাত্ দশ বালতি পানি ভরলে হবে এক ঘনমিটার। দেখলেন, ক্রমেঁ আসলে মোটেও বোকা নয় - মদ খেলেই শুধু বুড়ো ঘোড়া হয়ে যায় সে। '

তো আমরা তার বাড়িতে পৌঁছলাম। একনজর তার বউকে দেখে বুঝলাম, খুশিতে বগল বাজানোর মতো রূপবতী সে নয়। দেখুন, এখানেই সে আছে। তো, তাকে দেখে মেজাজটা খিঁচড়ে গেলেও, নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে মনেমনে বললাম, সুন্দরী হোক আর বান্দরী, তাতে কী আসে যায়? কাজে তো আসবে! ভালো করে আরেকবার তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চেহারার মতো শরীরটাও খুব একটা সুবিধের না, একেবারে রোগা-পাতলা। মনেমনে ভাবলামঃ যাক, চারশো লিটারের বেশি হবে না সে মোটেও! মদের ব্যবসা করতে করতে তরল জাতীয় দ্রব্যের হিসাব ভালোই বুঝতাম আমি। এরপর কী ঘটেছে সেটা জানিয়েছে সে

আপনাকে। লোকসান হবে জেনেও শেমিজ আর মোজা জোড়া তাকে খুলতে দিইনি, কারণ আমি ভদ্রলোক। একফাঁকে সে পালিয়ে গেল। আমি ক্রমেঁকে বললাম, 'ক্রমেঁ, দেখো সে পালাচ্ছে! '
'চিন্তা কোরো না, ' বলল সে। 'আমি তাকে ধরে নিয়ে আসবো। তাছাড়া রাতের বেলা তো তাকে ফিরতেই হবো। এসো আমরা পানিটা মেপে নিই। '
এরপর আমরা পানি মেপে নিলাম। চার বালতিও হয় নি। হা হা হা! '
হাসতে শুরু করলো কর্নু পাগলের মতো । শেষ পর্যন্ত পেছনে দাঁড়ানো সিপাহিরা বাধা দিয়ে তাকে শান্ত করলো। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আবার সে বলতে শুরু করলো ঃ 'তখন ক্রমেঁ চিতকার শুরু করলো, 'কিছুই হচ্ছে না, তোমার হিসেবে ভুল আছে! ' আমিও ক্রমাগত চেঁচাতে শুরু করলাম। এরপর সে আমাকে ঘুসি মারলো, আমিও তাকে মারলাম, সে আবার আমাকে মারলো। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত হয়তো আমাদের ঝগড়া চলতে থাকতো, কারণ আমরা দুজনেই ছিলাম বদ্ধ মাতাল। পরে পুলিশ এসে গ্রেফতার করে আমাদের জেলে নিয়ে গেল। ' কর্নু বসে পড়লো।

ক্রমেঁ তার অপকর্মের সহচর কর্নুর সব কথায় সায় দিলো। জুরিরা ফাঁপরে পড়ে গেলেন এই অদ্ভুত মামলার সমাধান করতে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে তারা আদালতের ভেতরের কক্ষে চলে গেলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক পর তারা ফিরে এসে তাদের রায় শোনালেন। দাম্পত্যজীবনের মাহাত্ম্য, দায়-দায়িত্ব আর ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের ন্যূনতম সীমারেখা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে ক্রমেঁ আর কর্নুকে অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হলো।

ক্রমেঁ তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজগৃহে ফিরে গেল। আর কর্নু ফিরে গেল তার নিজের ব্যবসায়।

http://www.somewhereinblog.net/blog/mustakimrahiblog/28722082